

# অপরূপা অজন্তা

[ রবীন্দ্র পুরস্কার-বছর :: ১৩৭৫ ]

নারায়ণ সান্যাল

ভা র তী ব ক স্ট ল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

রমানাথ মজুমদার প্লট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

শ্রীকৃষ্ণকেশ বালিক

৬, রমানাথ মহম্মদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭৩

মূল্য পনের টাকা মাত্র

মুদ্রক :

শ্রীবংশীধর সিংহ

বর্ধা মুদ্রণ

১৮, নয়েন লেন হাজারি, কলিকাতা-৯

## কৈফিয়ৎ

দেবদূতরাও যেখানে সম্ভরণ পদসন্ধারে সঙ্কচিত, সেখানে কেন ছড়মুড় করে চুকে পাড়েছি, তার কৈফিয়ৎ দিতে বসে প্রথমে সেই দেবদূতদেরই কৈফিয়ৎ দাবি করার ইচ্ছা জাগছে। পৃথিবী যদি আজ, ভারতবর্ষকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ওখানে কোন্ স্বাপত্য-কীর্তি দেখতে বাব, ভারতবর্ষ বোধ করি তার উত্তরে বলবে—অজস্তা-ইলোর, কোপারক আর তাজমহল। পৃথিবী আজও তাই দেখতে ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই অজস্তাকে দেখাবার, বোঝাবার কোন আরোজন আমরা আজও করি নি। অজস্তায় প্রতি বছর লক্ষাধিক দর্শক আসেন, অজস্তার নামে সরকার লক্ষাধিক মুদ্রা প্রতি বছর ব্যয় করেন, তবু অজস্তা-বিষয়ে প্রকৃত গাইড-বই এখনও ছাপা হয় নি। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত ডঃ ইয়াজদানীর যে গ্রন্থটিকে অজস্তা-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পুস্তক বলতে পারি তা দীর্ঘদিন ছাপা নেই; তার মূল্যও বোধ করি সহস্র রজতখণ্ড। ভুল তথ্যে-ভরা কিছু নিয়মানের পুস্তিকামাত্র অজস্তার কাছে-পিঠে পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর এ্যালবামে অথবা আকাদেমী প্রকাশিত চিত্র-সম্বারে কিছু ভালো ছবি আছে; কিন্তু তাদের কোন পরিচয় নেই। জাতক-কাহিনীগুলির সঙ্গে ঐ চিত্রগুলির কি সংন্ধ, কোথায় তাদের অবস্থিতি তা উপলব্ধি করা যায় না। ভাব-না-করা ফেলিনি বা বেয়ারিম্যানের চলচ্চিত্র দেখে আপনি, আমি ষতটা রস গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবী আজ ডলার-রুবল্-ফ্রাঁস্টালিনের বিনিময়ে শুধু ততটাই রস আহরণ করে নিয়ে যায়।

বিদেশীদের কথা যাক। সে দায়িত্ব ভারত সরকারের; কিন্তু ভ্রমণ-পাগল অগণিত বাঙালী যাত্রীকে আমি অজস্তায় দিশেহারা হয়ে ফিরতে দেখেছি। চম্পেয়্য-জাতকের মর্মস্পর্শী চিত্রকে সাপুড়ের ছবি বলে হেসে ওড়াতে স্বকর্ণে শুনেও এসেছি। অজস্তার পূর্ণ-রসাস্বাদনের সহায়ক কোন নির্দেশক গ্রন্থের অভাবে তাঁদের অপরিণীম অনুশোচনাও অনুভব করেছি।

চিত্র-শিল্প, স্থপতি ও ইতিহাসের উপর যাদের প্রকৃত অধিকার আছে, সেই দেবদূতদের কেউ যাত্রীদের সে অভাব মোচন করতে আজও এগিয়ে আসেন নি বলেই অনধিকারী বর্তমান গ্রন্থকারের এই মূর্খামি।

আমার সবচেয়ে সঙ্কোচ, সবচেয়ে আপসোস চিত্রগুলির যথার্থ অনুকরণের ব্যর্থতায়। অসিত হালদার, নন্দলাল, ডরোথি লাচাব প্রভৃতির আঁকা-ছবির পাশাপাশি আমার স্কেচগুলিকে দেখে বারে বারে মনে স্থিধা জেগেছে এগুলির ব্লক আদৌ করানো উচিত কিনা। কিন্তু গ্রন্থকারের অসহায়ত্বের কথা বিচার করে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, এটুকু ভরসা রাখি। প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে ফটো নিয়ে ব্লক করানো প্রায় অসম্ভব, কোন প্রকৃত অধিকারী চিত্র-শিল্পীকে দিয়ে এগুলির অনুকৃত করালে এ পুস্তকের মূল্য বোধ করি চতুগুণ বৃদ্ধি পেত এবং যে ভ্রমণ-বিলাসী মধ্যবিত্ত বাঙালী রসপিপাসুর জন্ম বইটি লিখতে

বসেছি, তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই আমি সবিনয়ে নিবেদন করব, আমার ঝাঁকা ছবিগুলিকে পাঠক যেন শুধু নিদেশক-চিত্র বা 'ইণ্ডিকেটরি-স্কেচ'-রূপেই গ্রহণ করেন। মূল্যের নাগাল না পেলে অন্ততঃ গ্রিফিথ, হেরিংহাম, ইয়াজদানী অথবা ইউনেস্কো এ্যালবামে খুঁজে নেবার জগ্ৰহী যেন শুধু আমার স্কেচগুলিকে কাজে লাগানো হয়। আমার ঝাঁকা স্কেচ দেখে মঙ্গচিত্রের বিচার করতে বসলে অজস্র হতা বটেই, আমার উপবেও অবিচার করা হবে।

একই কারণে কোন বছ-বঙা চিত্রের সংযোজন করা গেল না।

সংস্কৃত অতি দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের পথে চলেছে। আজ যা আছে হয়তো দশ বছর প. তাও থাকবে না। এ অবক্ষয়ের কাবণ নির্ণয় করবেন বিশেষজ্ঞরা, তাব গতিবোধ করবেন ভাবত সবকাব। আমি শুধু শতাব্দীর দুই পাবের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গে বহুদ টানব। প্রথমটিব লেখক স্রাব জেমস্ ফাণ্ডসন (*Cave Temples of India by Fergusson & Burgess, London 1880, P.-312*)। গত শতাব্দীর শেষপাদে তিনি লিখেছিলেন :

"Mr. Griffiths proposed years ago that doors and shutters should be employed to shut out bats and nest-building insects from the few Caves that contain much painting, but this excellent suggestion was only carried out in the case of Cave I."

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দেও আমি দেখে এসেছি ঐ প্রথম বিহাব পাব হয়ে দ্বিতীয় বিহাবে এ পঁচাশি বছরের মধ্যেও হাত পড়ে নি। অস্তু কোন গুহায় আজও কাঠের দরজা বা জানালা তৈরি কলে বলাবালি ও পাখীদের গতিরোধ করা হয় নি। মন্তব্য নিশ্চয়োজন। শুধু স্মর্ভব্য ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফাণ্ডসন ষোলটি গুহায় চিত্র দেখতে পেলেন ও-কথা বলেছিলেন, ১৯৬৫-তে আমি দেখে এলাম মাত্র চাবটিতে। বাবোটি গুহাব চিত্র শেষ হয়েছে এই পঁচাশি বছবে !

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় ৯।৮।১৯৬৫-তে প্রকাশিত একটি সংবাদ :

"New Delhi, Aug 8th—A UNESCO Mission which toured India recently recommended the use of modern techniques for preservation of murals and sculptures of Ajanta and Ellora Caves, says U. N. I. The Mission consisted of Mr. Harold Plenderleith, Director of International Centre for the Preservation & Restoration of Cultural Property & Mr Paul Coremans, Head of Belgium's Royal Inst. for the Preservation of Cultural Property. Mr. Coremans has since died."

"In its report the Mission has said that the Paintings at Ellora and Ajanta have suffered deterioration both from natural causes and at the hands of restorers. The report says that some of the paintings and murals have suffered because of defective techniques, over-restorations of sculptures and architectural elements, scrapping, smudging and over-painting on the frescoes. Bulk of the

damages has, however, been caused by the *weathering* of facades, cracks and seepage of water, crystallization of salt and the staining of murals because of *smoke and heat*. The Mission has suggested investigation on and paintings by microscopy and microchemistry to reveal the underlying strata of murals showing whether there is more than one layer of painting, the depth of vernishes, impregnants and such other details, examination by ultra-violet fluorescence and by infrared photography and a complete humidity survey of the Caves by surface measurements at different seasons of the year. In addition there should be a scientific diagnosis of the structure, composition and condition of the walls and materials."

"The Mission has also submitted to UNESCO proposals to set up a system of museum laboratories and a regional Centre for South Asia to train technicians specialising in conservation methods." (ইটালিক্স অক্ষর বৰ্তমান লেখকের)

এ সম্পর্কত আমাদের জিজ্ঞাসা এ নয় যে, এইসব বিজ্ঞান-ভিত্তিক নিদেশনায় কতটা কর্ণপাত কৰা হবোছে . পবন্তু আমাব প্ৰশ্ন . যে চিত্ৰগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে তাৰ হাত কয়েক দৰ দিয়ে অন্ততঃ একটা কৰে কাঠেৰ বেড়া দেওয়াব বাবস্থা কৰা যায় কিনা ! অসংখ্য যাত্ৰীকে আমি দেখেছি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পবখ কবতে—ছবি থেকে রঙ উঠে আসে কিনা । অযুত যাত্ৰীকে আমি দেখেছি ছবি-আঁকা দেওয়ালে পা তুলে চেস দিয়ে দাড়িয়ে আৰামে সিগাবেট ধবাত্তে । না, গুহাব ভিতৰ প্ৰমপানে আপাত্ত নেই । অজন্তাব গুহা তো সবকাৰী বাস অথবা পবিত্ৰ সিনেমা-গৃহ নয় !

অজন্তা সম্বন্ধে লিখতে বসে মনে যে সব প্ৰশ্ন জেগেছে এবং যাব সমাধান আমি নানা গ্ৰন্থ হাতড়ে খুঁজে পাই নি, তা প্ৰকৃত পণ্ডিতৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰূপেই আমি বেখে গোছ । কেউ যদি অনুগ্ৰহ কৰে আমাব সন্দেহ নিবসন কৰেন বাধিত হব এবং এ গ্ৰন্থৰ যদি কখনও সংস্কৰণ হয়, সে-সব তথা স যোজন কবতে পাবব ।

সবশেষে বলব মুদ্ৰাকব প্ৰমাদেব কথা । তাব জ্ঞাতঃ আমিই একান্তভাবে দায়ী । যে কাবণে কোন বিদগ্ধ চিত্ৰকবকে দিয়ে চিত্ৰগুলি আকিষে নিতে পাবি নি, সেই একই কাবণে প্ৰফ দেখাব দায়িত্ব নিজে গ্ৰহণ কৰেছিলাম দুখ শুখ এটুকুই যে, এত কৰেও বৰ্তমান বাজাবে বইটিব মূল্য এমন একটি অঙ্কে নামাতে পাবি নি যাতে নিয়মপাৰিত্ত ভ্ৰমণ-পাগল বাঙালীব নাগালেব মধ্যে থাকে ।

নাৰায়ণ সাত্তাল



বাসটা আমাকে অজ্ঞস্তা-গুহামুখের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তাব গম্ভবা পথে। সে বাস থেকে নামলুম আমি একাই। বা-বগলে বাগিষে ধবেছি বেডিংটা, ডান হাতে স্মাট্কেস। কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে। হঠাৎ স্থিব কবেছি সেটা—রিসার্ভেসান কবানো নেই কোথাও।

গুহা-মন্দিবেব দবজা খোলে সকাল ন'টায়, বন্ধ হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় লক্ষ্য কবে দেখি, ইতিপূর্বেই খান চাব-পাঁচ মোটবগাডি এসে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ আমার আগেই এসেছেন অনেকে আজ। কিন্তু গুঁবা হচ্ছেন দৈনিক-মাত্রী। এসেছেন সকালে ফিবে যাবেন সন্ধ্যায়। আমার তা নয়। প্রথমেই মাথা গৌজাব একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে আমাকে। জলগাঁওয়ে ট্রিস্ট অফিসই খোজ পোষাছ যে, এখানে একটি ট্রিস্ট-লজ সত্ত্বঃসমাপ্ত। ফলে স্থানাভাব হবে না। তাছাড়া গুহামুখ থেকে মাইল তিনেক দূবে ফদাপূবে ডাকবাংলো বা বেস্ট-হাউস আছে। কিন্তু সেসব জায়গায় থাকতে হলে আগে-ভাগে লিখিত অনুমতি আনাতে হয়। আমার তা নেই। বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানে দেখি চমৎকাব একটি দ্বিওল বাড়ী। শুনলাম, এটাই নবনির্মিত ট্রিস্ট-লজ। কিন্তু কী ছুঁর্ভাগ্য আমার শোন' গেল সবকাবী খাতায় বাড়ীটি এখনও বাসোপযোগী হয় নি। অর্থাৎ বাস্তবে শেষ হলেও যাত্রীদের কি হাবে ভাড়া দেওয়া হবে তাব হিসাব এখনও কষে বাব কবা হয় নি। সত্ত্বঃসমাপ্ত ট্রিস্ট-লজেব ভাবপ্রাপ্ত ওভাবসিযাববাবু মাথা নেড়ে হিন্দীতে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পাৰছি না বলে আন্তবিক চুঃখিত। তাছাড়া কি জানেন, সেপটিব্-ট্যাঙ্কেব সঙ্গে স্থানিটারী প্রিভিব কনেক্‌সন পাইপটা

আমি বাবা দিয়ে বলি সেজ্ঞ কি, চাবদিকেই তো ফাকা মাঠ।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ওভাবসিযাববাবু বলেন মাফ্‌কিজিয়ে সা'ব। বহ্‌ নেহী হো সক্তা। যবতক এঞ্জিনিযাব সা'ব ছুকুম নেহী দেতে তাবপর একটু হেসে বলেন : আপ্‌ নেহী জানতে সা'ব, পি ডাবলু কি কানুন বহ্‌ কড়া হ্যায়।

আমাব মুখ দিয়ে আচমকা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা বেবিষে গেল মাযেব কাছে মাসীব গল্পো আব নাই ঝাড়লে ভাই।

ওভাবসিযাববাবু বলেন ক্যা বোলতে হে ?

আমি হেঁ হেঁ কবে সামলে নিই নিজেকে। হিন্দীতে প্রশ্ন কবি, বন-বিভাগের ডাকবাংলোতে থাকা যাবে ?

: যেতে পাবে। চেষ্টা কবে দেখুন। বন-বিভাগের অফিসাবদের অগ্রাধিকাব আছে। গুরন্বাবাদেব ডি এফ ও পাঠে-সাহেবের রিসার্ভেসান ছাড়া, তব্বে হ্যা, যব খালি থাকলে চৌকিদাব আপনাকে বিমুখ নাও কবতে পারে।

অগত্যা একটি লোকের মাথায় স্মার্টকেস বিছানা চাপিয়ে সৈদিক পানেই রওনা দিই। বন-বিভাগের ডাকবাংলোটি বাঁকের মুখে। সুন্দর ছিমছাম। প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেলুম। যেমন করেই হোক এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। একটু হাঁকাহাঁকি করতেই চৌকিদার মহাপ্রভু বেরিয়ে এলেন। স্থির করলুম, এবার আর ভুল করবো না। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে অসি চালনা করতে হবে। টুরিস্ট-লজের ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে আয়রক্ষামূলক ডয়েল লড়তে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছিলুম। এবার হার মানে আক্ষরিক অর্থে পথে বসা! চৌকিদার বেবিয়ে আসতেই হিন্দীতে বলি—কোন ঘর রিসার্ভেসান হয়েছে আমার জন্তু ?

চৌকিদার একটু হতচকিত। সামলে নিয়ে বলে : আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ সা'ব ? জবাবে খেঁকিয়ে উঠি : কেন, পাঠে-সাহেবের চিঠি পাও নি ?

পাঠে-সাহেবের নামোল্লেখই অধেক কাজ হয়। চৌকিদার এবার আমাকে একটি সেলাম করে বললে—জী নেহী সা'ব।

আমি কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে তুলে গালাগাল কবতে শুরু করি। কড়া-মেজাজী বন-বিভাগের একজন হোমবা-চোমবা অফিসাবের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। সবকারী ডাক-বিভাগ থেকে শুরু করে মায় আমার ভাগাকে গাল পাড়তে থাকি এক নাগাড়ে। আমি আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করতেই দেখি চৌকিদার বাবাজীবন আয়রক্ষামূলক খেলা খেলতে জাবস্ত কবেছে। পাগড়ির প্রান্তভাগে মুখটা মুছে নিয়ে বলে—আপনি নাবাজ হচ্ছেন কেন সা'ব ? ঘব তো চারটেই খালি পড়ে আছে। যেটা ইচ্ছে দখল করুন না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে আমাব। বলি—চা খাওয়াতে পার ?

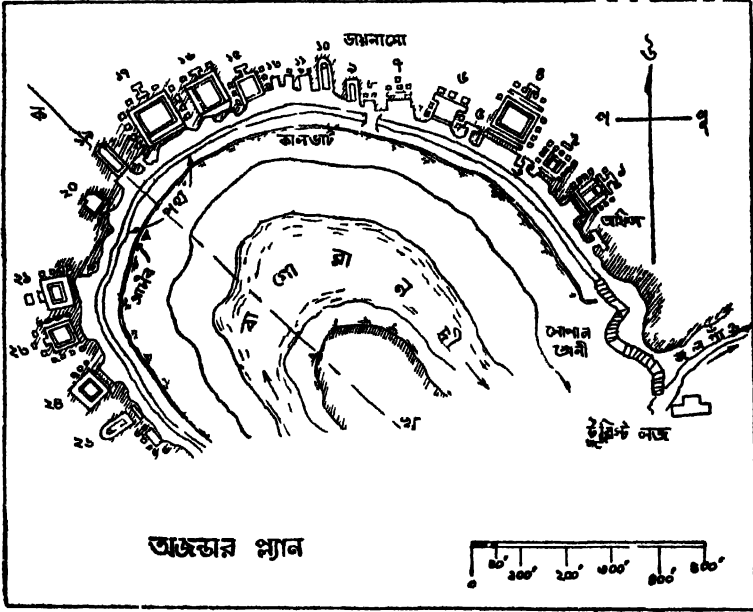
: আভি লাভা হুঁ সা'ব !

চৌকিদারটি লোক ভাল। শুধু চা নয়, বিস্কুটও খাওয়াল। মধ্যাহ্নে কি খাব জেনে নিয়ে বললে রাত্রে ওকে কিন্তু ছুটি দিতে হবে। নিজেই বাস্তব করে কারণটা। চৌকিদার স্থানীয় লোক। মাইল তিনেক দূরে ওর গ্রাম। ওর স্ত্রী গ্রামে আছে। আসন্নপ্রসবা। আজ সকালেই খবর এসেছে—বাতে ওকে বাড়ী যেতে হবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাই।

চাঁপর্ব শেষ হতেই বেলা নাটা বাজল। স্ক্চ-বই, নোট-বই ইত্যাদি ঝোলা ব্যাগে জরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি গুহা-মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এখন থেকে আধ মাইলও হবে না। বাগোড়া নদীটি এখানে অশ্বখুরের আকারে মস্ত একটি বাঁক নিয়েছে। ছু-পাশেই দেড়-দুশ' ফুট উঁচু পাহাড়। এর নাম ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। অশ্বদিকে তান্ত্রী নদীব উপত্যকা। বাগোড়া নদীটি এই পালাড়ের বুক চিরে ছুটে গেছে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। পর পর সাতটি জল-প্রপাতের পথে নেমে এসেছে সমতলে। তার শেষ ধারাটি যেখানে আধখানা চাঁদের মত বাঁক নিয়েছে সেখানেই অজন্তা-গুহা।



চিত্র—১-এ অজস্তাব একটি প্ল্যান ঠেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে ট্রবিষ্ট-লজ্জটি দেখানো হয়েছে ঐটিই সজ্জঃসমাপ্ত যাত্রিনিবাস। বাস ঐ পর্যন্ত আসে জলগাঁও থেকে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সোপান। ঐ সোপান বেয়ে উঠে আসতে হবে গুহামুখের সমতলে যে পথটি আছে তাব কাছে। গুহামুখগুলিকে যুক্ত করে ঐ পথটি নদীর বাঁক অনুসারে ঘুরে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। প্ল্যানেব উপর থেকে দেখছি বলে বুঝতে পাবছি না যে, বাস্তাটি বাগোড়া নদীর জলতল থেকে অনেক উপরে আছে।



চিত্র -১

চিত্র—২-তে একটি সেক্সান একে ব্যাপাবটা বোঝাবার চেষ্টা করা গেছে। প্ল্যানে ক-খ চিহ্নিত সবলবেখায় যদি আমরা খাড়াভাবে ঐ ভূখণ্ডকে কাটতে পাবতুম, তবে সেটাব চেহারা দাঁড়াতো ঐ চিত্র ২-এব মত। প্ল্যানে দেখুন, সর্বসমেত ২৬টি গুহা-মন্দির দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এখানে আবও কয়েকটি গুহা আছে, যা প্ল্যানে দেখানো যায় নি। সর্বসমেত গুহাব সংখ্যা ৩০টি।

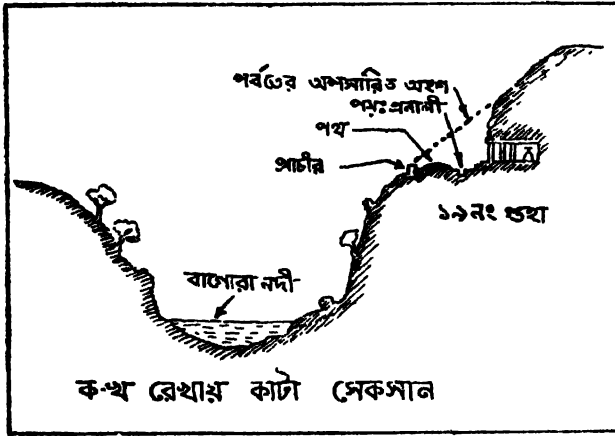
সোপান-শ্রেণী বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে এলুম গুহাব সমতলবর্তী ঐ পথটিতে।

প্রথম গুহাব পাশে অফিসঘর। বিশ পয়সা দিয়ে এখানে টিকিট কিনতে হল। প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ মন্দিরে অন্ধকার গুহাব ভিতরে আছে অজস্তাব শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভাব। এই চাবটি মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোব সাহায্যে যাত্রীদের ছবিগুলি ভাল কবে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। সেজ্ঞ পাঁচ টাকা দিয়ে একটি পৃথক টিকিট কিনে নিলুম।

অফিসঘর ছেড়ে ছুঁপা এগিয়ে যেতেই সমস্ত অজন্তা উপত্যকা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার দৃষ্টির সম্মুখে। ঠিক এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শিল্পী মুকুল দে তাঁর প্রথম অজন্তা দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছিলেন—

বাকের মুখে গুহা মন্দিরগুলি সর্বপ্রথম দেখে আমার মনে কী প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল তা আমার পাঠককে বোঝাতে পারব না। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে গেলুম। ধ্যানস্তিমিত মহামৌন পর্বত যেন দুই প্রসারিত বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। আমি এবং আমার সহযাত্রী দীর্ঘ সময় এখানে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল দীর্ঘ পথযাত্রার যা কিছু ক্লান্তি, যা কিছু শ্রানি সব যেন ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। আমি পরমপ্রাপ্তি লাভ করলুম মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বেই।

ছেলেবেলায় কপকথায় পাড়েছি সোনার কাঠিৰ ছোঁয়া পেয়ে শতাব্দীর নিদ্রা ভেঙে রাজকুমারী চোখ মেলে চেয়েছিলেন। অজন্তা যেন সেই রূপকথার রাজকুমারী। সতশতাব্দীর নিদ্রা-অস্তে সভ্যজগতের দিকে চোখ মেলে হঠাৎ সে তাকিয়েছিল ১৮১৭



চিত্র—১

খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় একদল ইংরাজ সৈন্য অজন্তা পাহাড়ের অপর দিকে শিবির সংস্থাপন করেছিল। হঠাৎ কয়েকজন লক্ষ্য করে দেখে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ। দুঃসাহসী কয়েকজন সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে নামল নদীতে। লতা-গুল্ম ঝাঁকড়ে আবার উঠল ওদিকের পাহাড়ে—ঐ গুহাগুলির সমতলে। বহুজন্তু আর বাহুড়ের আস্তানায় দীর্ঘ দিন পরে আবার পড়ল মানুষের পদচিহ্ন। ওরা স্তম্ভিত হয়ে গেল!

কিছুদিন পরে পণ্টনের দল ফিরে এল লোকালয়ে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গুরুত্ব দেয় না কেউ। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিতোৎসাহী

বাপাঘাট ঘাটাই কবতে বেনিয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীর লোকদের কাছ থেকে তাঁরা পথের মোটামুটি নির্দেশও পেয়েছিলেন। হাযদবাবাদ বাজার খান্দেহ জেলায় ইন্দ্রাজি পর্বতমালায় একটি ঘাট বা উপত্যকা আছে। এই ইন্দ্রাজি পর্বতের এপারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ওপারে তান্ত্রী নদীর অববাহিকা। বাগোডা নামে একটি নদী এই পাহাড়ের মাঝখানে ফাঁক দিয়ে একেবেকে এগিয়ে চলেছে। এই বাগোডাই সাতকুণ্ড জল-প্রপাতের কাছাকাছি একটি অশ্বখুবাকৃতি পাক নিয়েছে। সেখানেই নাকি এই গুহাগুলির অবস্থান।

অনেক খুঁজে খুঁজে বিদ্রোহসাহসী দল অবশেষে এসে পৌঁছালেন অজস্তা-গুহায়। লোকালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। সেটা হল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ অজস্তা পুনর্বিষ্কাবের এক যুগ পবে। কিন্তু তবু কলাবসিক মহলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া জাগল না। কাটল আবও প্রায় দশ বছর। তাবপব জেমস্ ফাগুসনের নজবে পড়লো এই প্রবন্ধটি। ফাগুসন ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত ও কলাবসিক। তাঁর উৎসাহও ছিল প্রচণ্ড; বিশেষ কবে ভাবতীয় স্থপতির বিষয়ে। শুধু স্থপতিই বা কেন, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুঁজুতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। এসব বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ আজও প্রামাণ্য। এতবড় পণ্ডিত যখন স্বয়ং এই গুহাগুলি দেখে এসে বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন অন্ধের পক্ষেও আব চোখ বুজে থাকা সম্ভবপব হল না। তাঁর প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিবেক্টারদের এবাব টনক নড়লো। তাবা মাজাজ পণ্টনের সৈন্যধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ববার্ট গিলকে পাঠালেন চিত্রগুলির অনুলিপি তৈরি কবার কাজে। মেজর গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধবে অজস্তায় কাজ করেছিলেন। কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ছিল তাঁর তা কল্পনা কবলে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি বস্তুতঃ একাই কাজ কবেছিলেন সেখানে, এবং এই দীর্ঘ সময়ে ত্রিশটিব ওপব বৃহদায়তন তৈল-বঁড়ের ছবি একে শেষ করেন। এগুলি ক্রমে ক্রমে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু কী আপসোসের কথা, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিডেনহ্যামের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে একটি প্রদর্শনীতে মাত্র পাঁচটি পট ছাড়া বাকি পঁচিশখানি ছবি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেমন কবে এমন সবনাশ আগুন লাগল জানি না, শুধু এটুকু জানি যে, সে ক্ষতি অপূরণীয়। তাব কারণ মেজর গিল যখন হজ্জা-গুহাতে চিত্রগুলি দেখেছিলেন, তখন সেগুলি ছিল প্রায় অক্ষতই। আজকাল আমবা যে ক্ষতচিহ্ন-লাঙ্কিত প্রাচীর-চিত্রগুলি অজস্তায় গিয়ে দেখতে পাই, তাব অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গত দেড়শ' বছবে। তাছাড়া মেজর গিল এমন কয়েকটি চিত্রের অনুলিপি কবেছিলেন যেগুলি আজ বাস্তবে একেবাবে অবলুপ্ত। যাই হোক, অবশিষ্ট পাঁচখানি ছবি কেনসিংটন সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত কবা হয়। শুনেছি, সেখানে ভাবতীয় শাখায় এগুলি আজও সযত্নে রাখা আছে।

সে যাই হোক, মেজর গিলের পর এখানে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন বোম্বাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জর্জ গ্রিফিথ। এজন্তাও ফার্মসন সাহেবের কাছে আমরা ঋণী : কারণ, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মেজর গিলের ছবিগুলি পুড়ে যাওয়ার পর স্থার জেমস ফার্মসন ও ডাঃ বার্জেস ভারত সরকারকে এ নিয়ে পুনরায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাঁদের উৎসাহেই সরকার এজন্তা টাকা অনুমোদন করেন এবং অধ্যক্ষ গ্রিফিথ তাঁর বিদ্যালয়ের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কাজ শুরু করেন। প্রায় দশ বছর পরে (এর ভিতর বছর তিনেক অবশ্য কাজ বন্ধ ছিল) তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া গেল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ছাত্রদের আঁকা এই ছবিগুলি নিয়ে গ্রিফিথ ফিরে এলেন সভাজগতে। সর্বসম্মত চিত্রের সংখ্যা ৩৫৫। গ্রিফিথ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী দেখছি তিনি আঁকিয়েছিলেন :

১ নং গুহায়...১৭৭টি	১৬ নং গুহায়...১৮টি
২ " " ... ৫০ "	১৭ " " ...৫১ "
৬ " " ... ৫ "	১৯ " " ... ১ "
৯ " " ... ১১ "	২১ " " ... ২ "
১০ " " ... ১৮ "	২২ " " ... ১ "
১১ " " ... ১ "	মোট—৩৩৫টি

মহানন্দে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ এই অমূল্য চিত্রসম্ভার পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। পশ্চিম জগৎ দেখুক এবার অজন্তার স্বরূপ! সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় অতি যত্নে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলিকে।

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আবার এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১২ই জুন, ১৮৮৫ তারিখে এই অনবদ্য চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ চিত্রই নষ্ট হয়ে গেল। ৮৭-খানি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত; আর ১৯২-খানি আংশিকভাবে ঝলসে গেছে, অবশিষ্ট ৫৬-খানি ছবি ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট সংগ্রহশালার ভারতীয় শাখায় আজও শোভা পায়।

অদম্য উৎসাহ বলতে হবে গ্রিফিথ সাহেবের। এই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের পরেও তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন নি। দেখছি, তা সত্ত্বেও এই অগ্নিকাণ্ডের এগারো বছর পরে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন—*The Paintings in the Buddhist Caves of Ajanta, London 1896*. যে ছবিগুলি রক্ষা পেয়েছিল এবং যে সব স্কেচ ওঁর কাছে ভারতবর্ষেই ছিল, তারই উপব নির্ভর করে ছ-খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই অজন্তার বিষয়ে প্রথম প্রামাণিক দলিল! বইটির ভূমিকা ও সম্পাদনার পারিপাট্য দেখলেই বোঝা যায় যে, এর পিছনে কী পরিমাণ পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য আর অনুসন্ধিৎসা আছে। জাতকের কাহিনী-গুলির অধিকাংশই গ্রিফিথ জানতেন না—তাই অনেকক্ষেত্রে দেখছি তিনি চিত্রগুলির মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবু অজন্তা-তীর্থের যে তিনিই পথিকৃৎ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের অক্ষত অবস্থায় কী রূপ ছিল, তা শুধু তাঁর

গ্রন্থেব মাধ্যমেই আজ জানতে পারি। বর্তমান গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র গ্রিফিথ সাহেবের মূল গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকবার চেষ্টা কবেছি—ফলে সেগুলি প্রায়শঃই অক্ষত। বাস্তবে আজ অজস্র ছবিগুলি এ-গ্রন্থে প্রদর্শিত চিত্রের মত অক্ষত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু অজস্রায় লুঠেবাব দল মহানন্দে লুঠেব কাজে লেগে গেছে। অরক্ষিত গুহা থেকে তাবা ছবি চুবি কববাব মতলবে ছিল। কিন্তু এ তো আব সংগ্রহ-শালাব দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-বাধানো ছবি নয়—এ চুবি কবা যাবে কেমন কবে? ওবা তাই ছুটে এল কোদাল আব চুবি নিয়ে—পলেস্তারা-সমেত ছবিগুলিকে চেঁছে তুলে নিয়ে যাবে। এ দলেব মধ্যে নিজামব কমচাবীবাই ওধ নয়, বোম্বাইয়েব একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ বাড-ও জুটে গিয়েছিলেন। অবশ্য, এই সব ডাকাডলেব ভাগ্যে লাভেব অঙ্কে পড়েছিল শুধুই কষেক সব বাডন বুলো, আব বিশ্ব-ললিতকলাব লোকসানেব খতিয়ানে যে গন্ধটা পড়লো তা সুবীজন নিশ্চয় অনুমান কবতে পাবেছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হিস এক্সলটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুরেব চৈতন্য হল—তিনি আঁকন কবে এই লুঠেবাবদেব চকাবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অয়দে, বাড-জলেব অত্যাচারে, আব লুঠেবাবদেব কেবামাত্র অজস্রাব অনেক ছবিই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডী হেবিংহাম ভাবতবর্ষে আসেন এব অজস্রা দর্শন কবে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি অনর্ভাবিলম্বই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাব ভাবতবর্ষে ফিরে আসেন এই চিত্রগুলিব নকল কবানোব ব্রত নিয়ে। তাবই উদ্যোগে অজস্রাব কতকগুলি গুহাচিত্রেব নকল কবা হয়। এই নকলগুলি লেডী হেবিংহাম লণ্ডনেব ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে উপহাৰ দেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি সেগুলি দু-খণ্ডে প্রকাশ কবেন—‘অজস্রা ফেস্ফাস’ নামে।

বাংলা দেশেব বিদ্বৎসমাজেব কানেও অজস্রাব গৌরবমণ্ডিত চিত্রসম্ভাবেব কথা এসে পৌঁছাল। ফলে, শিল্পাচার্য নন্দলাল, অসিত হালদার, সমবেন্দ্র প্রমুখ, মুকুল দে প্রভৃতি বণ্ডনা হলেন অজস্রাব উদ্দেশ্যে। এবাও নিয়ে এলেন অস খা অনুলিপি।

লেডী হেবিংহামকে তাব গ্রন্থ-বচনাব যাবা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কবেছিলেন, তাবদেব মধ্যে মিস ডবোথি লার্চাবেব নাম সবপ্রথমে কবতে হয়। নন্দলাল, অসিতকুমাব, সমবেন্দ্র প্রমুখেব চিত্রও তাঁব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ ফজলদ্দীনেব অনুলিপিও আছে তাঁব গ্রন্থে। পবোক্ষভাবে তাকে সাহায্য কবেছিলেন ভগ্নী নিবোদিতা, ববীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

শিল্পী মুকুল দে আসেন তাব অল্প কিছুদিন পবে। প্রথমবাব ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ও দুই বছর পবে দ্বিতীয়বাব। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আব আই এ-ব সঙ্গে তাব অজস্রাতেই সাক্ষাৎ হয়।

তাঁব অনেকগুলি চিত্রেব অনুলিপি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ‘মাই পিলগ্রিমেজ টু অজস্রা এ্যাণ্ড বাঘ’ নামে একটি গ্রন্থে স্থান পায়।

হায়দাবাদেব নিজাম ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সবকাবে একটি পুঁতাত্ত্ব বিভাগ খোলেন এবং অজন্তাব গুহাচিত্রগুলি স বক্ষণে যত্নবান হন। বিশ্বযুদ্ধেব অবসানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে থেবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজামেব প্রচেষ্টায় ও অর্থে দুজন ইটালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লবেনৎসো চেচ্চোনি আৰ কাউন্ট অর্সিনি বহু পৰিশ্রম কৰে গুহা-চিত্রগুলিকে সাফ কৰেন। ইতিমধ্যে চিত্রগুলিকে মেবামত কৰবাব সত্ৰুপদেশে যে সব নিবৃষ্ট শিল্পী খ্যালথুশিমত বাজে বঙ লাগিয়ে অজন্তাব চিত্রগুলিকে অনববান্ধবশত সবনাশব পথে ঠেলে দিয়েছিল, এই দুজন তাদেব সেই অপকমগুলি, অর্থাৎ নূতন বঙেব আন্তব ঘৰে ঘৰে তুলে ফেললেন। তাব উপব আঠাব মত স্বচ্ছ এমন একটি প্রলেপ দিলেন যাতে বঙগুলি জ্বলে না যায়, দেওয়াল থেকে খসে না পড়ে। এঁবা ছুঁজনেই ছিলেন এ কাজে অভিজ্ঞ। ইটালিতে এই জাতীয় কাজ ইতিপূবেও হয়েছে সিস্তিন চ্যাপেলে। ইটালিব একটি মনাস্টারিয় স্যাতসেঁতে নীচু ঘৰেব দেওয়ালে তাঁব। লেওনাদো দা ভিঞ্চিব বিশ্ববিখ্যাত 'শেষ সাযমাশ' প্রাচীর-চিত্রটিকে এভাবেই উদ্ধাব কৰা হযছিল।

নিজাম সবকাবেব পুঁতাত্ত্ব বিভাগ আৰও কেটি ভাল কাজ কৰলেন। ডা গোলাম ইবাজদানিব সম্পাদনায় বিবট চাব খণ্ড অজন্তাব একটি এ্যালবাম প্রকাশ কৰ। হল। প্রথম খণ্ডটি পকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ খণ্ডটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই চাব খণ্ড চিত্রসম্ভাবে অধিকা শ ছবিই ই-এল ডেসি নামে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্র-শিল্পী বঙিন ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। গ্রিথিথ তাব গ্রন্থে চিত্রসম্ভাবে পূণ প্রত্যেকটি গুহাব প্লান ছাড়া দেওয়ালেব স্ৰিভমান-ও এক দৈবেছিলন, ফলে চিত্রগুলিব অবস্থান বুঝে নেওয়া সহজ হযছিল। আনক পবে প্রকাশিত হলেও ইবাজদানি সবন্ধেই চিত্রগুলিব অবস্থান দেখিয়ে সংক্ৰিত নম্বা দেন নি ফলে, তাব গ্রন্থ অনুসরণে বাস্তবে চিত্রগুলিকে সনাক্ত কৰা শক্ত হয পড়। তাব গ্রিথিথৰ চেষ্টে ইবাজদানিব একটা বড় স্তবিবা ছিল। ইতিমধ্যে পুঁতাত্ত্ব ও ইহাসৰ পণ্ডিতবা ফলোথলিব সঙ্গে জাতব-বৰ্ণিত কাছিনীৰ সম্পক জাবিকাৰ কৰে বালোচন। ফাল গিৰিকাথৰ চেষ্টে ইবাজদানিব পক্ষে চিত্ৰেব সমালোচনা কৰা সহজ হবোছিল।

এছাড়া ইউ-এন-ই-এস-সি-ও বা ইউনেসকো গজছা সম্বন্ধে ৩১টি বঙিন ছবিসুধ্ব একটি চমৎকাৰ এ্যালবাম প্রকাশ কৰাছেন। শুৰ তাই নয়, এব মূল্য বেশী হওয়ায় ইউনেসকো সেই গ্রন্থটিব একটি স্বল্পমূল্যেব পকেট এডিমান-ও পকাশ কৰেছেন। মূল্যেব দিক থেকে বিচাব কৰলে পকেট বইটিকে অপূৰ বলা যেতে পাৰ

স্বাধীনতাৰ পব ভাবত সবকাবেব ললিতকলা এ্যাকাডেমি গজন্তাব উপব একটি এ্যালবাম প্রকাশ কৰেছেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এতে আছে বিশটি ছবি ১৪ X ১১' মাপেব। মূল্য মাত্র দশ টাকা। আট আনায ঐ মাপেব একখানি বঙিন ছবি নিশ্চয়ই খুব সস্তা, কিন্তু তবু বলব এতে যে সব বঙ ব্যবহাৰ কৰা হয়েছ, সেগুলি ঠিক বাস্তবায়ন হয নি সব ক্ষেত্রে। সহজলভ্য কৰতে গিয়ে এ্যাকাডেমি এ-জাতীয় বঙেব স্বেচ্ছাচাৰিতা

## অপরূপা অজন্তা

না কবলেই ভাল কবতেন। বোধ করি, এম চেয়ে শুধু বেখায় অধিকাংশ চিত্র একে নমুনা-স্বরূপ ছু'একখানি বঁাঙন চিত্র দিলে খুব ভাল হত এবং যদি সেই ছু'একখানি বঁাঙন চিত্র গ্রিফিথ, ইয়াজদানি বা ইউনেস্কো'র গ্রন্থের মতো বাস্তবানুগ হত! তবু লালিতকলা এ্যাকাডেমি যে অজন্তার বিষয়ে একটি সহজলভ্য এ্যালবাম প্রকাশ কবেছেন, এজন্তাই তাঁরা ধন্যবাদার্থ।

একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। অজন্তা পুনর্বিষ্কৃত হয়েছে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু সেখানে তখন কি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাই বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পাই না। সেটা পাই প্রায় ষাট বছর পরে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বার্জেস গুহাগুলি পরিদর্শন করে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি তখন ১৬টি গুহার ভিতর চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ষোলটি গুহা হচ্ছে—১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২ আর ২৬। আগেই বলেছি, এর ভিতর ১১টি গুহা থেকে গ্রিফিথ সাহেব তাঁর ছবিগুলি একেছিলেন। সে হিসাবে গ্রিফিথ যে গুহা থেকে কোন চিত্র আঁকেন নি. সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৪, ৭, ১৫ ও ১০। গ্রিফিথ ও ডাঃ বার্জেস প্রায় ২২সাময়িক, ফলে অনুমান করতে পারি গ্রিফিথ এই চারটি গুহা থেকে চিত্র আঁকেন। ন হ'ল। কবেই, চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বলে নয়। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দী যখন পর্যায়ক্রমে বছরের বুড়ী, তখন দেখছি মাত্র ছটি গুহায় আছে দর্শনীয় চিত্রসম্ভাব। সেগুলি ১, ২, ৯, ১০, ১৬ আর ১৭। তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল? অজন্তার চিত্রগুলির জন্ম ঐ: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। এগারশ' বছর অজ্ঞাত উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল অজন্তা--সহস্রাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝা-বষণ, বন্যজন্তু ও পাখীর অত্যাচাবেও চিত্রগুলি ছিল অক্ষয়। আর আধুনিক সভ্যগণ তাই সন্ধান পাওয়ার পর, তাই সঙ্গে যাব কবতে শুরু করা মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যেই শুকিয়ে যেতে বসেছে অজন্তা!

জানি, আপনি বলবেন এম জন্তু দায়ী সভ্য (?) মানুষের কালাপাহাড়ী অত্যাচার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বর্তমান শতাব্দীর জন্মমূহূর্ত পর্যন্ত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে মানুুষের অত্যাচাবেই ষোলটি গুহার চিত্র কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ছটিতে। হতে পারে। এম জবাব দিতে গেলে জানতে হয়, নিজাম সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে যখন 'অজন্তা সংরক্ষণের আয়োজন করলেন, তখন কতগুলি গুহায় চিত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হয়তো পূর্বাভাস বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সে সংখ্যাটি জানেন—আমি জানি না। কিন্তু তবু আমি বলব শুধু তাও নয়। আমার যুক্তিব সপক্ষে আমি লেডী হেরিংহাম ও শিল্পী মুকুল দে-র গ্রন্থ দুটি দাখিল করতে চাই। এ দুটি গ্রন্থে যে সব চিত্র দেখছি তাই অনেকগুলি তো আজ বাস্তবে নেই। ডরোথি লাচার, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে, অসিত হালদার প্রভৃতি যখন ছবি এঁকেছেন, তখন তো কালাপাহাড়ী অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে ?

বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকের দল বসেছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আমি বিশেষজ্ঞও নই, বৈজ্ঞানিকও নই—তাই আমার কল্পনার বাশ আলগা করে দেওয়ায় কেউ বাধা দিতে

আসবে না। আমার তো মনে হয়, বৈদ্যুতিক প্রখর আলোব সংস্পর্শেই শুধু নয়, আধুনিক মানুষের গায়েব গন্ধেও এই চিত্রগুলিব বড় জ্বলে যাচ্ছে! হিংসায় উন্মত্ত এই আধুনিক পৃথিবীর ঘোব কুটিল পথ আব লোভ-জটিল জীবনযাত্রা ববদাস্ত কবতে পাবছে না অজন্তা। তাই সে শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝবে খসে যাচ্ছে—তাই তাব অম্লকৃতিগুলিকে অতি সযত্নে সংরক্ষণেব ব্যবস্থা কবা সত্বেও বাবে বাবে আঙনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি!

অজন্তায় সর্বসমেত ত্রিশটি গুহা-মন্দিব আছে। এখানে একটা কথা বলে বাখি। অনেক সাধাবণ লোকেব ধাবণা, বৌদ্ধ শিল্পীবা বুঝি প্রাকৃতিক গুহায় কিছু দেওয়াল-চিত্র এঁকেছিলেন—আব তাকেই বলা হয় অজন্তা-চিত্র। মোটেই তা নয়। এগুলি প্রাকৃতিক গুহা মোটেই নয়। বীতিমত পাথব কেটে গুহাগুলিকে এঁবা খুঁড়ে বাব কবেন। তাবপব অমসৃণ পাথবেব দেওয়ালকে ঘষে ঘষে মসৃণ কবে তোলেন। আব তাবপব সেখানে ঐকেন ঐ ফ্রেস্কোগুলি। কী-ভাবে তাঁবা এগুলি খনন কবতেন, সে সযত্নে পবে আলোচনা কবব। আপাততঃ সেকথা থাক।

এই ত্রিশটি মন্দিবেব ভিতব মাত্র পাঁচটি (৯, ১০, ১৯, ২৬ ও ২৯) হচ্ছে চৈত্যা বা উপাসনাগৃহ। বাকি পঁচিশটি বিহাব বা সজ্জাবাম। এগুলি বৌদ্ধ শ্রমণদেব আবাসস্থল। এব ভিতব প্রধানতম গুহা-মন্দিব বোব হয় দশম চৈত্যাটি। মোট কথা, ১০, ৯, ৮, ১২, ১৩ ও ৩০ এই ছটি গুহা-মন্দিবই প্রাচীনতব যুগেব। এই ছটি ষাঁষ্ট জন্মের ছ'শ' বছব পূর্ব থেকে ছ'শ' বছব পবে—মোটামুটি এই চাবশ' বছব সময়ব ব্যবধানে নির্মিত। বাকিগুলি সপ্তম শতাব্দীব ভিতব তৈবী। অর্থাৎ, হিসাবে দাঁডাল—অজন্তা তিল তিা কবে গড়ে উঠেছিল প্রায় ছ-সাতশ' বছব পবে, আব অজন্তা অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল আবও প্রায় হাজাব বছব।

কে বা কাবা অজন্তা পাহাডেব বৃকে গুহা-মন্দিবেব কাজ প্রথম শুরু কবেন, আজ আব তা জানবা উপায় নেই। সম্রাট অশোকেব আমলে গযাব বাছে চাবটি গুহা-মন্দিব তৈবি হয়েছিল—শুদামা, কর্ণ-কৌপব, লোমশ-ঋষি আব বিশ্ব-ঝোপড়ি। এগুলি প্রাকৃতিক গুহা নয়—মানুষেব তৈরী। অশোকেব সময় বৌদ্ধ ধর্ম নূতন কবে প্রাণ পেয়েছিল, একথা আমবা জানি। বৌদ্ধ ভিক্ষুব দল লোকালয় ত্যাগ কবে নির্জন প্রান্তবে তাঁদেব উপাসনা-মন্দিব এবং সজ্জারাম তৈবি কবতে প্রযাসী হলেন। মৌর্য যুগেব পব সাতবাহন যুগে দেখি, বোম্বাইয়েব কাছাকাছি নাসিককে কেন্দ্র কবে অনেকগুলি গুহা-মন্দিব তৈবি হচ্ছে, ভাজা, নাসিক, কার্লে প্রভৃতি স্থানে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাব বৃকে একদল বৌদ্ধ শ্রমণ অনলস পবিশ্রমে গড়ে তুলছেন কতকগুলি গুহা-মন্দিব। প্রায় সেই সময়েই অজন্তাব দশম গুহা-মন্দিবটি নির্মাণ শুরু হয়। সে যুগকে আমবা বলি হীনযান বৌদ্ধ যুগ। তখন বুদ্ধদেবেব মূর্তি খোদাই করা হত না। শাক্যমুনিকে বোঝবার জন্ত ব্যবহাব কবা হত কতকগুলি সাক্ষাতিক চিহ্ন—পদ্মফুল, ধর্মচক্র, স্তূপ, চবণ-চিহ্ন, বোধিবৃক্ষ বা শূন্য



সিংহাসন অথবা শূণ্য রাজছত্র। অজস্তার অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহা-মন্দিরগুলি সেই যুগেব। এদেব ভিতব যদি বুদ্ধদেবেব কোন মূর্তি বা চিত্র দেখেন, বুঝবেন সেগুলি পরবর্তী মহাযান যুগেব সংযোজন।

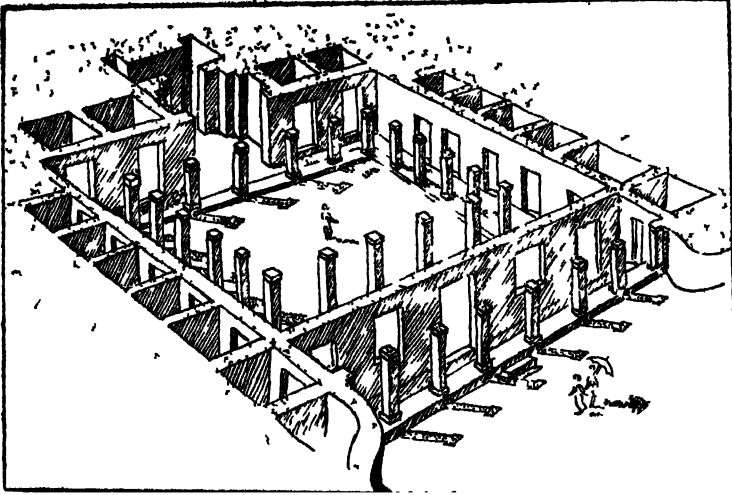
উত্তর ও মধ্য ভাবেত যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যেব স্বর্ণযুগ, তাব প্রায় সমসময়ে দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি শক্তিশালী রাজ্যেব সন্ধান পাই ইতিহাসে। বাকাটক ও পবে বাদামির চালুকা রাজবংশ (বর্তমান মহীশূব) এবে বাষ্ট্রকুটবা। বৌদ্ধ ধর্মেব তখন মহাযান যুগ। অর্থাৎ, তখন শাক্যমুনিব মূর্তি তৈরি কবা বেওয়াজ শুরু হয়েছে। অজস্তাব আধিকাংশ গুহা-মন্দির এই মহাযান যুগে।

দীর্ঘ সাত-আটশ' বছর ধবে তিল তিল কবে গড়ে উঠেছিল অজস্তা। প্রথমে হয়তো ছিল কয়েকজন একান্তবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুব নির্জন আবাসস্থল, ন'নম্বব চৈত্যাটিকে ধিবে। ক্রমে হয়তো এব স্থান-মহায়ে মুগ্ধ হয়ে আসতে শুরু কবেন অগাণ্ড ভিক্ষু এবে অর্হতেরা। মহাযান যোগাচাবেব প্রবর্তক মহাভিক্ষু আসঙ্গ যে দীর্ঘদিন এখানে বাস কবে যান, তাব প্রমা। পাওয়া যায় বৌদ্ধ শাস্ত্রে। সে-যুগে অজস্তাব কী নাম ছিল, আজ আব তা জানবা উপায় নেই। সপ্তম শতাব্দী'ব চৈনিক পবিত্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ অজস্তায় পদার্পণ কবেন নি, তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব কাছ থেকে শুনে তিনি এব উল্লেখ কবেছেন তাঁব ভ্রমণ-বৃত্তান্তে।

নবম বা দশম শতাব্দীতে অজস্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্রাক্ত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু কেন, তা আজও জানা যায় নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব ধ্বজাধাবা অথবা মুসলমানবা এসে এই নিজন গুহাবাসী বৌদ্ধ ভ্রমণদেব যে আক্রমণ কবে নি, তা অনুমান কবা শক্ত নয়। মূর্তিগুলিব নাক ভাঙা নয়; দেওয়াল-চিত্রগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে—অগ্নিকাণ্ড, লুট-তবাজেব কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যদি মনে কবি, কোন বাষ্ট্রনৈতিক কাবণে অথবা কোন ব্যাপক মহামারী'ব ভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুব দল কোনও নিবাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেব আব ফিবে আসাব সুযোগ পান নি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে, সেক্ষেত্রে গুহা-মন্দিরগুলি তাবা আলুগা পাথব দিয়ে বন্ধ কবে গেলেব না কেন? বৃষ্টি ও পাথব অতাচাব থেকে গুহাচিত্রগুলিকে বন্ধ কবা এ সহজ ব্যবস্থাটুকু নিশ্চয় তাবা সেক্ষেত্রে কবে যেতেন। তা তাঁ'ব কবে যান নি। প্রায় হাজার বছর পবে তঠাৎ যেদিন অজস্তা পুনরাবিস্কৃত হল, সেদিন গুহামুখগুলি খোলাই পাওয়া গিয়েছিল, অথচ বৌদ্ধ ভ্রমণদেব ব্যবহৃত কোন বস্তু পাওয়া গেছে বলে শুনি নি। ভিক্ষুপাত্র, জপেব মালা, যষ্টি, বাসনপত্র—কই কিছুই তো ছিল না গুহা-মন্দিরে! কেন?

একেব পব এক গুহা-মন্দিরগুলি দেখতে থাকি। ভবিষ্যৎ যাত্রী'ব সুবিধ হবে মনে করে বিচিত্রিত গুহা-মন্দিরগুলিব একটি কবে প্র্যান এবং বিখ্যাত শিল্প-নিদর্শনগুলিব অবস্থান যতদূর সম্ভব এখানে সন্নিবেশিত কবে দিলুম। আমবা বাষ্ট্রী'ব প্র্যান দেখতে অভ্যস্ত, তবু প্র্যান বলতে কি বোঝায় একটু আলোচনা কবে নেওয়া উচিত।

প্রথম গুহা-মন্দিরটিকে যদি আমরা মাটির সমান্তরালে বস্তুনাথ কেটে দু-আধখানা কবতে পাবি এবং উপরের আধখানা সবিঘ্নে ফেলতে পাবি, তাহলে এবোপ্তেন থেকে গুহা-মন্দিরটির আলোকচিত্র নিলে সেটি চিত্র-৩-এর মতো দেখতে হবে। এটাকেই আমরা সাঙ্কেতিক চিত্র-৪-এ প্ল্যান বলে বোঝাতে চেয়েছি। চিত্র-৩ ও চিত্র-৪ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে প্ল্যান বলতে কি বোঝায়। নেহাৎ অনুবিধা হলে কোন এঞ্জিনিয়ার বা গুভারসিয়ার বন্ধুকে বলুন ব্যাপারটা বুদ্ধিতে দিতে। এটা না বুঝে নিলে প্ল্যান দেখে

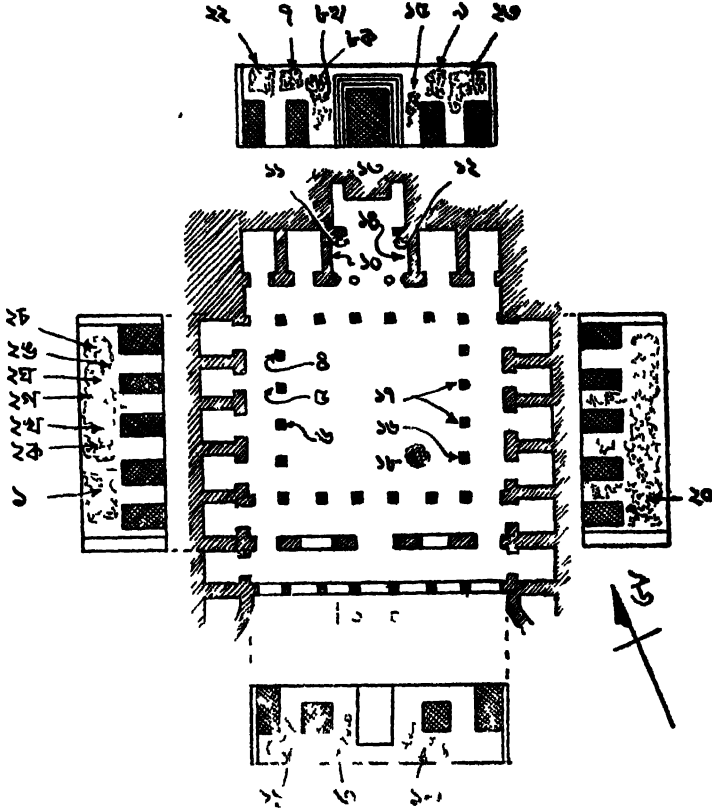


চিত্র ৩

প্রথম গুহা মন্দিরের উপরের পাহাড় সবিঘ্নে নিশে খেনন দেখানো।

পরে শিল্প-নিদর্শনগুলির সনাক্ত কবতে পারাবন না মনে রাখাবন, অজস্রায় আপনাকে নিশ্চয় যোগ্য হবে একদিন, তাব এখন হাতে সময় থাকাব অশাস্ত অল্প। ফাল, প্ল্যান দেখে কেমন কবে বস্তু অবস্থান চেনা যায়, সেটা শিখতেই হবে।

কিন্তু মশ কিল হচ্ছে, প্ল্যানে তো শুধু মেনোটারাই দেখছি অথচ শিল্প-নিদর্শনগুলি আছে দেখালে। প্ল্যানে তো দেওয়ালের ছবি দেখা যায় না। শীট এখানে প্ল্যানেব চাব-পাশে চাবটি দেওয়াল এক দেওয়া হয়ছে। ব্যাপারটা কেমন জানন ? মনে ককন চিত্র-৫-এ একটি কাচের বাস্তু দেখা যাচ্ছে, যাব উত্তর, দক্ষিণ, পূব ও পশ্চিম প্রাচীরেব ভিত্তবদিকে ক, খ, গ, ঘ-এই চাবটি অক্ষব যথাক্রমে লেখা আছে। এই কাচের বাস্তুটির প্ল্যান হচ্ছে নিচের কেন্দ্রস্থলে ঐক্য আয়তক্ষেত্রটা। কিন্তু প্ল্যানে আমরা দেওয়ালের লেখাগুলি দেখতে পাচ্ছি না। এবাব মনে ককন, ঐ কাচের বাস্তুটির চাবটি দেওয়াল খুলে মাটিতে পেতে দেওয়া হয়েছে। আর তাবপব আমরা তাব প্ল্যান একেছি। তাহলে ঐ কেন্দ্রস্থলের প্ল্যানেব চাবপাশে চাবটি দেওয়ালকে দেখতে পাব। মাটিতে পেতে দেবার পর অক্ষবগুলি কোথায়

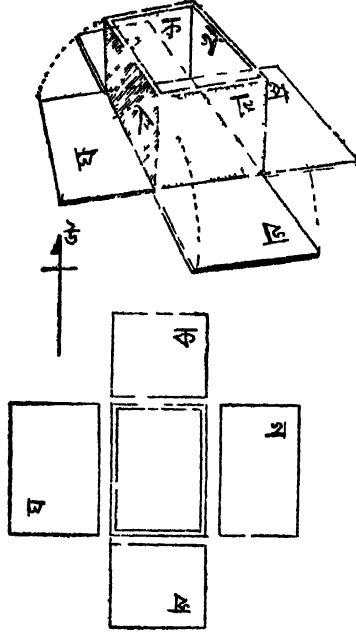


চিত্র ৭

প্রথম গুহ মন্দিরের প্ল্যান

- |    |                                    |    |   |
|----|------------------------------------|----|---|
| ১  | ফতাপাল জাতক                        | ১  | মার বড়ক শূঙ্কর তপস্বীভক্তের চোরা               |
| ২  | মহাজনক ভাতক                        | ১১ | গন্ধা (পত্তর মূর্তি)                            |
| ৩  | মহাজনক ও সীতলী (চিত্র ৭)           | ১২ | যুনা (পত্তর মূর্তি)                             |
| ৪  | মহাজনক সন্ন্যাসী দর্শনে চলছেন      | ১৩ | বাবনাথ মুগদা/ব পদ্মাসনে বুদ্ধাধব (প্রের মূর্তি) |
| ৫  | হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী দর্শন     | ১৪ | সংশয় বৃক্ষ ৩ বস্তীর ঘটনা                       |
| ৬  | প্রবল্যাগহণ (চিত্র ৮)              | ১৫ | মুখী গাভুরারী (চিত্র ১)                         |
| ৭  | শিবি ভাতক                          | ১৬ | মুহুতী (প্রের মূর্তি)                           |
| ৮  | নাগরাজা স্তম্ভেলে প্রণামবত         | ১৭ | বাব চরিত্রের এক মাথা (পত্তর মূর্তি)             |
| ৯  | যুগধান বওষ                         | ১৮ | পারশ্ব সম্রাট ঝুগরো ও রানী শীরীন (৭)            |
| ১০ | বড়ভুজ বামনমূর্তি                  | ১৯ | চাম্বুক/বাচ দ্বিতীয় পুলকেশ্বর রাজসভা           |
| ১১ | রাজপুত্রের অভিবেক-গ্রান (মহাজনক ?) | ২০ | চিব সনাক করা যায় নি                            |
| ১২ | অবলাকিতেশ্বর পদ্মপাণি              | ২১ | পুবনামিনীর দ্বারে মহাভিক্ষু (চিত্র-১৪)          |
| ১৩ | অবলাকিতেশ্বরর কুলা দায়িকা         | ২২ | বোমিসঙ্ক ও অর্যাবান (মহাজনক ভাতক ?)             |
| ১৪ | অনশোকিতেশ্বর বজ্রপাণি              | ২৩ | চম্পেরা দ্বা এক                                 |

কেমনভাবে দেখা যাবে, লক্ষ্য কবে দেখুন। অর্থাৎ, বাস্তব মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকেব দেওয়ালের দিকে তাকালে 'ক' অক্ষবটিকে দেওয়ালে যেখানে দেখব, প্ল্যানের উপবদিকে তাই দেখানো হয়েছে। আবার দক্ষিণ দিকে মুখ কবে দক্ষিণেব দেওয়ালটিকে কেমনভাবে দেখতে পাব জানতে হলে, ছবিটা উল্টিয়ে 'খ' অক্ষ-চিহ্নিত চতুষ্কোণটিকে দেখুন।



চিত্র—৫

এ ব্যাপাবটা যদি বুঝতে পাবেন, তাহলে চিত্র—৪-এব সাহায্যে প্রথম গুহা-মন্দির দাঁড়িয়ে কোন্ দেওয়ালে কোন্ ছবিটি কোথায় আছে, তা খুঁজে বাব কবা নিশ্চয় কঠিন হবে না আপনার কাছে।

অজস্তুব প্রথম বিহাবটি ৬০০ থেকে ৬৫২ খ্রীষ্টাব্দেব ভিতব নির্মিত। 'প্রথম' বলেছি বলে এটাকে আদিমতম মনে কববেন না। অবস্থান অনুসাবে এটা প্রথমে দেখা হয় বলেই এব 'নাম' প্রথম গুহা-মন্দির। এটি চালুকা বাজাদেব আমলে তৈরী। মহাযান বৌদ্ধ যুগে। গুহাব সম্মুখে একটি গাডি-বাবান্দা বা পোর্চ ছিল—এখন তাব চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমেই একসাবি স্তম্ভ। ছটি পূর্ণকায় স্তম্ভ আব ছটি অর্ধকায়, অর্থাৎ

প্রথম গুহা-মন্দির

প্রাচীর-গাত্রে অর্ধ-গ্রথিত পিলাস্টার। স্তম্ভমূল চতুষ্কোণ, উপবাংশ আট-কোণা। প্রবেশপথের দুদিকে অর্থাৎ মাঝেব স্তম্ভ দুটিতে অলঙ্করণ অগ্ন ছটি স্তম্ভেব চেয়ে বেশী। যো শিল্পী আগস্তক যাত্রীর দৃষ্টি প্রবেশপথের দিকে কেন্দ্রীভূত কববাব জস্তুই এভাবে অলঙ্করণ কবেছেন। অলিন্দ পাব হয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে এবাব

গুহার প্রবেশ করা গেল। ভিতরটা বেশ আলো-আঁধারি। কিন্তু এ গুহাতে বৈজ্ঞানিক আলোর ব্যবস্থা আছে। টিকিট দেখালেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি জোবালো বাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাচীর-চিত্রগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। প্লাগ পয়েন্ট থেকে দীর্ঘ ফ্লেক্সিভ তাব দিয়ে বাস্‌চি যুক্ত। ফলে, বাতিব উৎস ক্রমাগত সঞ্চবণশীল। অর্থাৎ, প্রাচীর-চিত্রগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যদি আপনার পূর্ব-অভিজ্ঞান না থাকে, জাতক-বর্ণিত কাহিনীগুলি যদি আপনার আগে থেকে না শোনা থাকে, তাহলে এই অল্প সময়ে চিত্র-কাহিনীগুলি সনাক্ত করা হুঙ্কর এবং তাব পূর্ণ বসান্বাদন অসম্ভব। আব কী ছঃখেব কথা, যে কযদিন আমি সেখানে ছিলাম, দেখেছি অসংখ্য যাত্রী আসছেন, আব চলে যাচ্ছেন। এই বিশ্ব-বন্দিত চিত্রশিল্পেব পূর্ণবস তাঁরা পাচ্ছেন না। এবং তাঁরা কি হাবাচ্ছেন তাও তাঁরা জানেন না!



চিত্র-কাহিনীগুলি অধিকাংশই জাতকেব গল্প। গৌতমবুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব লীলা কবেছেন, সেই জাতিস্মব মহাপুরুষ-কথিত সেই সব কাহিনীই জাতকেব গল্প নামে পরিচিত। সর্বসমেত পাঁচশ'ব উপব জাতকেব গল্প আছে। এক এক কপ নিয়ে বুদ্ধদেব ধবাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরা পূর্ণ বুদ্ধ নন,—তাঁরা বোপিসব। বুদ্ধধ লাভেব পথে বিভিন্ন জন্মচক্রেব মব্য দিয়ে তাঁরা চলেছেন এ মর্ত্যভূমে নানান লীলা কবে, মহাপরিনিবাণেব পথে। জাতক-বর্ণিত চিত্র-কাহিনী বর্ণনা কবাব সময় প্রথমে আমাদের মূল কাহিনীটি জানতে হবে—তাবপব তাব চিত্রনাট্যকপ এবং সবশেষে তাব সমালোচনা বা বসোপলক্ৰিব প্রয়াস। এই পথেই অগ্রসব হতে হবে আমাদের।

প্রথমেই নজবে পড়লো সজ্বপাল জাতকেব কাহিনী ( ১/১ ) :

বাবাণসী মহাবাজেব পুত্ররূপে জন্ম নিলেন বোধিসব। তিনি উপযুক্ত হলে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে কাশীবাজ বানপ্রস্থ নিলেন। একটি নির্জন হ্রদেব তীরে কুটিব তৈরি কবে তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন কবতে থাকেন। সেই হ্রদে বাস কবতেন নাগবাজ সজ্বপাল। তিনি প্রত্যহ ঐ সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মকথা শুনতে আসেন। একদিন পিতাকে দেখতে এসে বোধিসব নাগবাজ সজ্বপালকে দেখতে পেলেন। তাঁব মনে নাগবাজ হবাব বাসনা জাগে। ফলে, পবজন্মে বোধিসব সতাই নাগবাজ হয়ে জন্মগ্রহণ কবেন, কিন্তু নাগলোকেব বিলাস-বৈভব—নাগ-বাজপ্রাসাদেব ঐশ্বর্য কিছুই তাঁব ভাল লাগল

না। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন—দূর থেকে মনে হয়েছিল বুদ্ধি নাগলোকেই আছে  
অপার শাস্তি, বিমল আনন্দ। কিন্তু তা ভ্রান্তিজনক। ভোগে মুখ নেই, তাগেই মুখ।

সঙ্ঘপাল জাতক

বাজাব মনে প্রশান্তি নেই, আছে সর্বভাগী সন্ন্যাসীর মনে। বোধি-  
সত্ত্ব স্থিৰ কবলেন, জগতেব হিতার্থে তিনি আছোৎসর্গ কববেন।  
নাগলোক ত্যাগ কবে তিনি গ্রামের পথে একটি বন্দীকেব উপব বিশ্রাম নিতে  
ধাকেন। মনে মনে বলেন, আমাব এই দেহেব চামড়া দিষে যদি কোন চর্ম-ব্যবসায়ী  
লাভবান হয় তো তোক। কষেকজন শিকাবী সেই পথ দিযে যাওযাব সময় নাগবাজকে  
দেখতে পায় এবং তাবা এই মহানাগকে বন্দী কবে। নাকে দড়ি দিযে তাঁকে টানতে



চিত্র—৬

সঙ্ঘপাল জাতকের অংশ—১১১

টানতে নিয়ে যায় বাজপথ দিযে, নানাভাবে উৎপীড়ন কবে। অহিংসাব মান্দ্র দীক্ষিত  
বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ কবেন না। অবশেষে আলাবা নামে একজন সমৃদ্ধিগালা ভূস্বামী  
স্বর্ণমূল্যে বোধিসত্ত্বকে উদ্ধাব কবেন। মুক্তিলাভ কাব বোধিসত্ত্ব আলাবাকে নাগবাজ্যে  
নিযে যান এবং মহাসমাদবে তাঁকে বাজপ্রাসাদে বাজ-অতিথি কবে বাখেন। বৎসব ধিক  
কাল আলাবা নাগবাজ্যে বাস কবেন এবং প্রত্যহ সঙ্ঘায় বোধিসত্ত্বেব কাছে ধর্মেব কথা  
শোনেন। ক্রমে আলাবাব অন্তবেও জাগে তিতিক্ষা, তিনিও বুঝতে পাবেন ভোগৈশ্বর্ষেব  
মধ্যে শাস্তি নেই, অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দান কবে নিবাপিত কবা যায় না। শেষ পর্যন্ত  
আলাবাও সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন বোধিসত্ত্বেব কাছে।

কাহিনীটি দীর্ঘ। অত্যন্ত সুসংকল্পভাবে স্বল্প পবিসবে শিল্পী এব চিত্র-কাহিনী  
উপস্থাপিত কবেছেন। উপবে বাম কোণে দেখছি নাগবাজ সঙ্ঘপাল মনুষ্যদেহ ধাবণ  
করে হৃদেব ভীবে প্রাক্কন কাশীবাজেব কাছে ধর্মোপদেশ শুনছেন। নাগবাজেব মুখে  
একটি প্রশান্ত জ্যোতি। সন্ন্যাসীকে ঘিবে বসে আছেন কষেকজন মুমুকু। যুবক-সুবতী

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমন কি বনেব পশু-পাখীবাও। তাব ভিতর দেখছি, একটি মেয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীবা পদমূলে চিত্রদর্শকেব দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিবে (চিত্র—৬)। হয়তো এই নাবী-মূর্তিটির কথা মনে কবেই গ্রিফিথ সাহেব লিখেছিলেন :

নারীচিত্র অঙ্কনে অজস্রা শিল্পী বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গির পরিকল্পনা করেছেন। অনেকগুলি নারীচিত্র বিবসনা অথবা সেগুলি এত স্বল্প বস্ত্রাবৃত যে তাদের দেহসৌষ্ঠব সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এমনি কি পশ্চাৎ থেকেও সম্পূর্ণ নারী দেহকে আঁকা হযেছে অনেক ক্ষেত্রে।

নিচেব প্যান্ডালে দেখছি, নাগবাজেব নাকে দাড়ি দিয়ে কয়েকজন শিকারী তাঁকে পথ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। শিকারীদের ঐদিক ক্রমতাব তুলনায় নাগবাজকে এত বিধাল কবে আঁকা হযেছে যে, মহাজেই বোঝা যায়, নাগবাজ স্বেচ্ছায় এ অত্যাচাব সহ্য কবছেন। তা নাহ'লে এই কয়জন মানুষ্যেব পক্ষে ঐ প্রকাণ্ড নাগবাজকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপব নয়।

এ চিত্রগুলি অধিকাংশই নষ্ট হযে এসেছে।

সম্ভবপাল জাতকেব পবে একটি দীঘ কাহিনী মহাজনব জাতক ( ১২ ) :

মিথিলাব মহামন্ত্ৰী চেদিবাজকুমাবেব কণমূলে নিবেদন কবেন : আপনি ডেব্রেজিত হবেন না কুমাব। আপনি বিদ্বান পণ্ডিত সববিভাাপাবঙ্গম। এক উদ্ভিন্নযৌবনা চপলা নাবীব প্রেমবে উত্তর দেওয়া আপনাব পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই।

আত্মবিব্বাসী চেদিবাজকুমাব বলেন। আপনিও অহেতুক চঞ্চল হবেন না মহামন্ত্ৰী। আপনি যান, বাজান্তঃপুব থেকে ডেকে দিয়ে অ'সুন পণ্ডিতম্মতা আপনাদেব বাজকহ্যাকে।

আহ্বানেব প্রযোজন হয না। এতাত্ত্ব সদৃশ উণীবজালিকাব অববোধ সবিয়ে মণিদীপ্ত কক্ষে পদার্পণ কবেন মিথিলাব বাজনন্দিনী বিশ্ববন্দিতা সীবলী।

নিমেবহীন দৃষ্টিতে সেই নাবীমূর্তিব দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ চেদিকুমাব নির্বাক হযে যান। ভূগে যান, পিতৃহীন এই বিতুষা কহ্যটি বোষণা কবেতে, ওকয়ন্ধে যে কেউ তাকে পবাস্ত কবতে পাবে তাবই কণ্ঠে ববমালা দেবে সে। ভূলে যান, পাণিপ্ৰাথী কত বাজপুত্র, কত পণ্ডিত, কাশী তক্ষশীলাব কত সেবা ছাত্রেব দল এখানে এসে অপমানিত হযে ফিবে গেছে। মুগ্ধবিশ্বাসে তিনি দেখতে থাকেন সুবসুন্দবীনন্দিত সুতল্লকা সীবলীব রূপ। বৃষতে পাবেন, দেশ-বিদেশে কেন শোনা যায়—সমস্ত জম্বুদ্বীপে আজ সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দবী হছেন গতায়ু মিথিলাধিপতিব আত্মজা। শুধু রূপ নয়, গুণে-ও তিনি দেবদাজিতা। যাব কণ্ঠদেশে এই বববর্ণিনী নাবী ববমালা দেবে সেই হবে মিথিলাব অধিপতি। তাই বাব বাব লুক ভ্রমবেব দল ছুটে আসে মিথিলায়—ঐ রূপবহ্নিশিখার পদপ্রান্তে পবাজয়েব স্বাক্ষব বেখে ফিবে যায় আবাব দক্ষপক্ষ পতঙ্গব দল।

সীবলী বলে—আর্ঘ, দূতমুখে শুনেছি আপনি নাকি আমাব প্রেমবে উত্তরদানে প্রয়াসী ? কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন বীণাব বঙ্কাব।

চেদিকুমার বলেন—বলে তোমার প্রশ্ন সুন্দরী, দেখি চেষ্টা করে।

একে একে সীবলী পেশ করতে থাকে তার কঠিন প্রশ্নগুলি। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বিদ্যা একত্র করেও চেদিকুমার তার সমাধান খুঁজে পান না। মনে হয়, বৃথাই তক্ষণীলায় এতদিন বেদাভ্যাস করেছেন।

কলকণ্ঠে হেসে উঠে সীবলী : বলে -পথশ্রমই সার হ'ল আর্গুপুত্রের।

চেদিকুমার মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

কিন্তু এভাবে তো রাজ্য চলে না। মিথিলার সিংহাসন শূণ্য। অনতিবিজ্ঞানে সে সিংহাসন পূর্ণ করতে হবে। মহামন্ত্রী বলেন—রাজকুমারী, আমি স্থিরনিশ্চয় বুঝেছি তোমার প্রশ্ন সমাধানের অতীত। আমি বরং স্বয়ম্বর সভাব আয়োজন করি। তুমি নিজ অভিরূচি অনুসারে গাকে ইচ্ছা বরমালা দান কব।

সীবলী হেসে বলে -তা তো হয় না মহামন্ত্রী। আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল। আমার প্রশ্নজালিকাকে ভেদ না করে কেউ আমার অঙ্গস্পর্শ করতে পাববেন।

মহামন্ত্রী ডেকে আনেন গ্রহাচার্যকে ; বলেন : রাজমন্দিরী করকোচ্চি বিচার করে আপনি বলুন ঐব বিবাহ হবে কি না এবং এর ফ্রোড় জন্ম নেবে কি না মিথিলাব ভবিষ্য-নূপতি।

সীবলী সকৌতুকে প্রসারিত করে দেয় পদ্মকোবকতুলা তাব বামহস্ত। গ্রহাচার্য সে রেখা বিচার করে বলেন—রাজকুমারীবিবাহ আসন্ন। কিন্তু মিথিলাব রাজবংশকে ইনি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে যেতে পাববেন না।

কলকণ্ঠে হেসে ওঠে সীবলী : বলে কেন গ্রহাচার্য ? আমি কি শেষ পর্যন্ত কেন নপুংসকের কণ্ঠে বরমালা দিয়ে বসব ?

তরুণীর প্রগল্ভতায় গ্রহাচার্য কর্ণকের জগু যেন আত্মবিম্বিত হয়ে পড়েন। কঠিন-কণ্ঠে বলেন—না রাজকুমারী ; তুমি যাকে বিবাহ কববে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি জনক হবার উপযুক্ত—তিনি মহাজনক। কিন্তু তুমিই তাঁকে তৃপ্ত কবতে পারবে না।

শিউরে উঠেন মহামন্ত্রী, কিন্তু প্রগল্ভা রাজকুমারী হেসে বলে--আবার প্রশ্ন কবছি, কেন গ্রহাচার্য ? এই অধম রমণীর রূপের মোহে শুনতে পাই আজ সমস্ত জম্বুদ্বীপ উদ্ভ্রান্ত। যারা আমাকে প্রত্যক্ষ করে নি, তাবাও আমার রূপবর্ণনা শুনে প্রেমোন্মাদ। আর যে হতভাগ্যকে আমি আমার এই দুই মৃগাল ভুজঙ্ঘয়ে বন্দী করবার সামাজিক অধিকার পাব, সে তৃপ্ত হবে না আমাকে পেয়ে ? কেন ?

গ্রহাচার্য বলেন, কেন জানতে চাও রাজপুত্রী ? শোন তার কারণ। এ হবে তোমার অহমিকার দণ্ডভোগ। রূপের অভিমানে সৌন্দর্যের অহঙ্কারে তুমি এযাবৎকাল যত পাণিপ্ৰার্থীর বৃকে শেল ছেনেছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসের অভিণাপ লাগবে না ভেবেছ তোমার জীবনে ?

মহামন্ত্রী ছই বাছ প্রসারিত করে বলে ওঠেন--ক্ষান্ত হন গ্রহাচার্য !



সীবলী কিন্তু অনমিতা। কোঁতুক ছলে শ্ৰেণগল্ভা নাবী হেসে বলে—আপনি অহেতুক ছুশ্চিস্তা কববেন না মহামন্ত্রী। জগদীশ্বৰ যদি ঐ বুদ্ধ গ্ৰেহাচার্ঘ্যেব কোটবগত চক্ষুতে দিয়ে থাকেন অপবেব ভবিষ্যৎ দেখাব উপযুক্ত দৃষ্টি, তাহলে এ বাজকণ্ঠাব নয়ন-কোণেও তিনি দিঘে বেখেছেন নিজেব ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্ৰণেব উপযুক্ত বিলোল-কটাক্ষ।

গ্ৰেহাচার্ঘ্য সে বান্ধ-বিজ্ৰূপে কর্ণপাত না কবে বলেন—মহামন্ত্রী, আপনি বাজহস্তীকে সুসজ্জিত কবে বাজপথে মুক্ত কবে দিন। মানুষে পাবে নি কিন্তু সে পাবে। বাজহস্তীই নিবাচন কবে দেবে এ বাজ্যেব অধীশ্বৰকে।

বাজপুত্ৰী হেসে বলে—আব আমাব প্ৰশ্নেব উত্তৰ ?

গ্ৰেহাচার্ঘ্য বলেন—মনে আছে বাজনন্দিনী। তোমাব শৰ্তপূৰণ না করে বিবাহ কবতে বাধ্য কবব না আমবা।

কাহিনীৰ দ্বিতীয় দৃশ্য মিথিলাব জনাকীৰ্ণ এক বাজপথ। পথপ্ৰান্তে ধূলিশযায শূয়ে আছেন একজন শালপ্ৰাংশু মহাভূজ যুবাযুগ্ম। কিন্তু তাঁব বসন ছিল, ধূলিমলিন। তিনি হৃতসবস্ব এক সামান্য বণিক। শূয়ে শূয়ে ভাবেছেন নিজ ছুৰ্ভাগ্যেব কথা। এ ছুনিয়ায আজ আব তাঁব আপন বলতে কিছু নেই। এক আছেন জননী—সুদব চম্পানগবে। জননীকে সেই পৰ্ণকুটীবে বেথ অৰ্ণবপোণে, বগিৰ্জা-সস্তাব সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রা কবেছিলে দৌৰ্ঘদিন পূবে। ছবগু সমুদ্র-ঝটিকায তাবপৰ হৃতসবস্ব হয়েছেন। আজ তিনি পথেব ভিখাবীমাত্ৰ। অথচ মায়েব কাছে গুনেছেন, তিনি নাকি এক বাজাব কুমাৰ। তাঁব পিতৃব্য অন্যাযভাবে অগ্ৰজেব সিংহাসন অধিকার কবেন হত্যা কবেন তাঁব পিতাকে। বাস্ত্ৰিবধেব ছুৰ্ভাগ-বাত তাব গম্ভীৰ জননী একাকিনী ছদ্মবেশে পলায়ন কবেছিলেন বাজপুত্ৰী থেকে। গম্ভীৰ অরণ্যে শেষে জন্ম দিযেছিলেন তাকে। পিতৃব্য সমস্ত বাজ্য তন্ন তন্ন কবে অশেষ কবেছেন, সেই পলাতকা নাবাব সন্ধানে—কিন্তু খুঁজে পান নি তাঁকে। ছুৰ্ভাগিনী নাবী এক পৰ্ণকুটীবে সুগোপনে তাঁকে মানুষ কবে তুলেছেন দীনদবিত্ৰেব মত। গোপন বেখেছেন তাব পৰিচয়। জননীৰ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাব পুত্ৰ একদিন পুনকন্ডাব কবে পিতৃবাজ্য। হায়, মায়েব সে স্বপ্ন সফল কবেতে পাবেন নি তিনি হয়েছিলেন বণিক—ভাগ্য-বিপৰ্যযে আজ দীন ভিখাবী।

সহসা বণিকেব কানে যায় কিসেব কোলাহল। উঠে বসে দেখেন—এক শোভাযাত্রা আসছে বাজপথ দিঘে। তাব পূবোভাগে নশিমাণিকে। সুশোভিত এক বাজহস্তী। তাব পৃষ্ঠে সুসজ্জিত এক সিংহাসন, উপবে বাজছত্ৰ। কিন্তু সিংহাসন শূন্য। কোঁতহলী বণিক সভয়ে উপলব্ধি কবেন বাজহস্তী ভীৰবেগে ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য কবেই। মদমত্ত হস্তীৰ পদতলে পিষ্ট হবাব আশঙ্কায় বণিক গাত্ৰোত্থান কবতে যান, কিন্তু তৎপূৰ্বেই সেই বাজহস্তী তাঁকে শুণ্ডে আলিঙ্গনবদ্ধ কবে তুলে নেয নিজ পৃষ্ঠে। অতি যত্নে তাঁকে বসিয়ে দেয সেই শূন্য সিংহাসনে। অমনি চতুৰ্দ্দিকে বেজে ওঠে কাড়া-নাকাড়া-মঙ্গলশব্দ। স্তম্ভিত বণিকেব সম্মুখে শ্ৰদ্ধানত্ৰ প্ৰণতি জানিয়ে মিথিলাব মহামন্ত্রী বলেন—ভদ্ৰ, আপনাব পরিচয়

আমরা জানি না, কিন্তু আপনিই আজ মিথিলা-বাজ্রাব নির্বাচিত মহান অধিপতি। বণিক বিস্মিত হয়ে বলেন—সেকি? কেন? কোন্ অধিকাৰে? মন্ত্রী বললেন—মিথিলাব অধীশ্বৰ পোপজনক দীৰ্ঘদিন গতাযু। তাঁর একমাত্র আত্মজাব জন্ম উপযুক্ত সুপাত্ৰেব সন্ধানে বার্থ হয়ে অবশেষে আমবা এই বাজহস্তীকে সে কাৰ্বে নিযোগ কৰেছিলাম। বাজহস্তী আপনাকেই নিবাচন কৰেছে।

বণিক বলেন—এমন অদ্ভুত নির্বাচনের কথা তো কখনও শুনি নি।

মহামন্ত্রী বলেন আপনাব নাম এবং পৰিচয়?

বণিক বলেন—পিতৃপৰিচয় জানি না। বিশেষ কাৰণে জননী তা গোপন বেখেছেন। আমি ক্ষয়, নাম মহাজনক।

মন্ত্রী বুঝতে পাবেন বাজহস্তী নির্বাচনে ভুল কৰে নি। এহাচাৰ্য বলেছিলেন বটে সীবলীর সীমন্তে যিনি সিন্দূৰবিন্দু অঙ্কিত কৰে দেবেন তিনি জনক হবাব উপাত্ত, তিনি মহাজনক।

কিন্তু বাদ সাধল স্বয়ং সীবলী। বলে—অজ্ঞাতকুলশীলে আপত্তি নেই আমাব, কিন্তু আমাব প্রশ্নের সমাধান?

মহাজনক এগিয়ে এসে বলেন: কী তোমাব প্রশ্ন শুচিস্মিতে? সীবলী এতক্ষণে আগন্তকের দিকে ফিরে তাকায। এবাব স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তাকে। প্রভাতমূৰ্ধেব মত দীপ্তমান এই শালপ্রাংশু মহাভূজ কে? ইনি কি ছদ্মবেশী কন্দৰ্প, অথবা স্বৰ্গেব সিংহাসন শূণ্য কৰে নেমে এসেছেন স্বয়ং শচীপতি শত্রু? বাষকছা উপলব্ধি কৰে ইনিই তাব বাঞ্ছিত বল্লভ, এবই প্রতীক্ষায় এতদিন সে ক্ৰমাগত প্রশাখান কৰেছে আসনুদ্র-হিমাচলেব অযুত পাণিপ্রার্থীনে। কিন্তু যদি ইনি তাব প্রশ্নেব উত্তৰদানে অশক্ত হন? যে কঠিন প্রশ্নবাণগুলিকে বাজকছা এতদিন তাব কৌমায-বক্ষাব ছুঁচ্ছে বম বণে মনে কবত, সেগুলিকেই আজ প্রিয়মিলন-অমৃতায় লৌহ-শৃঙ্খল বলে মনে হল তাব।

মহাজনক বলেন: পেশ কৰতে অহেতুক বিলম্ব কবছ কেন স্মৃচবিত্তে?

ব্রীড়াবনতা সীবলী সংবিং ফিবে পায় লাঞ্জনয় কম্পকৰ্ণে ঠেকে একে পেশ কৰ তাব কুটপ্রশ্নগুলি।

কিন্তু মহাজনক হলেন বস্তৃতঃ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। জ্ঞানব আৰব তিনি, বুদ্ধদেবেব অংশে জন্ম তাব। হেসে বলেন: কি আশ্চয় বাজকমাবী, তুমি এতদূৰ বিগাভাস কৰে এই সহজ সবল প্রশ্নগুলিব সমাধান জান না?

স্তম্ভিত সীবলী শোনে ক্ষুব্ধাব যুক্তিব অশনি-আঘাতে চৰ্ণ-বিচৰ্ণ হয়ে যায় তাব কঠিন প্রশ্নগুলি।

ধীর পায়ে এগিয়ে আসে লজ্জাবনতা কুমাবী। পৰিয়ে দেয অজ্ঞাতকুলশীল মহাজনকেব কৰ্ণে নিজকৰ্ণেব মণিদীপ্ত শতনবী।

বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ, নহবতে বাজতে থাকে মিলনসঙ্গীতের তান। মহাজনক

বলেন বিবাহে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তৎপূর্বে চম্পানগবে পল্যাঙ্কিকা পাঠাও। আমার জননীকে নিয়ে এস এখানে।

গ্রহাচার্য আপত্তি জানিয়ে বলেন—তা যে হবার নয় মহাবাজ। চম্পানগর দীর্ঘদিনের পথ। অথচ গণনায় দেখছি আজ বাত্রি প্রভাতেব মধ্যে যদি বাজপুত্রীবিবাহ না হয়, তাহলে আব তাঁবিবাহযোগ নাই।

মহাজনক আব কি কবেন? ভাগোব হাতে নিজেকে সমর্পণ কবে দেন। বুঝতে পাবেন, জননী এ সংবাদে খুশীই হবেন নিশ্চয়। পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখাব স্বপ্ন তিনি দেখে গ্রাসছেন আজ দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল। এইবার তাঁকে জেনে নিতে হবে তাঁবিপত্নবিচয়! এখন আব তিনি অবাক্ততা পর্ণকুটীববাসিনী পলাতকাব অসহায় পুত্র নন যে, তাঁবিপবিচয় পকাশিত হয়ে পড়লে গুপ্তঘাতক তাঁর ক্ষতি কববে। এবাব মিথিলাব সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি পিতৃবোব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কববেন -পুনকঙ্কার কববেন অজ্ঞাত পিতৃবাজা।

মহা আড়থবে উদযাপিত হয়ে গেল বিবাহ উৎসব। মহাজনক স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকা পাঠিয়ে দিলেন চম্পানগবে - জননীকে সম্মানে মিথিলায় আনয়নেব উদ্দেশ্যে।

জাতকেব কাহিনী এ পর্যন্ত ছিল যেন রপকথা। এখানেই দেখা দিল জটিলতা। পল্যাঙ্কিকা এসে উপনীত হল বাজপ্রাসাদেব অন্তঃপুবে। মহাজনক সস্ত্রীক এসে প্রণাম কবলেন জননীকে। কিন্তু এ কী? বাজমাতা তো আনন্দেব আতিশয্যে জড়িয়ে ধবলেন না গঁদেব? তাঁবিদৃষ্টি বিম্বস্ববুলায় ঝটিকাতাড়িত বিহগীবি মত বিহবল, তাঁবি সমস্ত মুখাবয়বে যেন একবিব্দু বক্ত নাই!

জননীকে ছুই শালপ্রাংশু ভ্রজদ্বয়ে বেঁঠন কবে মহাজনক বলেন- তুমি কি অনুস্তা? পথশমেট কি তোমাব এ দশা?

সে কথাব প্রত্যুত্তব না কবে জননী প্রতিপ্রশ্ন কবেন—বিবাহকার্য কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

হা না। কিন্তু তুমি কি শ্রুগা হণ নি আমার বাজ্যলাভে? এ অনিন্দ্যকাস্তি বমণীবক্তকে পুত্রবধ হিসাবে লাভ কবে তুমি কি তুপ্ত নও?

জননী কোন প্রত্যুত্তব কবেন না। নীবেবে প্রবেশ কবেন অন্তঃপুবে, তাঁবি নির্দিষ্ট কক্ষে। মহাজনক আহত হন জননীবি এই নিকন্তাপ উদাসীনতায় - ততোধিক মর্মান্বিতা হল সীবলী, এ উপেক্ষায়।

নবাগতা বাজমাতাব সেবায়ত্তেব কোন ক্রটি হল না বাজান্তঃপুবে; কিন্তু বুদ্ধা জলস্পর্শমাত্র কবলেন না। কিল্ববীবি মধ্যে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সীবলী, বলে—মা আপনি নাকি সমস্ত দিন উপবাসী আছেন আজ?

জলস্ত আয়েয়গিবির মত ফেটে পড়েন বাজমাতা, ধিক্কার দিয়ে ওঠেন—দূব হয়ে যা রাক্ষসি!

স্তুভিত সীবলী স্বশ্রামাতার এ সম্বোধনে দিশাহারা হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, মহাজনক-জননী বিকৃতমস্তিষ্কা!

সেদিন গভীর রাত্রে গ্রহাচার্যের ডাক পড়ল রাজমাতার নিভৃত কক্ষে। বৃদ্ধ আচার্য দীর্ঘদিন এ রাজপরিবারেব শুভাকাঙ্ক্ষী; যুগে যুগে তাঁকে আসতে হয়েছে এভাবে রাজাস্তঃপুরে--গণনা করে বলতে হয়েছে পুত্রকামিনীদের ললাটলিখন। তাই রাজমাতার আহ্বান মাত্রে আজও তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর রুদ্ধদ্বার নিভৃত কক্ষে। অনবগুণ্ণিতা রাজমাতা মগ্নদীপ তুলে ধরে বলেন--আমাকে চিনতে পারেন মিথিলাবাজের একান্ত সখা মহাগ্রহাচার্য?

এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হন আচার্য, রাজমাতার বিকৃতমস্তিষ্কের কথা ইতিমধ্যেই কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর। ভয়ে ভয়ে বলেন: পাবি বই কি রাজমাতা। আপনি চম্পানগর থেকে সঙ্গ-আগতা মহাবাজ মহাজনকের জননী।

বাজমাতা হাসেন। বলেন আপনি কি শুধু ভবিষ্যৎই দেখতে পান আচার্য? অতীতকে কি দেখতে পান না একেবারেই?

এবার চমকে ওঠেন বৃদ্ধ। স্নান বড়দীপেব মুক্ত আলোয় বলিবেখাঙ্কিত ঐ প্রৌঢ়াব মুখের উপর ফুটে উঠতে দেখেন দীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূর্বেকার আর একটি পুত্রসুন্দরী মুখ। তাকে যেন এখানে, এই ঘরেই দেখেছিলেন একদিন! স্তুভিত গ্রহাচার্য বলেন--আপনি কি... আপনি কি...

সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে ছিন্নলতা মত লুটিয়ে পড়েন বাজমাতা, আঁতকণ্ঠে বলে ওঠেন: হ্যাঁ তাই। আমিই সেই অভাগিনী নারী! আপনার প্রিয় বন্ধু পলাতকা স্ত্রী।

ভূকম্পস্পন্দিত ভূধরের মত একবারমাত্র কঁপে উঠেই স্থির হয়ে যান গ্রহাচার্য। বলেন--ভাগ্যেব কী বিচিত্র খেলা! মিথিলাধিপতি অরিষ্টজনকেব নিকর্দিশ পুত্র মহাজনক আজ তার পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট, অথচ মহারাজের পলাতকা রাজমহিষী সে আনন্দের দিনে ভূসুগ্ধিতা! কেন? না, মহাজনক বিবাহ করেছে তাব পিতৃহৃদ্যা পোপজনকেব কন্যাকে--আপন পিতৃব্যকন্যাকে।

সাশ্রনয়নে রাজমাতা বলেন--আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দিন আচার্য। এ অসামাজিক অসিদ্ধ-বিবাহ কেমন কবে মেনে নেব আমি?

গ্রহাচার্য তাঁকে বাজুল ধরে তুলে বসান, বলেন--তুমি বুঝা মনস্তাপ করছ রাজমাতা। তুমি আমি কুশীলব মাত্র, যে বিচিত্র নাট্যকার অলঙ্কা বসে এই অপূর্ব নাটকটি রচনা করছেন--তিনি আমাদের নাগালের বাইরে। অপ্রতিবাদে তাঁর নাটকে আমাদের অভিনয় করে যেতে হবে শুধু।

রাজমাতা বলেন--কিন্তু আমার স্বামীহত্যা পোপজনকের কন্যা তাব পিতৃস্বর্ণ শোধ করবে না?

: করবে বৈকি রাজমাতা।

: কেমন কবে ? মহাজনকেব মত স্বামী, মিথিলা-বাজ্যের মহাবাগীর বিলাসব্যাসনের বিপুল আয়োজন— তাব দণ্ডভোগ হবে কেমন কবে ?

গ্রহাচাৰ্য হেসে বলেন— ই্যা বাজমাতা, বিলাসব্যাসনের মধ্যেই সে দণ্ডভোগ কবে যাবে। এ বিলাসব্যাসন বিষ হয়ে উঠবে তাব কাছে। তাব কামনাব ধন সে কিছুতেই পাবে না।

: আৰ কি কামনা থাকতে পাবে তাব ?

: নাৰীজন্মেৰ যা শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ। সন্তান।

চমকিতা বাজমাতা বলেন সে কি ? কেন ?

: কাৰণ আপনাব পুত্র মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কোনও অনাচাৰ তাঁব পক্ষে সম্ভবপৰ নয়। নিজ ভগ্নীৰ গৰ্ভে তাঁব সন্তান হবে কেমন কবে ?

বাজমাতা বলেন— ঠিক কথা। আমি পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেব।

গ্রহাচাৰ্য নিরন্তৰ থাকেন।

পবদিনই বাজমাতা ডেকে পাঠালেন পুত্রকে। বললেন সীবলীকে ত্যাগ কবতে হবে। আমি পুনৰায় তোমাব বিবাহ দেব।

মহাজনক প্রশ্ন কবেন সীবলীৰ অপৰাব

: সে কথা শোনাৰ কোন পয়োজন নেই তোমাব। এ তোমাব প্রতি আমাব মাতৃআজ্ঞা।

মহাজনক এব মুহূৰ্ত নীৰব থেকে বলেন আমাকে মাজনা কৰ। তোমাব এ আদেশ আমি মানতে পাবব না।

স্তুতিত বাজমাতা বলেন তোমাব আজন্ম সহচৰ মায়েৰ চেয়ে আজ নববৰই বেশী মূল্যবান ? এই তোমাব শিষ্টা ?

মহাজনক বলেন তুমি ভুল কবছ না। জননীৰ আদেশেৰে চেয়ে এ ছুনিয়াৰ আমি কোন কিছুকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে কবি না। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম আছে তাব।

: কী সেই ব্যতিক্রম ?

: আমাব ধৰ্ম। মাতৃআজ্ঞায় আমি ধৰ্মকে বিসৰ্জন দিতে অক্ষম।

নিৰুপায় বাজমাতা আৰাব ডেকে পাঠালেন গ্রহাচাৰ্যকে। বললেন— মহাজনক সীবলীকে ত্যাগ কবতে বাজী নয়। কিন্তু এ অসামাজিক বিবাহ কেমন কবে মেনে নেব আমি ?

গ্রহাচাৰ্য বলেন— তোমাব এ প্রশ্নেৰ উত্তৰ তো আমি পূৰ্বেই দিযেছি বাজমাতা। মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সম্ভবে সে থাকবে না। বামিনীকাঙ্ক্ষনে তাব কোন মোহ নেই। নাৰীমাত্ৰকেই সে জননীজ্ঞানে, ভগ্নীজ্ঞানে শ্রদ্ধা কববে। এমনকি সীবলীৰ গাত্র-স্পর্শও সে কববে না কোনদিন।

সহসা দলিতা ভূজঙ্গীৰ মত ঋজুভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান বাজমাতা। বলেন— না! আমি

তা হতে দেব না ! স্বামীর বংশ আমি নির্বংশ হতে দেব না । সন্ন্যাস নিতে দেব না পুত্রকে । এ অসামাজিক বিবাহের কথা শুধু আমিই জানি । সমাজ জ্ঞান না । পাপ যদি কারও হয়, হবে আমার ! আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব -কিন্তু পুত্রকে সুখী করতেই হবে ।

গ্রহচার্য মুছ হাসলেন শুধু ।

নিরুপায় হয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন পুত্রবধুকে । সভয়ে সুসজ্জিতা নববধুর বেশে সীবলী আগাব এসে দাঁড়ায় । কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর কোন তিবন্ধার গুণতে হল না তাকে । পুত্রবধুর চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করেন রাজমাতা, স্নেহার্কণ্ঠে বলেন—সব কথা তোমাকে বলতে পারব না । শুধু এটুকু জেনে রাখ - আমার পুত্রের ললাটলিখন সে অকালে সন্ন্যাস নেবে । যেমন কবে পাব সে ভাগালিখন বার্থ কবতে হবে তোমাকে । এই তোমার ভ্রত ! এই তোমার ধর্ম !

সীবলী শিউরে উঠেছিল সেকথা শুনে । তাব মনে পড়ে যায় গ্রহাচার্যের গাভিগোপন কথা । মনে পড়ে যায়, গত ত্রয়ামা যামিনীর ক্লাপ্তিকব অভিজ্ঞতার কথা । মহাজনক এখনও গাত্রস্পর্শমাত্র করে নি এই ভুবনবাঞ্ছিতা রূপদপিতা নারীর !

এর পর থেকে শুরু হয়ে যায় এক নূতন অধ্যায়ে ঐ হতভাগা নারীর জীবনে । বিলাসবাসন ঐশ্বর্ষের আড়ম্ববে আয়োজনের দটি নেই ; কিন্তু রাজা মহাজনক যেন শুভ্র শাজহংস । সংসারের জলবিন্দু মলিন কবে না তাঁর কুন্দশুভ্র পালক । তিনি সর্বদাই কেমন যেন উদাসী, অস্থমন । মগিদীপ্ত প্রমোদভবনের নিভূতে বিকচযৌবনা দেববাঞ্ছিতা সীবলী প্রণয়মধুর কুঞ্জে মহাবাজকে কাছে টানবার চেষ্টা করে, নৃত্যে-গীতে হাশ্বে-লাশ্বে চুম্বনরভসে ঐ অনাসক্ত স্থিতপ্রাণ মন্ত্রযটিকে বিহ্বল করে তুলতে চায় ;—কিন্তু হায়, মন্দভাগিনী স্বতঃই লক্ষ্য কবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঐ তরুণ তাপসের মনের কোণে বনিয়ে ওঠে আষাঢ়সঘন জলদগ্ধক ; তাব দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়—দিগন্তনিবন্ধ দৃষ্টিতে, পার্থিব কোন কিছই আর তখন নজরে পড়ে না তার ।

সীবলী বলে : তুমি কি আমাকে পেয়ে সুখী হও নি রাজা ?

মহাজনক বলে : তোমার স্নেহের মন্দাকিনীতে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি' সীবলী ! মনে হয়, আমার নিজের কোন ভগ্নী থাকলেও আমাকে এত স্নেহ করত না !

স্বর্ষোদয়ে পূর্ণেন্দুর মত গ্লান হয়ে যায় রাজকণ্ঠা !

মৃগালভুজের ছুটি বাছতে মহারাজকে বন্দী করে বলে : কিন্তু আমার দেহমনের নিভূতে প্রেমাস্পদের গ্ৰন্থ কী সম্পদ আমি লুকিয়ে রেখেছি তা তো তুমি দেখতে চাইলে না কোন দিন ।

মহাজনক বলে : শুধু তোমার কেন সীবলী, এই জগতের মর্মমূলে কোন গোপন রহস্য লুকায়িত আছে তাই যে আমি দেখতে চাই । বিশ্বাস কর, এই উপকরণের দ্বর্গে আমার

যেন শ্বাসবোধ হয়ে আসে, মনে হয় এ বাইজেশ্বরের অববোধের মধ্যে আমার স্থান নয়, আমাকে সুদূর যেন হাতছানি দেয়।

সীবলী গোপনে অশ্রু 'মোচন' করে। দৃঢ়তর কবতে চায় তার প্রেমের নিগড়। পবিচারিকাকে বলে—নব আভরণে আমাকে সাজিয়ে দাও কিংবাবী। নিয়ে এস ইন্দ্রনীল-মণিহাব, পবিষে দাও মণিখচিত স্বর্ণমেখলা, অলঙ্ককবাগবঞ্জিত আমার চরণে দাও কলহংস-কণ্ঠ-নিঃস্বনমধুব নূপূব।

প্রসাধনদক্ষাব অনলস কপসজ্জায় কোন কটি থাকে না। বানীব সীমন্তে একে দেয় বালাকবিন্দু, স্তবকিত মেঘভাবের মত গলকণ্ডুছে দেয় পুষ্পাভরণ, যৌবনের যুগ্ম-জয়স্তম্ভের উপর পচনা করে বুদ্ধম-চন্দনের বিচিত্র আলিম্পন।

• হাবাজ দেখে মুগ্ধ হন, বলেন—আহা কী গুলন্দব! যেন স্বর্গের দেবী।

ওনে মবমে মবে যায় পোণজনকওনবা। আওকণ্ঠে বলতে চায়—ওগো না না, দেবী নয়, চেয়ে দেখ, আমি মতের সামান্য মানবা। আমার প্রতি বোমকুপে কামনার শিহরণ, আমার প্রতি অঙ্গে সৃষ্টির অভিলষ, আমার শোণিত-সমুদ্র আজ মিলন-ভূষিত যৌবন-জোযাব।

কিন্তু অনাধাতু সুমাবীব অববোধে বৃদ্ধতেই উচাবণ কবতে পাবে না সেই নির্লজ্জ ভাষ। বুক ফাটে, তবু তার মুখ ফোটে না।

বাজনসীকে নন্দেশ দেয় নিত্য নবীন সাজে, নিত্য নতন নৃত্যভঞ্জিমায় মহাবাজের চিত্তবিনোদন কবাত। কিন্তু বাজমি মহাজনবের মান শাশ্বি তাতে কবতিল বিচলিত হয় না। দিন যায়, মাস যায়, ঋতুও যুবে যুবে আসে উর্বশী-নন্দিত কাপব পশবা সাজিয়ে সীবলী বুবাং প্রহব গণে। মহাজনকের স্নেহ-কন্দনাগাতে সে বধি জানে, কিন্তু সে যেন ওগাব প্রতি শ্রাতাব প্রম। এ লক্ষ্যাব কথা, এ পবাজযের কথা কাটিক বলতে পাবে না প্রাণ খুলে নিকটতমা সখীব কাছের নয়।

গম্ভবঙ্গী বযস্তাব দল প্রশ্রবানে জর্জবিত। কব ত্রোলে তাদব প্রিয় সহচবীকে। তাবা জানতে চাব সখোবিবাহিতা বোবনবতীব প্রতি-বজনীব বিচিত্র অভিজ্ঞতাব কথা। স্কৌতুকে ওণা কলকণ্ঠে প্রশ্র কবে। অত সক্ষেপে বললে চলবে না বাজবুমাবী, আবও বিস্তাবিত কব বল। স প্রশ্নে অনাদৃত্তা বাজনান্দীব হৃৎপিণ্ড যেন নিষ্পোষত হয়ে যায়। মন্দভাগিনী মিথ্যাব কুহক বচনা কবে। স্বকশাল-বল্লিত মিলনের বর্ণনা দেয় যে মিলন আজও হয়নি, যাব স্বপ্ন দেখে সে প্রতি বাএ মহাবাজব পার্শ্বে একাকী বাহিষ্যাপনে

কিন্তু ওদপেক্ষা কঠিন সনস্তাব সঙ্গু ঠান হতে হয় ওকে যখন নিঃসঙ্গ মিলন-বাহিব অবসানে ছাব খুলে বোবযে এসে দেখে গালান্দব একান্তে পেক্ষা কবছেন মহাজনক-জননী। পুত্রবধূকে বকে টেনে নিয়ে যখন ত্রান একান্ত আশ্রহে প্রশ্রবাণ নিঃক্ষেপ করতে থাকেন : আমার কাছে কিছু গোপন কর না মা, বল, সত্য কবে বল, কবে দেখতে পাব মিথিলা-বাজ্যব উত্তরাধিকারীকে ? কবে তুমি সফল কববে আমার স্বপ্ন।

সে প্রেমের গরলে জর্জরিতা হয়ে যায় যৌবনদৃশ্য সীবলীর কব্রতলু।

মন্দভাগিনী অমুভব করে আর বিলম্ব করা অহুচিত। মধুমাংসের এক পূর্ণিমারাত্রে সে যেন প্রগল্ভা বারবণিতার মত উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রসাধনদক্ষার রূপসজ্জাকে নিক্ষেপ করে দূরে। খুলে ফেলে রক্তাস্বর্য পটুবস্ত্র, ময়ূরকঙ্কিণী মেখলাবাস, অন্তর্ভাসের চম্পকচীনাংগুক। সত্তোন্নাতা নিরাবরণার বেশে সজ্জিত করে অনিন্দ্যসুন্দর বরতলু। মণিস্তবকিত বেণীতে দেয় ইস্ত্রনীলের চন্দ্রকণা, কঞ্চুকণ্ঠে ছুলিয়ে দেয় মৌজিকনির্ঝর শক্তনরী, অপাবৃত গুরুনিতম্বে বুলিয়ে দেয় মাণিক্যখচিত স্বর্ণমেখলা!

মণিদীপজ্বালা প্রমোদকক্ষে রত্নসিংহাসনে যেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাজনক ধীর পদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। অপাপবিদ্ধ ছাটি মুঞ্চনয়ন তুলে মহারাজ দেখতে থাকেন এই অপরূপা নারী মূর্তিটিকে—নিরাবরণার সকুণ্ঠ লাজনত্র ভঙ্গী। সীবলী বসে পড়ে তাঁর পাশে—লুটিয়ে পড়তে চায় আগ্রহ-শয়নে; কিন্তু দেখে উদাসী আনমনা হয়ে গেছেন মহারাজ!

আর্তকণ্ঠে রত্নাতুরা সীবলী বলে: আজ আমাকে দেখে তোমার মনে কোন বাসনা—কোন কামনা জাগছে না মহারাজ?

দূর-দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি রাজর্ষি বলেন—জাগছে সীবলী! ইচ্ছা করছে আমার মন্দিরের দেবীপীঠে বসিয়ে তোমাকে আজ পূজা করি!

যেন এক আর্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ে সীবলী। এতক্ষণে মনে হয়, সে রতি-মন্দির দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রিনীর মত নিরাবরণা নয়, সে প্রগল্ভা নির্লজ্জা বাবণিতার মত নগ্নিকা! ছ হাত বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে তার লাজবস্ত্র!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন গোপনে মহারাজ বেরিয়ে গেলেন হস্তিপুঠে হিমাবলী পবতের সান্নদেশে এক সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। গুরু-শিষ্যে কি কথোপকথন হল জানি না, কিন্তু মহারাজ প্রাসাদে ফিরে এলেন যেন অশ্রু মানুষ। রাজমাতা সীবলীকে জনাস্তিকে ডেকে বলেন: ছি ছি ছি! কেন মুহূর্তের জ্ঞাত শিথিল করেছিলে তোমার আলিঙ্গনপাশ—কেন ওকে যেতে দিলে ঐ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। মহাজনক তাঁর মনোবাসনার কথা অকপটে জানালেন সীবলীকে। এতদিনে তিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন। এ রাজৈশ্বর্যের শিলাস-ব্যসনে তাঁর অভিরুচি নেই—তিনি সন্ন্যাস নেবেন। উপকরণের এ ছুর্গটিকে ত্যাগ করে যাবেন তিনি।

সীবলী আর্তকণ্ঠে বলে: উপকরণের ছুর্গ কাকে বলে মহারাজ? এ রাজপ্রাসাদ, এ ঐশ্বর্য কেন ঘৃণার্থ?

মহাজনক বলেন—সে তো তুমি বুঝবে না সীবলী। সে তো কথায় বোঝানো যায় না।



: তবে কেমন করে বোঝা যায় ?

: সময় যখন হবে তখন আপনি বুঝবে।

এ-মর্মান্তিক ছঃসংবাদে মহাজনক-জননী শয্যা নিলেন। আর উঠলেন না! তবু মহাজনক রইলেন অটল। 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী সীবলীর অশ্রুবজ্রায় ভেসে গেল মেদিনী, তবু মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অটল। অশ্রুপৃষ্ঠে তিনি রাজধানী ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর প্রিয় প্রজার দল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল রাজ্য-সীমান্ত পর্যন্ত। সংবাদ পেয়ে উদ্ভাদিনীর মত ছুটে এল উপেক্ষিতর্যোবনা সীবলী, আর্তকণ্ঠে বললে—আমাকেও সঙ্গী করে নাও। আমি তোমার সাধনার পথে অন্তরায় হব না। বিশ্বাস কর।

মহাজনক বলেন—এ পথ তোমার নয় শুচিন্মিতে! এ যে আমার একলা চলার পথ! আর্তকণ্ঠে সীবলী বলে—আমি এখানে কি নিয়ে থাকব? স্বামী বনবাসী, সন্তান-লাভে বঞ্চিতা এ নারী কী অবলম্বন কবে বেঁচে থাকবে এর পর?

অবিচলিতকণ্ঠে মহাজনক বলেন, ধর্মই মানবমাত্রের অবলম্বন।

সীবলী শেষ আর্তনাদ করে ওঠে—আমি মানব নই মহারাজ, আমি মানবী! আমি সন্তান চাই, মাতৃষ চাই,—মানবীর তাই যে ধর্ম মহারাজ। আপনার স্বর্গগতা জননীর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সীবলী। দীর্ঘ সময়। কেউ তাকে বাহুয়ূল খরে উঠিয়ে বসায় না। অবশেষে সে নিজেই উঠে বসে। দেখে, বিজন প্রাস্তরে সে একাকী! মহাজনক চলে গেছেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পথে।

সীবলী উঠে দাঁড়ায়। মনস্থির করে। মহাজনক যদি তপস্বা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তবে সে-ও সিদ্ধকাম হতে পারবে সাধনার পথে। মহাজনক-জননীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহাজনক-পুত্রকে সে জঠরে ধারণ করবে।

একে একে সীবলী খুলে ফেলে তার রত্নাভরণ, কেয়ূর-কঙ্কি-মণিবলয়-সীমন্তী-মেখলা। স্বর্ণখচিত চীনাংশুকের পরিবর্তে অঙ্গ তুলে নেয় ভিক্ষুণীর পীত অর্জিন। জলদস্তবক-নিন্দিত কেশভার চ্যুত হয় মস্তক থেকে। মুণ্ডিতশীর্ষা শ্রমণীর বেশে প্রস্তুত হয় সে। বিতায় হয় নি, রূপে হয় নি, ভালবাসায় হয় নি—এবার অভাগিনী মেয়েটি শেষ চেষ্টা করে দেখবে, তপস্বায় হয় কি না! মিথিলা-রাজ্যের সীমান্তে এক আশ্রয়স্থানে, ঠিক যে স্থানটিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে মিথিলাধিপতি তাঁর রানীকে শেষ সন্থোধন করে বিদায় নিয়েছিলেন, ঠিক তার পাশেই তৈরি করে নেয় মৃত্তিকালিপ্ত এক পর্ণকুটার। ভিক্ষুণীর আবাসস্থল।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী আর বৃদ্ধ গ্রহাচার্য। মহামন্ত্রী বলেন, এ কঠোর তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য কী রানী?

সীবলী বলে, আর রানী নয় মহামন্ত্রী, আমি এক সামান্য ভিক্ষুণী! গ্রহাচার্যের দিকে ফিরে বলে, অনেক প্রগল্ভতা করেছে, ক্ষমা করুন, তবু যাবার আগে বলে যান, আমি কি আমার তপস্বায় সিদ্ধকাম হতে পারব না?

: কী তোমার কামনা সীবলী ?

: মহারাজের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা। স্বর্গগতা মহারাজ-জননীর কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ !

গ্রহাচার্য ম্লান হেসে বলেন, তুমি কি ভেবে দেখছ সীবলী, তোমার সিদ্ধিলাভ মানেই মহারাজের ব্রতচ্যুতি ?

অচঞ্চল দীপশিখার মত যুক্তকরে সীবলী বলে ওঠে : আচার্যদেব ! মহারাজের কী ব্রত আমি জানতে চাই না। আমি চলেছি আমার ধর্মপথে ! মাতৃহ-ধর্মের চেয়ে নারীজন্মে বড় ধর্ম নাই ! আপনি বলুন ত্রিভুবনে কি এমন শক্তি আছে, যে আমাকে এই একনিষ্ঠ সাধনা থেকে চ্যুত করতে পারে ? আমার সিদ্ধিলাভে অন্তরায় হতে পারে ?

গ্রহাচার্য আশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মুখে আজ স্বর্গের ছাতি দেখতে পেয়েছি সীবলী ! তোমাকে সঙ্গলচ্যুত করতে পারে ত্রিভুবনে এমন শক্তি নাই ! তুমি গিন্ধকাম হবেই।

মহামন্ত্রী শিউরে উঠে বলেন, কি বলছেন আচার্যদেব ! তাহলে কি ব্রাত্য হবেন মহাজনক ? তিনি যে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব !

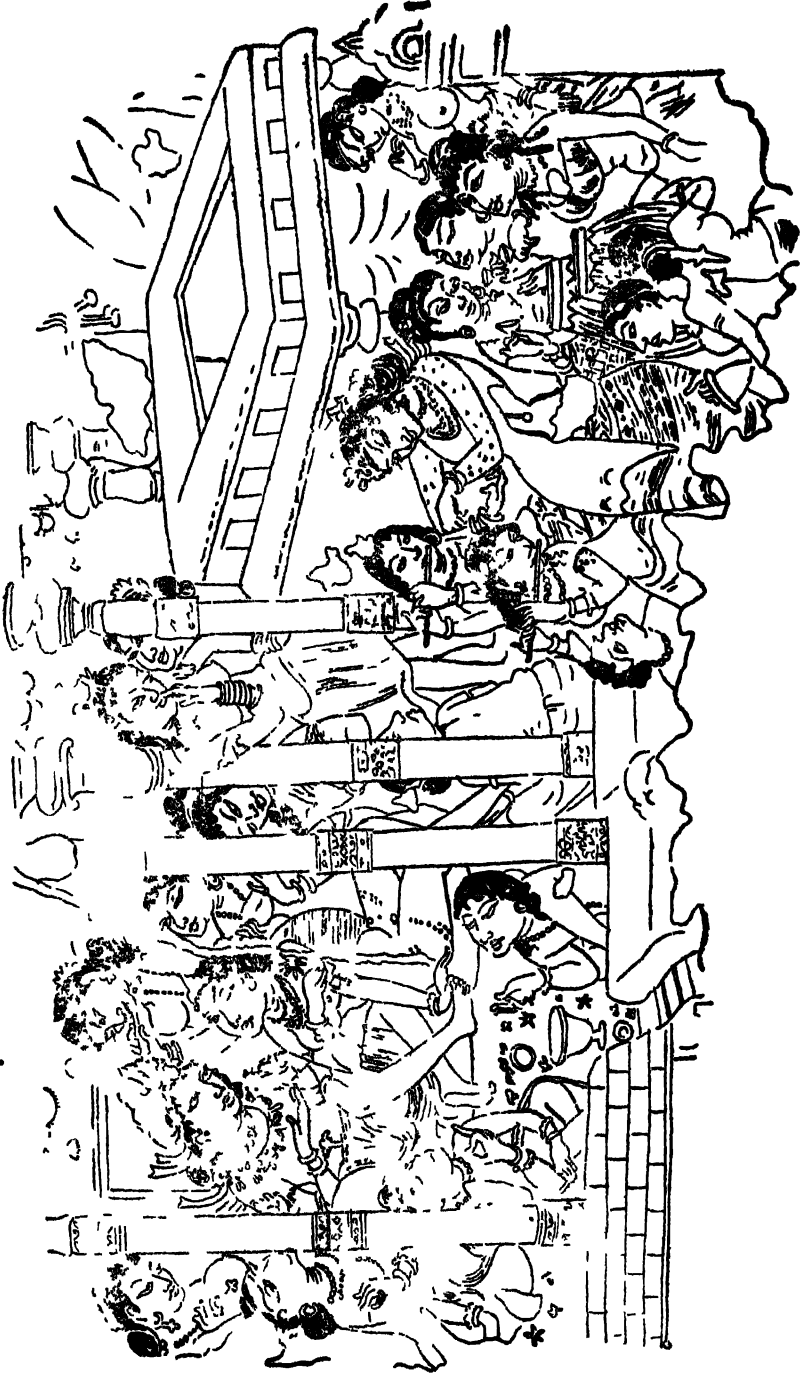
: না ! তিনিও সিদ্ধিলাভ করবেন তাঁর কঠোর সাধনায়। চিরকৌমার্যব্রত অমলিন থাকবে তাঁর !

মহামন্ত্রী বিশ্বলের মত বলেন, মার্জন্য করবেন গ্রহাচার্য, এবার যে আমাকেই বলতে হচ্ছে—আপনার ভবিষ্যদ্বাণীব কোন যুক্তিনির্ভর পারস্পর্গ থাকছে না !

এবার আব রাগ কবেন না গ্রহাচার্য। বলেন, অযৌক্তিক কথা আমি বলি নি মন্ত্রীপ্রবর ! চন্দ্রদীপের অমৃত পাণিপ্রাণীর কাছে যে সমস্তা ছিল সমাধানের অতীত, দেখেছ নিশ্চয় মহাজনকের কাছে তা মনে হল সহজ সরল। তেমনি তোমার-আমার কাছে যা নাকি মনে হচ্ছে সমাধানের অতীত সমস্তা—বিশ্বপ্রপঞ্চের এক অলক্ষ্য নাট্যকারের কাছে তাই সহজ সরল। মহাজনক এ জন্মে চন্দ্রমসিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না। তবু সাধনমার্গে অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকখানি। বহু জন্ম পরে শাক্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে। সেই জন্মেই গিন্ধ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন—হবেন বুদ্ধদেব ! মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন সেই জন্মে। তেমনি ম সীবলীও এ জন্মে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন না। তবে তিনিও অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকটা পথ—তাঁর মাতৃহ-তীর্থের পথে ! বহু জন্ম পরে তিনিও আবার আবির্ভূত হবেন এই ধরাধামে সুপ্রবদ্ধতনয়া যশোধরার ভূমিকায়। সেই জন্মে মহাজনককে মিটিয়ে দিতে হবে সীবলীর দাবি ! সীবলী সেই শেষ জন্মে জঠরে ধারণ করবে বাজপুত্রকে ! সেই ভূবন-বিজয়ী পুত্রের নাম হবে রাজল !

সীবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বলে, রাজল ! রাজল ! এই আশীর্বাদই করুন !

মহামন্ত্রী বলেন, কিন্তু এ পর্ণকুটীর কেন মা ? এ অপরূপ চৈত্যাগৃহের উপযুক্ত ফটিকনির্মিত সজ্জারাম নির্মাণক রিয়ে দিই আমি। তুমি সেখানেই তপস্বী কর।



ଚିତ୍ର—୧  
ମହାଜନକ ଜାତୀ—ପ୍ରୟୋଦକ୍ଷ୍ମ ମହାଜନକ ଓ ମାବନୀ  
ଅବସ୍ଥାନ—୧୧୨୫

সীবলী হেসে বলে : কিন্তু সে ফটিকনির্মিত উপকরণের দুর্গে যে আমার খাস রুক্ষ হয়ে আসবে মহামন্ত্রী !

মহামন্ত্রী বলেন : তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না মা । উপকরণের গঁছ কাকে বলে ?

অতি দুঃখেও সীবলীর ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে অস্তচন্দ্রের মত ম্লান হাস্যরেখা । বলে—  
এ কথার অর্থ যে কানে শুনে বোঝা যায় না বিপ্রবর !

মহামন্ত্রী বলেন : তবে কেমন করে বুঝতে হয় মা ?

সীবলী বলে : জীবন দিয়ে !

জাতকবর্ণিত মূলকাহিনী ঐটুকুই । অজস্রাব শিল্পী এই কাহিনীটুকু অবলম্বন করে রূপায়িত করেছেন অপরূপ একটি চিত্র-কাহিনী ( ১১২ক—১১৬ ) । দেওয়াল চিত্র তো নয়, যেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক ।

প্রথম অঙ্কে দেখছি ( চিত্র—৭ অর্থাৎ ১১২ক ), মণিদীপিত প্রমোদভবনে একটি রত্নসিংহাসনে বসে আছেন মহাজনক এবং বানী সীবলী । এ যেন সেই মধুমাসের বিচিত্র পূর্ণিমারাত্রির ঘটনা । মহাবাজের সর্বাঙ্গবে মহাগুল্য অলঙ্কারের সমারোহ । কিন্তু রানীর অঙ্গে নেই প্রসাধনদক্ষার নির্বাচিত পট্টবাস । ওঁদের ঘিরে রয়েছে নয়জন পরিচারিকা— ছত্রধারিণী, বাজনিকা, করঙ্কবাহিনী ইত্যাদি । সীবলীর দক্ষিণহস্ত মহারাজের বামজামুতে স্থাপ্ত, আল্পেষ-শয়না এই বিবসনা নারীর অঙ্গের প্রতিটি বেখা যেন মহাবাজের দিকে ছুটে যেতে চায় । আত্মসমর্পণে উন্মুখ এক বতাতুরা নারীমূর্তি । কিন্তু রাজার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ ।

বেশ বোঝা যায়, সে দৃষ্টি উদাসীনের, বীতরাগ নিম্পৃহের । প্রমোদকক্ষে কয়েকটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ, উপর থেকে ঝুলছে যুক্তামালা । বাজাব সম্মুখে একটি পিকদানী, নিম্নাংশে ইটের গাঁথনিতে জোড়াইয়ের কাজ নিখুঁত । দূরে একটি প্রাসাদেব ইন্দ্রকোষ । অলিন্দের এ প্রান্তে একটি স্তম্ভের কাছে ছুটি সখীতে কি নিয়ে যেন জল্পনা করছে, বোধ করি ওবা রাজারানীর অস্তচন্দ্রের কিছুটা আভাস পেয়েছে । দ্বারের বাহিরে রাজনর্তকী তার গীতবাণের সহচরীদের নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—ইঙ্গিতমাত্রে যেন শুরু হয়ে যাবে নৃত্যগীতের আসর । রাজনর্তীর কবরী কুমুমসজ্জিত, অঙ্গে তাব বৃত্তিদার পুরো-হাতা জ্যাকেট, তার নয়নকোণে বিলোল কটাক্ষ ।

দ্বিতীয় অঙ্কে নীচের প্যানেলে দেখছি, রাজা হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে । তিনি একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করছেন । বলা বাহুল্য, এটি রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বার ( ১১২খ ) ।

তৃতীয় অঙ্কে দেখছি, হিমাবলী পর্বতের পাদমূলে মহাজনক বসে আছেন মহাসন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে ( ১১২গ ) । যুক্তকর তাঁর মূর্তিটি সত্যই সত্যাষেবী মুয়ুকুর । সন্ন্যাসীর হাতে জপমালা, মাথায় জটাভার, বসে আছেন বনকুমুম-লাঙ্ঘিত এক প্রস্তরাসনে । তাঁর



৭—ছবি

মহাশয়ক জাতক—মহাজনক প্রজাগ্রাহণের সঙ্কল্প জানাচ্ছেন মহাশয়কের মহাশয়ক

অবস্থান

চবণতলে ছুটি উন্মুখ মৃগশিশু উর্ধ্বমুখে যেন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনছে। এ ধর্মপ্রচারের দৃশ্যটি আঁকবার সময় কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অবচেতন মনে সাবনাথ-মৃগদাবে গৌতমবুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের কথা জাগকক হয়েছিল? তাই কি এই ছুটি মৃগশিশু এ চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে পড়েছে?

তারপর চতুর্থ অঙ্কের আগে দেখছি, একটি ছোট গভাঙ্ক দৃশ্য। মহাজনক-জননী সীবলীকে ভৎসনা কবছেন। মুক্তকবে সীবলী তাঁর অপবাধ স্বীকার কবছে। (চিত্র—৮; ১।২ঘ বামপ্রান্তে)

চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যপট প্রথম অঙ্কের মত। সেই সুশোভিত মণিদীপস্রালা প্রমোদক-ক-। সেই বঃসি-হাসনে বসে আছেন মহাজনক আর সীবলী--যাঁদের দেখেছিলাম নরুবিবাহিত রূপে এই কক্ষেই প্রথম দৃশ্যে। কিন্তু পটভূমি কি বিবাত পবিবর্তন।

শিল্পীর সৃষ্ণহাতের কাজ অনুবাবন কবতে হলে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যটির (অথাৎ চিত্র ৭ এবং চিত্র ৮-এব) একটি তুলনামূলক সমালোচনা অপবিহার্য হয়ে পড়ে। পূবদৃশ্যে দেখেছি, সজোবিবাহিত মহাজনকের সবাঙ্কে ণিমাণিক্যেব পাচুণ। তাঁর বর্ষ্ঠে ক্রমাঙ্বে তিন সর্বি বহুমূল্য মণিহাব এবাং সেখানে দেখেছি মাত্র একছড়া মাণা। যেন কদ্রাঙ্ক! পূবদৃশ্যে বাজাব দৃষ্টি ছিল শূঙ্কে নিবন্ধ, উদাসীন পথপ্রাপ্ত পাঙ্কের আবিলা দৃষ্টি—তাঁর দাঙ্কগহঙ্কের মুদ্রায় দিগাহাবাব ব্যাঙ্কনা। এবাং দেখাঙ্ক, তাঁর দৃষ্টি মোদাণিণিবন্ধ, বকণাব আঙ্কুত। এবাং তাঁর কবাণিণিতে দিগাহাংকো পবপ্রান্তে নাবিব্বেব আভিবাণ্ডি নেই ছুটি হাতে তিনি বচনা কবেছেন স্রাব্যাও বমচক্রমুদ্রা। তিনি যঃ পাঙ্কের সঙ্কাল পেবে গেছেন এবাব। অপবপক্ষে, সাবলাব পবিবর্তনটা আবও অববহ, আবও ককণ। পথন দৃশ্যে সাবলা ছিল বস্তুতঃ নিবাববনা, অথবা অত্রাঙ্ক স্রাঙ্ক বক্রাবুতা, পাঙ্কপূঙ্ক্রেব বানিঙাঙ্কতে তাব দেহভাব ছিল শূঙ্ক। তিনি সেবাব সাং সুবস্তুপবা-নন্দিও যৌবনোঙ্কত কাঙ্কো শিবল পাববে মহাজনকবে বেবে বাখাও উঃখ হিঙ্কো। কিন্তু এবাং দেখাঙ্ক, তাব অঙ্কে উঠেছে লঙ্কাববণ। তিনি আব আঙ্ক্রেব-ববনা নন। মহাবাঙ্কোব সনঙ্ক্রেব দৃচতা ডাণাঙ্ক কবে সীবলীও নিবাত নিঃস্র দাণাশিবাব নত ঝঙ্কুভাঙ্কনাং উপাঙ্কই।

একটি কথা এই প্রসঙ্কে বলতে চাই, বিশেষতঃ যখন দেখাঙ্ক পূবসূবাবা এাদকটা নিয়ে আলোচনা কবেন নি।

বাংসায়ন-প্রণীত কানসূঙ্ক্রেব টাকায় যশোবব প্রসঙ্কক্রমে একটি শ্লোক সঙ্কলন কবে বলেছিলেন চিত্রের ছয়টি অঙ্ক।

কপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবনাযোজনম

সাদৃশ্যং বণিকাতঙ্ক ইতি চিত্রং ষড়ঙ্ককম্ ॥

আচাঙ্ক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাবতর্শিল্পে ষড়ঙ্ক' নিবন্ধে এ-বিষয়ে সর্বিশেষ আলোচনা ভারতীয় চিত্রে ষড়ঙ্ক কবেছেন। তাব মূল বক্তব্যটুকু আলোচনা কবে নিয়ে আমরা যদি আমাদের প্রসঙ্কে ফিবে আসি তাহলে আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে কিছু স্রবিধা হবে।

আচার্য বলছেন, আলেক্সেয়র ছয়টি অঙ্ক। কী তারা? না—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাভণ্যযোজনা, সাদৃশ্য আর বর্ণিকাভঙ্গ। এই শব্দগুলির অর্থ কি?

রূপভেদ—অর্থাৎ, পরিদৃশ্যমান জগৎ সহজে জ্ঞান। এই প্রপঞ্চময় জগৎ থেকে শিল্পী একটি বা কয়েকটি বিশেষকে বেছে নিয়ে তাঁর আলেক্সেয়র বিষয়-বস্তু নির্বাচন করছেন।

সেই বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুই যে বাহ্যিক রূপ, সে সহজে চিত্রকরের রূপভেদ সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। অর্থাৎ, শিল্প-নিদর্শনটি দেখে দর্শক যেন বুঝতে পারে চিত্রের বিষয়-বস্তুটা কী। চিত্রটি নয় অথবা নারীর, অল্প অথবা অধিক বয়সী, কোন্ দেশের, কোন্ শ্রেণীর মানুষ ইত্যাদি। হরিণ আঁকলে তাকে অমুদগভঙ্গ মেঘ বলে যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকদল ভুল করে বসে, তবে বুঝতে হবে শিল্পীর রূপভেদ সহজে ধারণা পর্বাণ্ড নয়।

প্রসঙ্গতঃ, এ শতাব্দীর অল্পতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী পিকাসো-র সহজে প্রচলিত একটি গল্পের কথা মান পড়ছে। জগদ্বিখ্যাত শিল্পীর কাছে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠিপত্র আসে—যে ডাক-পিয়ন তাঁর চিঠিগুলি লেটার-বাক্সে যোজ রেখে যায়, তার ভারি কোঁতুহল ছিল শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখার। বেচারির বরাত খানাপ, রেজিস্ট্রী চিঠি এলেও শিল্পীর একান্ত-সচিব সেগুলি সই করে নেন। শিল্পীর আর দর্শন মেলে না। শেষ পর্যন্ত ডাক-পিয়ন দারোয়ানজীর শরণাপন্ন হল। দ্বারপাল শেষবেশ দয়াপরবশ হয়ে একদিন সুযোগমত ওকে বললে, আজ একান্ত-সচিব মশাই বাড়ী নেই। তুমি সোজা ভিতরে স্টুডিওতে চলে যাও।

ডাক-পিয়ন বললে, ভিতরে আর কে আছেন?

: আর কেউ নেই। শিল্পী আর তাঁর দশ বছরের ছেলেটি আছে।

সাহসে ভয় করে ডাক-পিয়ন ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে ঘরের চারদিকের দেওয়ালে শুধু ছবি আর ছবি। শিল্পী আর তাঁর বালক-পুত্র বসে আছেন সেই চিত্র-সম্ভারের মাঝখানে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে শিল্পীকে রেজিস্ট্রী খামটি এগিয়ে দিল ডাক-পিয়ন। কলম বার করে শিল্পী সই করছেন, ডাক-পিয়নের মনে হল এই অবকাশে কিছু বললে ভাল হয়—তাহলে বন্ধুদের কাছে বলতে পারবে স্বয়ং পিকাসো-র সঙ্গে সে বাক্যালাপ করেছে। তাই অনেক বুদ্ধি খরচ করে ডাক-পিয়ন বললে, ছোটকর্তাও দেখছি তার বাবার মত ছবি আকার চেষ্টা করছে। ভাল, ভাল!

পিকাসো একটু অবাক হয়ে বলেন—এ-কথা মনে করছ কেন?

একগাল হেসে ডাক-পিয়ন বললে—ঐ ঘোড়ার ছবিখানি নিশ্চয় আপনার পুত্রের আঁকা। চমৎকার হয়েছে!

পিকাসো জবাব দেন নি। মুহূর্ত হেসেছিলেন শুধু।

কারণ, চিত্রটি পুত্রের নয়—পিতার আঁকা। বিশ্ববিশ্রুত একটি শিল্পকর্ম, ঘোড়া নয়—হরিণ : 'তু হেড অক এ কন!'

গল্পটি উল্লেখ করলুম এজন্য যে, এ নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ডাক-পিয়নও একজন সাধারণ বুদ্ধিমত্তা দর্শক। সে বেচারি যদি হরিণকে ধোড়া বলে ভুল করে, তবে কি আমরা ধরে নেব শিল্পী পিকাসো-র 'রূপভেদ' সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান নেই? এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কারণ, স্বয়ং পিকাসো-ই তার জবাব সম্প্রতি দিয়েছেন এবং তাঁর সে স্বীকারোক্তিতে সারা বিশ্বের চিত্র-সমালোচকরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন।

সে যাই হোক, রূপভেদের আনুষ্ঠানিক হিসাবে এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপজোখ। বানর ও নরের পার্থক্য শুধু একটি সুদীর্ঘ অঙ্গবিশেষের অস্তি-নাস্তির উপরেই নির্ভরশীল নয়। হাত-পা-মুখ-দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আপেক্ষিক মাপের বহুবিধ পার্থক্যই প্রমাণ দেয় এ চিত্রটি নরের, ওটি বানরের। আমাদের প্রাচীন শিল্প-সাধকরা শিল্পমূর্তিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যথা—নর, ত্রুণ, আত্মর, বালা এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরমূর্তি—দশতাল; ত্রুণমূর্তি—দ্বাদশতাল; আত্মরমূর্তি—ষোড়শতাল; বালামূর্তি—পঞ্চতাল; কুমারমূর্তি—ষট্টিতাল। শিল্পীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙ্গুল; এই রকম দ্বাদশ আঙ্গুলিতে বা তিন মুষ্টিতে হয় এক তাল। শিল্পাচার্যরা বলেছেন, রাম, রসিংগ, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি হবে নরমূর্তি অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ প্রভৃতি হবে দ্বাদশতালের ত্রুণমূর্তি। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহিষাসুর প্রভৃতি হবে ষোড়শতালের আত্মরমূর্তি। বালামূর্তি হবে বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারমূর্তি হবে বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদির। শুধু তাই নয়, দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ কোন্ মূর্তিতে কত হবে তাও বলা আছে—নরের ও নারীর পৃথকভাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এত বাঁধাবাধির মধ্যে মূর্তি গড়তে গেলে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? সবই তো একঘেয়ে হয়ে যাবে। না, তা যাবে না! বৈচিত্র্যের জন্ম ঈশ্বর এই ছনিয়ার আড়াইশ কোটি মানুষ্যের কাউকে চার-হাত ছই-মাথা করেন নি। মানুষের অবয়বের একটি প্রাথমিক পারস্পর্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষ বিশেষ। তেমনি শিল্প-সম্মত এই সব মাপজোখ যেনে চলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে পেরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। সে যাই হোক, এই মাপজোখ, এই গাণিতিক হিসাবকেই যশোধর বলতে চেয়েছেন চিত্রের দ্বিতীয় অঙ্গ বা 'প্রমাণ'।

চিত্রের বহিরঙ্গের রূপ দিতে এল রূপভেদ ও প্রমাণ—তার পরের অঙ্গটি হচ্ছে 'স্তাব'। সেটি বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গের জিনিস। ভাবের কিছুটা আমরা বুঝতে পারি স্কন্ধীতে। কিছুটা অনুধাবন করতে হবে হৃদয় দিয়ে। ও মেয়েটি গালে হাত দিয়ে বসেছে—ও স্তাবছে; এ ছেলেটি তরবারির মুঠ ধরেছে, এ ক্রোধান্বিত; ভাষ এগুলি হচ্ছে প্রকট স্কন্ধী; এর স্তাব বুঝতে অনুবিধা হয় না! কিন্তু ঐ যে মেয়েটির মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি ও লজ্জাবনতা—ঐ প্রোথিত-ভর্তৃকার 'অসম্বন্ধ



কবরীপাশ, ওর চুলবাঁধায় মন নেই, এগুলি অল্পধাবন করতে হলে আর একটু অঙ্গদৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু ভাবের রাজ্য তো ওখানেই শেষ নয়—অধরের একটু কম্পনে, জ্বর সামান্যতম কুঞ্জে, হাতের বিশেষ একটি মুদ্রায় শিল্পী অনেক কিছু অনেক সময় বলতে চান—সেগুলি দেখবার চোখ-চাই। কিন্তু এহ বাহা! শিল্পাচার্য অবনীশ্রনাথ বলছেন :

চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে। কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন বাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আব প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পাবিনা—সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিয়া আমার হাতখানি ধরিয়া দেখাই 'এই ছায়া', তেমন চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু একটা আড়াল দিয়া।

কুটিরটি আধখানা লিখিলাম, আর আধখানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম, কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গী বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাধেব দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা নীলা। সেদিকটায় আমবা করনা করিয়া লইতে পাবি নানা অলিখিত বস্তু।

বস্তুতঃ, এই ভাবের রাজ্যেই শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের আত্মীয়তা। সবটুকু যদি শিল্পী বলে দেন, তাহলে ভাবরাজ্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু এই যে কিছুটা ঢাকা, কিছুটা আড়াল-করা ভাবের রাজ্যে শিল্পী একটু আভাস একটু ইঙ্গিত দিয়ে ধেমে যান এবং এই যে সেই আভাস-ইঙ্গিতের পথ ধরে দর্শক ভাবরাজ্যে ভেসে চলেন এতেই চিত্র-দর্শনের প্রকৃত আনন্দ। প্রকৃতিও একজন উচুদরের শিল্পী, তাই তার অনেক রহস্য আজও হুজুয়ে এবং তাতেই তার মাধুর্যের উপাদান। আর তাই 'মাটির ছায়ার আধেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা। সবটা যদি খুলে দেখাত তাহলে রহস্যের রোমাঞ্চ শিহরণ থেকে বঞ্চিত হতুম আমরা।

ভাবের পরে বলতে হবে লাভণ্যযোজনার কথা।

লাভণ্য শব্দটির সঙ্গে লবণ শব্দটির ধ্বনি-সাদৃশ্য থেকে আমার মনে একটা কথা জাগছে। কোন একটি তরকারি রাঁধবার সময় আলু, পটল, মাছ ইত্যাদি নির্বাচন করাকে যদি বলি 'কপভেদ', বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাকে যদি

লাভণ্যযোজনা

বলি 'প্রমাণ', তাহলে সেই তরকারিতে লবণ যোগ করাকে বলব

লাভণ্যযোজনা। অল্প ও পরিমাণ অনুযায়ী লবণ যতক্ষণ না যোগ করা হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বিশ্বাদ ও আলুনী। কিন্তু আমার এই স্থূল উপমায় লাভণ্যযোজনার মর্মকথা যতটা উদ্ঘাটিত হল, তার চেয়ে অনেক মধুর করে অনেক হৃদয়গ্রাহী করে এই লাভণ্যযোজনার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীকপ গোস্বামীপাদ তাঁর একটি শ্লোকে :

মুক্তাকলেষ্ছায়ানাস্তরলমিবাস্তরা।

প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাভণ্যমিহোচ্যতে ॥

নিটোল একটি মুক্তার আকার আর আয়তন বোঝানো শক্ত নয়, তার বর্ণের কথাও বোঝানো যায় ; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে ? চিত্রকর মুক্তাটির রূপভেদ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াসলভ্য—কিন্তু ঐ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক—সেটিই হচ্ছে লাবণ্যযোজনা !

কিন্তু লবণ না হলেও যেমন চলবে না, লবণের আধিক্যও তেমনি সুস্বাদু আহাৰ্যটিকে বিস্বাদ করে দিতে পারে। তাই পরিমিত-বোধ লাবণ্যযোজনায় মূলকথা।

তুলি-কলমের জাতকর অবনীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় লাবণ্যযোজনায় এই মর্মকথা ভারি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যায় দিবেছেন। সেইটুকু পাঠককে উপহার দিয়েই এ প্রসঙ্গের ছেদ টানব :

রূপকে যেমন পরিমিত দেখ প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আসিয়া, তেমন লাবণ্য পরিমিত দেয় ভাবের কাষকে বা ভঙ্গীকে অজুত ও উচ্ছ্বল ভঙ্গী হইতে নিবৃত্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্নত অর্থের মতো অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমনকি অশোভনরূপে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া, লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শাস্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শঙ্কুলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো অপরিমিতরূপে হাত পা নাড়িয়া, দাঁত মুখ ঝিঁচাইয়া লক্ষণে ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য তাহাব কাছে আসিয়া বলিতেছে,— স্থিরোভব। পাগল হইলে যে !

প্রমাণের বন্ধনে যে কাঠাবতাক্টুক আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই, অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি স্বরূপের বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে বাশ টানিয়া অর্থের ষাড বাঁকাইয়া দেয় না। কিন্তু তাহাব স্পর্শে অথ আপনি ষাড বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা কেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাস্টার, বেত মাখিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে, আব লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে হুলাইয়া যথেষ্টাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

লাবণ্যযোজনায় পর পঞ্চম অঙ্গের আলোচনা করতে হয়। সেটি 'সাদৃশ্য'।

সাদৃশ্য কি ? না, সদৃশ্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। কাব্যে বা সাহিত্যে আমরা উপমার সাহায্য নিয়ে থাকি। কখন ? যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তির কোন গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষণের লগিতে আর এক বাঁও মেলে না, তখন আমরা উপমার দ্বারস্থ হই। তোমাকে

দেখবার জন্য আমার মন কতদূর ব্যাকুল হয়েছে বোঝাতে আমাকে

সাদৃশ্য

বলতে হচ্ছে 'দেখিবারে আখিপাখী ধায়'। ছেলেকে পেয়ে মা

সব ভুলেছেন, ঘর-সংসার-আত্মীয়-পরিজন সব ছাড়তে তিনি প্রস্তুত, তাই বলছেন, 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব সেখানে খাব কি ?' জবাবে নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছেন 'বিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি'। এখানে আর বিশেষণে কুলাল না, আঁখিকে 'পাখী' কল্পে প্রেমিকের, পুত্রকে 'চাঁদ' করে মায়ের মনের আকুলতা মিটল।

কাব্য ও সাহিত্যেও যেমন চিত্রেও তেমন, অনেক কথা না বলে উপমা বা সাদৃশ্যের সাহায্যে অল্প রেখায় অল্প রঙে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাকেই বলি 'সাদৃশ্য'।

কাব্যে বা সাহিত্যে উপমা-রূপকের কোথায় শেষ তা আমরা জানি! তাই রসোপলব্ধিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আকাশের চাঁদের সঙ্গে বাহনীর মুখচন্দ্রের তুলনায় শুধু চাঁদের দীপ্তি, সৌকুম্য আর লাবণ্যটুকুকেই আমরা বুঝে নিই—আকার বা আকৃতিগত সাদৃশ্য আমরা খুঁজি না; ঠিক তেমনি চিত্রের বেলাতেও সাদৃশ্যের সীমারেখাটি বুঝে নিতে হবে—কী শিল্পীর, কী দর্শকের পক্ষে।

সেই সীমারেখাটি কী? না, কপে কপে মিলের চেয়ে বড় কথা ভাবে ভাবে মিল। গ্রীক চিত্রকর জিউক্লিসের ড্রাক্স গুচ্ছ দেখে পাখী ভেবেছিল সত্যিকারের আঙুর। বাস্তবের সঙ্গে চিত্রের এই মিলকে কিন্তু সাদৃশ্য বলছি না, চাঁদের উপমান যেমন চাঁদ হতে পারে না। ঐ সুন্দরীর চোখ ছুটি দেখে যদি আমার মনে হয় খঞ্জনের মত সে ছুটি চঞ্চল, তবেই বলব খঞ্জন-নয়নার ঐ চিত্রটি সাদৃশ্যের নিরিখে ঠিক উৎরেছে!

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতশিল্পে মূর্তি' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

যড়-অঙ্গের শেষ অঙ্গটি হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গ এবং এটিই শিল্পীর শেষ সাধনা। সেটি হচ্ছে তুলির উপর রঙের উপর শিল্পীর দখল। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন: বর্ণজ্ঞানং যদা নাস্তি কিং তস্ম জপপূজনৈঃ? যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, যদি ঐ বর্ণিকাভঙ্গটি আয়ত্তাধীন না হয়, তবে যড়ঙ্গের আর পাঁচটির সাধনা রুখা যাবে। জপ ও পূজায় কোন লাভ হবে না। তুলি ও পট স্পর্শমাত্র না করেও শুধু বুদ্ধি দিয়ে ধী-শক্তি দিয়ে যড়ঙ্গের প্রথম পাঁচটির সম্বন্ধে মোটাটুটি ধারণা করা চলতে পারে। কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গ? সেখানে তোমাকে তুলিহাতে আসরে নামতে হবে।

বর্ণিকাভঙ্গ

শিল্পাচার্য বলছেন:

চোখের তারাটি যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালেব রেখাটি যাহা একচুল এদিক ওদিক হইলে, লতাতক্ত অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিবেধা যাহা একটু কাঁপিলে, সব নষ্ট হইয়া যায়—তুলিব আগায় সেগুলি আঁকিয়া দেখানো হস্তের কি কিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত লঘুতারই অপেক্ষা রাখে।... তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় কতটা রঙ তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া কেলিব এবং সেই রঙ সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না-চাপিয়া কাগজেব উপর ব্লাইয়া দিব—ইহারই সম্বন্ধে প্রমাণ লাভ কর' হইতেছে যড়ঙ্গের বর্ণিকাভঙ্গ নামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা।

ভূমিকাটি মস্ত বড় হয়ে গেল; কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল। যড়ঙ্গের এই মূলকথাগুলি না জানা থাকলে আমাদের পক্ষে অজ্ঞতা চিত্রাবলীর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর হবে না। এবার আমাদের মহাজনক জাতকের সেই গুহা-চিত্রগুলির প্রসঙ্গে কিরে আসা যাক।

‘সাদৃশ্য’ প্রসঙ্গের আলোচনাকালে শিল্পাচার্য বলেছেন :

চিত্রে তেমনি শতসহস্র রেখা, স্ফুটাস্ফুট বর্ণভেদাদি মানসমুষ্টির সঙ্গ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই স্বার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে ভাবের অনুরণন বাহ্য দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য আর কেবলমাত্র আকৃতি বা রূপের অনুলকরণ বাহ্য দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য।

শিল্পাচার্যের এই সত্যনির্দেশের অপব্যাত্যা করে একদল তথাকথিত আধুনিক শিল্পী ভাবের অনুলকরণে সাদৃশ্য রচনা করার অজুহাতে এমন শিল্প-নিদর্শন তৈরি করছেন যার সঙ্গে বাস্তবজগতের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলেন—‘বাপের স্বার্থ অনুলকরণ অধম সাদৃশ্য’ এ-কথার অর্থ কিছুতাই অপকপ! এ যে কত বড় ভুল কথা এই চিত্রপট ছুটি তার প্রমাণ।

প্রমোদভবনের ছুটি দৃশ্যের পরিকল্পনায় সাদৃশ্য যে একটা প্রধান গুণ, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পী ছুটি দৃশ্যপটকে ছবছ এক করে আকেন নি। বস্তুনিচয় ও পশ্চাদৃশ্যে সাদৃশ্য নেই—কিন্তু পাত্রপাত্রীদের ভাবের অনুরণনে অপকপ সাদৃশ্য। শিল্পী যেন পোর্ট্রেট এঁকেছেন কতকগুলি। যেন এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ করে এঁকেছেন। মহাজনক ও সীবলীর আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অনস্বীকার্য, কিন্তু আগেই বলেছি ভাবের

মহাজনক জাতক  
চিত্র আলোচনা

ব্যঞ্জনায তাদের আলেখ্য ছুটির বৈপরীত্যই প্রকট। অগ্ন্যস্ত্র চরিত্রগুলি লক্ষ্য ও তুলনা করে দেখুন। প্রথম চিত্রে সীবলীর মাথার ঠিক উপরেই যে চামরধারিণী মেয়েটি আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় সে যেন উদাসী, আনমনা, সে যেন প্রমোদকক্ষে থেকেও অশ্রমনে কি ভাবেছে। এবার দ্বিতীয় চিত্রটিতে সর্বদক্ষিণের মেয়েটিকে দেখুন—ঐ একই চরিত্র নয় কি? একটি চম্পক-অঙ্গুলি গালে দিয়ে সে যেন আনমনে কি ভাবেছে। ভাবুকপ্রকৃতির এ মেয়েটির ডানহাতে ছিল এক গোছা ফল—পরমুহূর্তেই যেন তা হস্তচ্যুত হবে। দ্বিতীয় একটি মেয়ে আছে এ নাটকে, যে চায় মহাজনক যেন সীবলীর আকর্ষণে স্বধর্মচ্যুত না হন। প্রথম চিত্রে ছুটি স্তম্ভের মাঝখানে দেখাছ, সে সেন হাত তুলে মহাজনককে নিবারণ করতে চাইছে, দ্বিতীয় চিত্রে চামরহস্তা এ মেয়েটিকে দেখাছ সীবলীর ঠিক উপরেই। সে যেন আনন্দিতা, সে যেন উপভোগ করছে মহাজনকের এ সিদ্ধান্ত, একমাত্র তার মুখেই ফুটে উঠছে তৃপ্তির আভাস।

আরও একটা কথা। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র—৮) সীবলীকে ছাঁবার আকা হয়েছে। স্বাস্থ্য সন্মুখে সীবলী, স্বাস্থ্য বামেও সীবলী। এ পাশের চরিত্রটা কিন্তু প্রমোদকক্ষে নয়, সে তার স্বজ্ঞাতার কাছে অগ্ন্যস্ত্র যুক্তকরে উপদেশ নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের ভাষায় যাকে আমরা ‘সুপারইম্পোস’ বলি এই খণ্ড দৃশ্যটি যেন তেমনি মূল চিত্রে আরোপিত। সাঁচিতে ও অজ্ঞান্য এ জাতীয় শিল্পচাতুর্যের বহু নিদর্শন আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ছুটি নারীমূর্তির পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার একই রকমের—কিন্তু সেটি সাদৃশ্যের মর্মকথা নয়; —এই ছুটি নারীমূর্তি যে একই ব্যক্তির তা বোঝা যায় তাদের মুখভঙ্গির, তাদের চাহনির, তাদের অসহায়ত্বের জ্ঞাব্যঞ্জনার সৌসাদৃশ্যে। যেন ভাবের অনুরণনে চরিত্রগুলি একই

হৃদয়ে ছলছে, একই সমের মাথায় ধামছে! আধুনিক চলচ্চিত্রে নির্মাণের সময় একজন দারিদ্ৰশীল ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয় পূর্বাপর দৃশ্যে পারস্পর্ষের সমতাবিধানের কাজে (Continuity)। অজস্র শিল্পীর তুলিতে কোন্ মস্ত্রে সে সামঞ্জস্যবিধানের এ অদ্ভুত ব্যবস্থা করা হত? পারস্পর্ষ শুধুমাত্র বসনভূষণ-নির্ভর নয়, তা ভাবব্যঞ্জনায় পূর্বাপর ঘনিবন্ধ। এ যে কতবড় কৃতিত্ব তা লিখে বোঝানো যায় না। বোধ করি, এ কোন কৃতিত্বই নয়, এ কোন শিল্পচাতুর্ভই নয়—এ হল ঙ্গদের ধ্যানের ধন। রূপভেদ পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পাচার্য বলেছিলেন :

রূপের বহিঃরূপে ভিন্নতা ধরিতে বা ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্তাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদভেদটা ধরিতে পাবে না, রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই ধরিতে পারি।

তাই বলছিলুম, এ অজস্র-শিল্পীর কোন প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্ব নয়—এ ঙ্গদের ধ্যানের ধন, সহজাত জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি!

মহাজনক জাতকের পরবর্তী চিত্রটির আলোচনা করার আগে আর একটি কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সেটি এই সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে। সপ্তদশশতাব্দীর আকা একটি অনবত্ত

চিত্রের সমালোচনাকালে শিল্পরসিক ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী বলেছেন, এই অনবত্ত চিত্রটির একটিমাত্র খুঁত হচ্ছে রাজকুমারীর ডানপায়ের পাতা। এ চিত্রটিকে বলা হয় 'প্রসাধনরতা রাজকন্যা' (চিত্র—৬৩)। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য কলারসিকের শিল্পবিচারে এ-কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ চরণযুগলের চিত্রই এঁকেছেন তাঁর 'ভারতশিল্পে



চিত্র :—১ সাদৃশ্য—সিংহ-কটি



চিত্র :—১০ সাদৃশ্য—গোমুখ-কাণ্ড

উদাহরণ সন্নিবেশিত করলুম। সিংহ-কটি, গোমুখ-কাণ্ড, চরণকমল ও পদপল্লব। শেষ উদাহরণ দুটি দিয়ে শিল্পাচার্য বলেছেন :

মূর্তি' পুস্তিকায় সাদৃশ্যপর্যায়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাতে। কাব্যে আমরা মীননয়না, কশুগ্রীব, গোমুখ-কাণ্ড ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে ভাব ব্যক্ত করি ভারতীয় শিল্পী তাঁদের তুলির টানে কিরূপে সেই ভাব ব্যক্ত করেন তা বুঝিয়ে দিতে শিল্পাচার্য অনেকগুলি চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন।

শিল্পাচার্যের অনুকরণে আমি এখানে চারটি মাত্র

কমলের সহিত ও পদ্মবের সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌন্দর্য অজ্ঞতা চিত্রাবলীতে ও ভারতীয় মূর্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোনো দেশেব কোনো মূর্তিতে নয়।

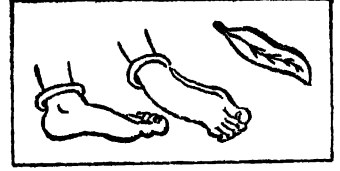


চিত্র :—১১ সাদৃশ্য—চরণকমল

অথচ মজা হচ্ছে এই যে, শিল্পাচার্য যেটিকে পদপল্লবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে সঙ্কলন করেছেন, তাঃ ইয়াজদানী সেইখানেই লক্ষ্য করেছেন আজিক

বিকৃতি বা 'এ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট'।

প্রসঙ্গতঃ কিশোর বয়সের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কোন একটি সে-কালীন আধুনিক কবিতা আমার বাবাকে পড়ে শোনাচ্ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কবি সুধীন দত্তের কবিতা। কথা-প্রসঙ্গে আধুনিক কাব্যে অপচলিত ও ছর্বেধা শব্দ প্রয়োগের বিষয় উঠল।



চিত্র :—১২ সাদৃশ্য—পদপল্লব

আমি বলেছিলুম, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক ছর্বেধা শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি সেই কিশোর বয়সের ঔদ্ধত্যে দাখিল করেছিলুম এই পংক্তিটি, 'হে পুষ্প, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল'; বলেছিলুম এখানে 'পুষ্প' শব্দের প্রয়োগ শুধু পাঠকের কাছে পাণ্ডিত্য জাহির করা—যাতে তাকে বিশ্বকোষ খুলে বুঝে নিতে হয় পুষ্প শব্দের অর্থ সূর্য। মনে আছে, বাবা তখনই তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থটি বার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার ধারণা ভ্রান্ত। বলেছিলেন, কবি তাটি রচনা করার সময় কবির মনে ঐ 'তৎ হ, পুষ্পপারুণ সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে' মন্ত্রটি অন্তর্গত হচ্ছিল এবং সেইজন্মই ঐ পুষ্প শব্দের প্রয়োগ।

এই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করলুম এ-কথা বোঝাতে যে, আমাদের স্বল্পজ্ঞানের পূঁজি নিয়ে আমরা যখন কোন বৃহৎ শিল্পকর্মের বিচার করতে বসি, তখন প্রায়ই ভুল করি, আর ভুল যে করি তা বুঝি না যতক্ষণ না সে ভুলটা কেউ বুঝিয়ে দেয়। কিশোর বয়সে আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলুম প্রায় সেই জাতীয় ভ্রমাত্মক উক্তিই কি করেন নি পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ ইয়াজদানী, যখন বলেছেন ঐ পদযুগলে 'এ্যানাটমিক্যাল' ভুল রয়ে গেছে?

বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখছি (চিত্র—১, দক্ষিণপার্শ্ব) মহাজনকণ্ঠে অধ-পৃষ্ঠে চলেছেন তাঁর একলা চলার পথে; সেই তোরণ-দ্বারটি অতিক্রম করেছেন তিনি (১২৬)। তাঁর চতুর্দিকে ভক্ত প্রজাবন্দ। কেউ বাজাচ্ছে বাঁশি, কেউ ফুঁ দিচ্ছে শাঁখে। শেযোক্ত ব্যক্তির গাল দুটি কোলা। রাজার দিকে মুখ করে যে ছেলেটি বিপরীত দিকে চলেছে তার ডানহাতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গতিশীল মানুষের স্থিরচিত্র আঁকবার সময় গতির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হাতের এই জাতীয় ব্যবহার প্রেক্ষিতের মতে পৃথিবীর চিত্র-ইতিহাসে এই ফ্রেস্কোটিতেই প্রথম করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যটিকে যদি এখানে ঐকে দিতে পাবতুম তাহলে হয়তো কিছুটা বোঝানো যেত, কীভাবে ঊর্বা কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত কবতেন। জাতকের মূল কাহিনীটিকে গল্পাকাবে সাজিয়ে তুলতে আমি যেমন কিছুটা সংলাপ, কিছুটা ঘটনা-সংস্থাপন কল্পনা কবে নিয়েছি, বৌদ্ধ শিল্পীবাও তেমনি মূল কাহিনীর কোথাও বিস্তার করেছেন, কোথাও সংক্ষেপ কবেছেন। এটুকু বলতে পারি, আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র-শিল্পে চিত্রনাট্যকাব যতটা স্বাধীনতা ভোগ কবেন, অজস্র শিল্পীবাও ততটাই ভোগ কবেছেন জাতকেব কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে রূপায়ণে।

মাঝেব তোবণ-ছাবটি যেন একটি পূর্ণচ্ছেদ বেখা। যেন সেটি ছুটি দৃশ্বেব মাঝখানের ববনিকা। বামপাশে ‘ফেড-আউট’ হয়ে যাচ্ছে বাজাব প্রমোদকক্ষেব দৃশ্বে, আব দক্ষিণ-পাশে ‘ফেড-ঈন’ হচ্ছে বাজাব গৃহতাগেব দৃশ্বে।

এ পাশেব দেওয়ালে ( ১৩ ) শিবি জাতকেব একটি কাহিনী। জাতক-বর্ণিত শিবি কাহিনী কিন্তু নয়। মহাভাবতে শিববাজাব যে উপাখ্যানটি আছে তাকেই রূপায়িত কবা হয়েছে। মহাবাজ শিবি বসে আছেন বঙ্গসিংহাসনে। তাঁব একহাতে শবণাগত কবুতব, সম্মুখে শ্বেনপক্ষী। পবেব প্যানেলটিতে, দেখছি মহাবাজ নিজ অঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়ে তুলাদণ্ডে ওজন করছেন। চিত্রটি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে এসেছে।

শিবি জাতক

সঙ্ঘপাল ও মহাজনক জাতকেব চিত্র-সম্বলিত প্রাচীরেব সম্মুখে যে ছয়টি স্তম্ভ আছে, তাব শীর্ষদেশগুলি লক্ষণীয়। কোথাও নাগবাজা রূপমূলে প্রণাম করছেন ( ১১৪ )। কোথাও ছুটি যুবান বণ্ডেব যুদ্ধদৃশ্বে ( ১১৫ )। বলদপাঁ যুগ্মবণ্ডেব প্রতি অঙ্গে মাংসপেশী প্রকটিত। কোথাও বা ষড়ভুজ বামন মূর্তি ( ১১৬ )।

সম্মুখেব প্রাচীরে দেখছি একজন বাজপুত্রকে অভিষেক স্নান কবানো হচ্ছে ( ১১৭ )। আমাদের গাইড বললেন—এটি মহাজনক জাতকেরই ঋণ-চিত্র। একাদেমী প্রকাশিত চিত্র-সম্ভাবেও সেকথা লেখা আছে,—বাজপুত্র সিংহাসনে বসে আছেন। দুজন কিস্কব ছাদিক থেকে ঘডায় কবে জল ঢালছে। হতে পাবে এটি মিথিলায় মহাজনকেব আভিষেক দৃশ্বে। কাবণ, তাব পাশেই দেখছি একটি বিবসনা নাবীমূর্তিকেও স্নান করানো হচ্ছে। বোধ কবি সে সীবলী। এখানে ষতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সীবলীব বিবসনা স্নান-দৃশ্বে দেখছি জল ঢালছে দুজন কিস্কব—কিস্করী নয়। এতো ভাবতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কোন যুগেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন—এখানে এই নাবীটি যদি সীবলীই হবে, তবে তার গাত্রবর্ণ ষ্বেত কেন? পূর্ব-বর্ণিত মহাজনক জাতকের প্রতিটি চিত্রে সীবলীকে গাট শ্যামালী করে আঁকা হয়েছে। আগেই বলেছি, আবাব বলছি—অজস্র-শিল্পী সাদৃশ্য-সামঞ্জস্যে রুখনও ভুল করেন না। বিশ্বাস্তব জাতক, মহাজনক জাতক, বিধুর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতি বড় বড় কাহিনী-চিত্রে কোন কোন চরিত্রকে ছয়বার বা আটবারও

আকতে দেখেছি--কিন্তু তাদের আকৃতিগত, বর্ণগত বা ধর্মগত কোন বৈপরীত্য কখনও নজরে পড়ে নি। তাই মন মানে না যে, এটি সীবলীর আলেখ্য (চিত্র—৩২)।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলি। সীবলী ছিল অপূর্বসুন্দরী; কিন্তু তাকে গাঢ় রঙে ঐকেছেন শিল্পী। তার কারণ, অজন্তা-শিল্পীর চোখে গৌরবর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক নয়। শুভ্রাঙ্গীর অভাব নেই অজন্তায়, কিন্তু কৌতুককর ঘটনা হচ্ছে এই—যে কয়টি সুন্দরী নারীর চিত্র অজন্তায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, তার প্রায় সবগুলিই শ্যামাঙ্গীর। সীবলী শ্যামাঙ্গী, মবণাহতা রাজকন্যা কালো, গোপা কালো, ইবান্দাতী কালো, কৃষ্ণা অম্বরী এবং কৃষ্ণা-রাজকুমারী তো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।

মন্দির-স্থপতির ভাষায় মূল-গর্ভমন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট কক্ষটিকে বলা হয়—‘অস্তুরাল’। এ গুহায় অস্থবালের প্রবেশপথে দুর্দিকে ছটি বিবাটাকার বোধিসত্ত্বের আলেখ্য। একদিকে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির (১৮ ক) আলেখ্য, অপরদিকে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির চিত্র (১৯)। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালুম বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সম্মুখে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ পদ্মপাণিকে বর্ণনা করার মত কলম, অথবা একে দেখাবার মত তুলি আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি এ চিত্রে এমন একটা কিছু আছে যার জগু এর সম্মুখে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বাবে বাবে ফিবে ফিবে ঐকে দেখলেও চোখ ক্লান্ত হয় না--পীড়িত হয় না। অজন্তায় একাধিক চিত্র আছে যা নাকি শুধু রেখা দিয়ে বা রঙ দিয়ে আঁকা নয় যেন তাব মতো হাজার বছর ধরে বন্দী হয়ে আছে শিল্পীর একটি অমুক্ত কথা, একটি অপ্রকাশিত ধ্যানের মন্ত্র! যা খোলা নয়, ঢাকা। তবু তা যে আছে তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় অন্ধনিত্র ঐকান্তিকতায় নিয়ে ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালে। এ চিত্রটি সেই জাতের। বিশাল হৃদের গভীরতা যেমন তার উপরিভাগের নিম্পন্দ রূপরেখায় ব্যক্ত হয় না, যেমন তা অনুমান-নির্ভর—এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির ভাবের বাঞ্ছনাও তেমনি অনুভূতিসাপেক্ষ। বোধ কবি একেই আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন—চিত্রের প্রাণ, তাব ব্যঙ্গ!

এ চিত্রের সেই ব্যঙ্গের মর্মকথা বলতে পারব না, তবে বহিরঙ্গের বা রূপরেখার একটা বর্ণনা দিতে পারি। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির এই বিখ্যাত চিত্রটির অনুলিপি নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনি; কিন্তু সে যে ব্যর্থ অনুকরণ তা বুঝতে পারবেন ঐ মূল চিত্রটি দেখলে।

তাজমহল যারা দেখেছেন, আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির যারা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ইতিপূর্বে ফটোগ্রাফ

অবলোকিতেশ্বর  
পদ্মপাণি

দেখে তাঁদের যে ধারণা ছিল, তা ভ্রান্ত। কিন্তু সে ভ্রান্তি দৈর্ঘ্য-

প্রস্থ-উচ্চতার তিন মাত্রার বস্তুকে আলোকচিত্রের দুই মাত্রায় প্রকাশের প্রয়াসে নিহিত। কিন্তু অবলোকিতেশ্বর মূর্তির আলেখ্য তো দুই মাত্রার চিত্র—চিত্রে তার সার্থক অনুকৃতি অসম্ভব হবে কেন? কিন্তু তা হয়েছে। হয়তো অনুকৃতির আপেক্ষিক ক্ষুদ্র আয়তনের জগুই এ ব্যর্থতা, হয়তো অনুকারকের সাধনায় ধ্যানের দৃষ্টি ছিল না বলেই



এ অসাক্ষ্য। মোট কথা, মূল চিত্রের সঙ্গে এযাবৎকাল যত অনুকৃতি হয়েছে তাব প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

নিঃসন্দেহে এ গুহায় এই চিত্রটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, মহামহিমময় বিশাল। বোধিসত্ত্বের দক্ষিণহস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, মস্তকে মণি-মাণিকাখচিত বাজমুকুট, কণ্ঠে মুক্তার শতনরী, কর্ণে হীৰককুণ্ডল। কিন্তু আগেই বলেছি, এৰ মূল আবেদন বহিবঙ্গে নয়, ভাবেব বাজ্যে। বাবে বাবে বোধিসত্ত্বের রূপ নিয়ে জন্ম নিচ্ছেন বুদ্ধদেব—কিন্তু তাঁব চরম মুক্তি, মহাপবিনির্বাণ হচ্ছে না। হবে কেমন কবে? বোধিসত্ত্ব যে বাবে বাবে নির্জন সাধনক্ষেত্র থেকে ফিবে ফিরে আসছেন অত্যাচাবিত নিপীড়িত জগৎবাসীৰ কল্যাণকামনায়। জবা-ব্যাধি-মৃত্যু-অধ্যাষিত এ মবজগতে একক-সাধনায় সে কিছুতেই তিনি আত্মনিয়োগ কবতে পাবছেন না। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিব মূর্তিতে তাই ফুটে উঠেছে কাকণেব অপরূপ বাঞ্জনা, যেন তিনি বলছেন—জগৎকে ছেড়ে একক-মুক্তিৰ কামনা আমাব নয়। বোধিসত্ত্ব ত্রিভঙ্গমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভাবাবেশে লীন হয়ে।

পদ্মপাণিব পাশেই একটি কৃষ্ণ নাবীমূর্তি নিঃসন্দেহে ইনি অবলোকিতেশ্ববেব শক্তিমূর্তি। এ মূর্তিটিও অপূৰ্ব। প্রায় নিবাববণা, কিন্তু মাতৃহ-ভাব ছাড়া অন্য কোন লাস্ত্রমযী ভাবেব চিহ্নমাত্র নেই এ আলংখ্যাটিতে ( ১৮ খ )।

পদ্মপাণিব উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সবে আসি অন্তবালেব ক্ষুদ্রতব কক্ষে। এই অন্তবালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকেব প্রাচীবে দেখছি একটি বৃহদায়তন প্যানেল ( ১১০ )। রূপস্মারত সিদ্ধার্থকে সসৈন্য 'মাব' আক্রমণ করেছে। মাবেব তিন লাস্ত্রমযী কন্যা—তস্থ, বতী ও বঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায় গৌতমেব চিত্তহরণ কবতে উত্থোগী। তাদেব মধ্যে একজন আসন্ন-প্রসবা। ধ্যান-স্তিমিত গৌতমেব চতুর্দিকে বীভৎস বসেব সঞ্চার। নানাভাবে মাবেব স্বেদসল ভীতি প্রদর্শন কবছে তাঁকে। কাম, লোভ আব ভয়—কিন্তু মাব পরাজিত। জ্ঞাননির্ধাতকল্মষ জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী নির্বিকাব। এই একই বিষয়বস্তু অবলম্বন কবে সাবনাথেব মূল গন্ধেশ্ববট মন্দিবে একজন জাপানী চিত্রকবেব একটি অনবগ্ন প্রাচীব-চিত্র দেখেছি মনে আছে।

গর্ভমন্দিবেব দুই প্রান্তে দুটি প্রস্থব-নির্মিত নাবীমূর্তি। একজন -গঙ্গা ( ১১১ ), অপর জন যমুনা ( ১১২ )

মল-গর্ভমন্দিবেব বিবট বুদ্ধমূর্তি ( ১১৩ )। সাবনাথ মৃগদাবে বুদ্ধদেব বসে আছেন পদ্মাসনে- ধমচক্র মৃত্যায়। গাইড এই মূর্তিটিব তিন দিকে আলো ফেলে বুদ্ধদেবেব তিন বকম ভাব-ব্যাঞ্জনা আপনাবে দেখিয়ে দেবে। একপাশে আলো ধরলে মনে হবে তিনি হাসছেন—অপরপাশে আলোকপা\* করলে মনে হবে তিনি বিষাদখিন্ন। আলো সামনে ধরলে মনে হবে তিনি ধ্যানমগ্ন। তা সত্যিই মনে হয়, কিন্তু আমাব ব্যক্তিগত ধাবণা এ শুধু এ্যাকসিডেন্টাল আর্ট। অনেকে এ চাতুর্ঘ্যে মুগ্ধ হচ্ছেন দেখলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পীর মনে একথা ছিল না। আলোকসম্পাতের চাতুর্ঘ্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না অজ্ঞতার জাত-শিল্পীর দল।

অস্তুরালের পূর্বদিকের প্রাচীরে দেখি সারি সারি বুদ্ধমূর্তি (১১১৪)। অসংখ্য! না, সংখ্যাতীত নয়, এক হাজারটি। শ্রাবস্তী নগরীতে একবার অবিবাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত বুদ্ধদেব সহস্র মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছিলেন। এই প্রাচীর-চিত্র সেই অলৌকিক ঘটনাটি নিহত।

এর পরে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণিব মূর্তিটি। তাঁর পায়ের কাছে যে প্রতিহাবীটি আছে, তাকে পারশ্বদেশীয় বলে মনে হয়। তার কোমরবন্ধে চামড়ার বকলেশটি দ্রষ্টব্য। বোধিসত্ত্বের বামে ছুটি নাবীমূর্তি। তার ভিতর একটি নিকষ কালো। ইনিই কৃষ্ণ-রাজকুমারী (১১১৫)।

অপূর্ব রূপবতী এই কৃষ্ণ-রাজকুমারী (চিত্র—১১৩)। বোপ করি, অজ্ঞতার ত্রিশটি গুহার যাবতীয় নারীমূর্তিকে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় এ পিছনে ফেলে আসতে পাবে। অথচ এর গাত্রবর্ণ কষ্টিপাথরের মত কালো। উন্নত-নাসা পয়কোরকতুলা ছুটি ভাববিহ্বল নয়নে মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি। ললিত কপোলে কুঞ্চিত কেশদাম কোতুহলী

কৃষ্ণ-রাজকুমারী

হয়ে বুক্কে পড়ে দেখছে তাব অনিন্দাসুন্দর মুখখানি। ললাটে মণি-মাণিক্যখচিত টায়রা, পুষ্পমালো ঘননিবন্ধ কবরীপাশ। নিরা-বরণ উরসে ঘোবনের যুগ্ম-জয়স্তম্ভ। কিন্তু হায়! ইনি চিরবিরহিণী! এই অন্ধ গুহার বন্ধ কক্ষে হাজার বছর ধরে গবরীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছেন কৃষ্ণ-রাজকুমারী। ঐব নায়ক আজও এসে পৌঁছায় নি! শিয়রের কাছে এক বুদ্ধের মূর্তি। বোধ কবি, ইনি বুদ্ধ রাজা—অর্থাৎ বাজকুমারীর পিতা। দুশ্চিন্তায়, চর্ভাবনায় জরাগ্রস্ত! পাশেই বাজকুমারীর একজন সখী। হাতে তার অর্ধা-খালিকা। তার একটিমাত্র চোখ অক্ষত আছে—কিন্তু ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ঝবে পড়ছে তার প্রাণের আকুলতা, তার উৎকর্ষ। কান পাতলে শুনতে পাবেন ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে তার ঐকান্তিক আবেদন—‘এমন করলে যে তুমি মাঝে যাবে সখি,—এ খালা থেকে যা হোক কিছু তুলে মুখে দাও!’

বিশ্বাস করুন, এই একটিমাত্র খণ্ড-চিত্রই আপনাকে পাগল করে দেবে!

স্তম্ভশীর্ষে কোথাও দেখছি যুগ্মহস্তী (১১১৬). কোথাও বা হরিণশিশু (১১১৭)। হরিণগুলির লক্ষণীয় শিল্পচাতুর্ঘ্য এই যে, চারটি হবিণ খোদাই কবা হয়েছে যাদের একটি-মাত্র সাধারণ মাথা।

এখানে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। গাইড বারে বারে আপনার দৃষ্টি এই সব লঘু শিল্পচাতুর্ঘ্যের দিকে আকৃষ্ট করবে। এই দেখুন—চার হরিণের এক মাথা, এই দেখুন—ছয় নর্তকীর ছয় হাত, ঐ দেখুন দুই ঘোড়ার এক মাথা। আলো! ডাইনে-বামে সরিয়ে দেখাবে বুদ্ধদেব হাসছেন, কাঁদছেন; কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ দেখতে আপনি

অজস্ফায় যান নি। এ নিয়ে মুগ্ধ হবেন না আপনি। এ নিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। অজস্ফার মহত্ব এই সব সস্তা শিল্পচাতুর্ঘে নেই--তা আছে ঐ অবলোকিতেশ্বরে, ঐ মরণাহতা রাজকন্ডার চিত্রে, ঐ সারিগুত্রের পরীক্ষায়, আর গোপা ও বাহুল আলোখে। প্রদীপ ধরে যেমন সূর্যকে দেখানো যায় না--যতই বাক্‌বিস্তার করি, ভাষায় তেমন সে চিত্রগুলির মর্মকথা বোঝাতে পারব না। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, মনকে সংযত ককন, অজ্ঞানত্ব করুন, মনে মনে বলুন : নমো তমস ভগবতো অবহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্। পসাদ-কণা



চিত্র - ১৩

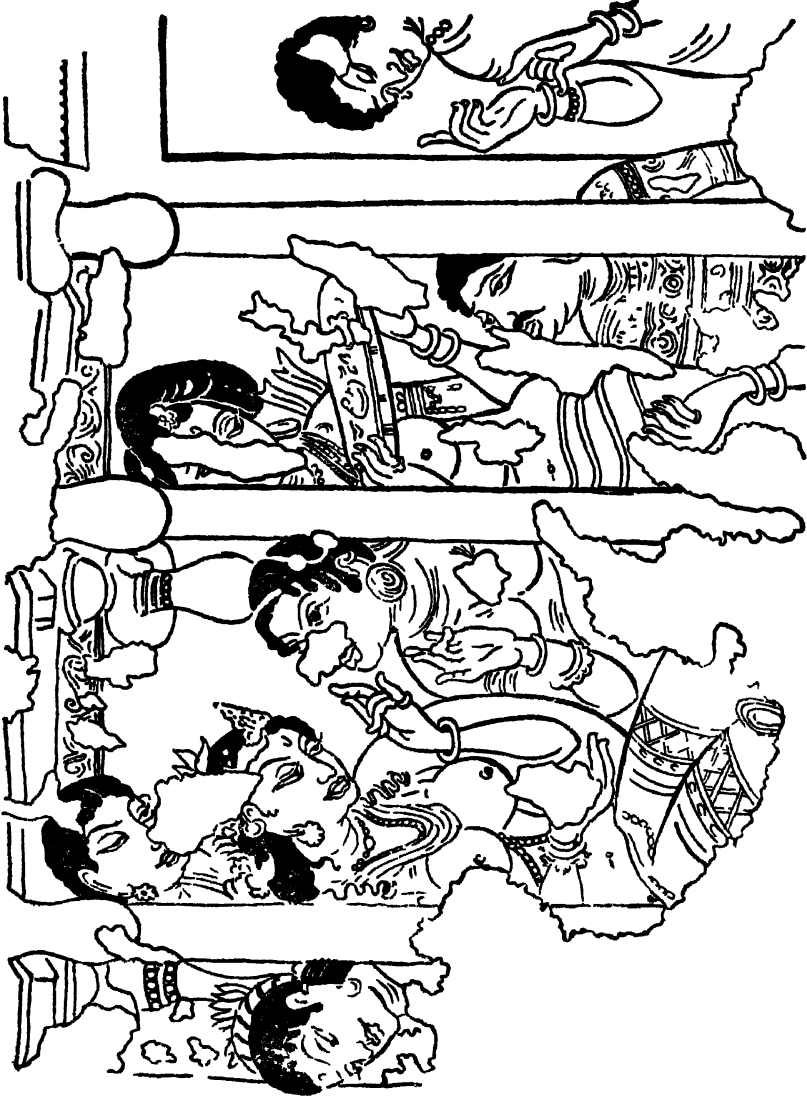
রুক্ষণ-রাজকুমারী ও সখী

অবস্থান—'১৫

কিছুটা নিশ্চয়ই পাবেন। আব শিল্পচাতুর্ঘেব এই সব লঘু নিদর্শন দেখেই যদি তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসেন, তবে আপনার অবস্থা হবে সেই তান্ত্রিক সাধকের মতো--যে কিছুমাত্র বিড়্‌তি লাভ করে ত্যাগ করে তার পবমপ্রাপ্তিব সাধনা, মশ্‌ফল হয়ে থাকে অলৌকিক কিছু ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে !

অস্তুরালেব সিলিঙে গোলাকৃতি পদ্মেব নক্‌শা। মাঝের বড় হল-কামরার উপরে যে সিলিঙ, তাতেও নানা জাতের অসংখ্য চৌখুপি ও নক্‌শা। ছাদের একটি বিশেষ স্থানে (১১৮) দাড়িওয়াল্লা এক বিদেশী বাজাব মূর্তি। পাশে রানী। কেউ কেউ বলেন, ইনি পারস্যদেশীয় সম্রাট খুসরৌ ও তাঁর রানী সুন্দরী শীরীন। এদিকের

(১) এই নিয়ে গত শতাব্দীর শেষপাশে ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মিঃ লেমন্ কান্ত'সনের মধ্যে মত-বিরোধজনিত বাৎ-প্রতিবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত স্বধীজন কান্ত'সন-সাহেবের মতই মেনে নেন--অর্থাৎ, ওটি পারস্য পরবায়ের জ্ঞা [ 'On the Age of Ajanta'—by Babu Rajendralal Mitra, India Society, Jan. 1880 ভ্রষ্টব্য ]।



ଅଭିଜ୍ଞାନ  
ମତାଙ୍ଗଳା  
୫୬-୫୭  
ପୃଷ୍ଠା

প্রাচীনে দেখি আব একটি বাজসভাব দৃশ্য। এটি সম্ভবতঃ চালুক্যবাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর  
 কুম্বৌ, শিবী বাজসভা ( ১১১১ )। চিত্রে দেখছি, চালুক্যবাজ দ্বিতীয় পুলকেশী  
 ও পুলকেশী সিংহাসনে আসীন। পিছনে ছত্রধারী। সম্মুখে তাঁর পদতলে পুষ্প-  
 আস্তবরণে একটি ব্যক্তিক। 'কয়েকজন পাবশ্চদেহীয় বাজদূত উপঢৌকনের অর্ঘ্য-খালিকা  
 হাতে একে একে প্রবেশ কবছে বাজসভায়। একজনের হাতে একছড়া মুক্তামালা।

পূর্বদিকের দেওয়ালে চিত্রগুলিকে সনাক্ত কবতে পারি নি। সেগুলি অধিকাংশই নষ্ট  
 হয়ে এসেছে ( ১১১০ )। শিবি জাতকের পাশের প্যানেলে ( ১১২১ ) দেখছি, একটি  
 বাজপ্রাসাদে জনৈক বানীক কিধনী এসে সবাদ দিচ্ছে দ্বাবে একজন মহাভিক্ষু  
 সমুপস্থিত ( চিত্র ১৫ )। পাশে দাব এবং দ্বাবেব ওপাশে মহাভিক্ষুকেও দেখা যায়।  
 তাকে দেখে মনে হয় স্ময় বুদ্ধদের। কাহিনীটি বিশেষজ্ঞের সনাক্ত কবতে পাবেন নি।  
 কিন্তু আমি তে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে অজন্তা দেখতে যায় নি, তাই অনায়াসে মনে কবে  
 নিলুম এ ঘটনা কপিলাবস্তুর। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে বুদ্ধদেবের পব বুদ্ধদের কপিলাবস্তুরে  
 এসেছিলেন নগর সন্নিকটে স্থাপ্রোবাবাম বিহাবে কবেকদিন বাস কবেন। ভিক্ষার্থে তিনি  
 কপিলাবস্তুর নগরে প্রবেশ কবেন। তখন নাকি বশোববা শুদ্ধোবনের কাছে আপাও  
 জানিয়েছিলেন বাজপুত্র ভিক্ষা চাইছেন, এ অনাটাব সহ হয় নি তাব। কিন্তু বুদ্ধদের তা  
 শোনে নি। তিনি নগর-ভ্রমণের পথে সাবিপুত্র এ মহামোদগম্মায়নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত  
 বাজববুর কঙ্কের সামনে এসে দাড়িয়েছিলেন। এ ছবিটি যে সেই দৃশ্য নয়, তা-ই বা জানব  
 কেমন কবে ?

স্নানদণ্ডের পাশের প্যানেলে ( ১১২১ ) বোধিসত্ত্বকে কয়েকটি নারী অর্ঘ্যদান কবছে।  
 বোধিসত্ত্ব বসে আছেন একটি প্রস্তবাসনে। তাঁর পাশ থেকে আকা প্রাফাইল দেখা  
 যাচ্ছে ( চিত্র ৩১ )।

চম্পায় জাতকের কাহিনীটি ( ১১২৩ ) বর্ণনা কব এবাব আমবা প্রথম হুতা-মন্দির  
 থেকে বিদায় নেব।

অঙ্গ আব মগধ রাজ্যের সৌমানাষ বয়ে যায় চম্পানদী। অঙ্গ আব মগধে বিবাদ-  
 বস বাদ লেগেই আছে অখচ চম্পানদীর অতল জলের গভীর নাগবাজ্যের কথা কেউই জানে  
 না। সেখানে বিবাদ নেই, বিবোধ নেই, শুধু আমোদ আব প্রমোদ বিলাস আব বাসন।  
 পূবজন্মে এই নাগলোকের কথা শুনে বোধিসত্ত্বের মনে বাসনা হয়েছিল ঐ নাগবাজ্যের  
 অধীশ্বর হওযাব। পবজন্মে সত্যই তিনি জন্মেছিলেন চম্পানদীর অতল জলের গভীরে,  
 ঐ নাগবাজ্যের প্রাসাদে রাজপুত্র হয়ে। কালে তিনি হলেন নাগবাজ্যের অধীশ্বর।  
 নাগকন্যা সুমনাকে বিবাহ কবলেন তিনি।

কিন্তু প্রতি জন্ম যা হয়েছে এবাবও তাই ঘটল। বোধিসত্ত্বের মনে শাস্তি নেই।  
 তাঁর অন্তবেব নিভূতে অনন্ত জিজ্ঞাসা, তিনি ভূমাব পবশপ্রার্থী। মণি-মুক্তার্থচিত প্রাসাদে  
 বিলাস-বাসনের চূড়ান্ত আয়োজনের মধ্যেও নাগবাজ্য কেমন যেন উদাসী-অগ্রমনা।

নাগরানী সুমনা লক্ষ্য করেন স্বামীর ভাবান্তর। তিনি গোপনে পরামর্শ করেন মন্ত্রী সঞ্জে। নিতানূতন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়। কিন্তু তাতে চম্পের্য জাতক শাস্ত্র হয় না বোধিসত্ত্বের বিক্ষুব্ধ হৃদয়। মর্ত্যালোকের ছুঃখ-হৃদর্শনা দেখে নাগরাজ স্থির করলেন, রাজবৈভব ত্যাগ করে তিনি গোপনে সন্ন্যাস নেবেন। সদগুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন একাই। পাছে মহারানী বাধা দেন, পাছে নাগকন্যা সুমনা পথরোধ করে দাঁড়ায়, তাই কাউকে কিছু জানালেন না। একদিন গভীর রাত্রে গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে—জাগতিক ছুঃখ-হৃদর্শনার মূল অন্বেষণ করে দেখবেন তিনি। দেখবেন, কেমন করে এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-অধ্যুষিত মরজগৎকে আনন্দ-নিকেতনে রূপান্তরিত করা যায়। ক্রমে বাত্রি প্রভাত হল। তব পথ চলেছেন নাগবাজ চম্পের্য। কে তাকে দেবে সভা পথের নির্দেশ? কে শোনাবে তাঁকে মুক্তি-মন্ত্র? অস্মাত অভুক্ত পথশ্রমে অনভ্যস্ত নাগবাজ অবশেষে দিনান্তে এসে আশ্রয় নেন পথের পাশে! ক্লাস্তদেহে বিশ্রাম নিতে থাকেন তিনি।

ঠিক সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক সাপুড়িয়া। হঠাৎ তাব নজবে পড়ে, পথপ্রান্তে ক্লাস্তদেহে পড়ে আছে এক মহানাগ। চমকে ওঠে সাপুড়িয়া! এ যে নাগরাজ! এ-কে কি ধবা যাবে; যদি দেশ বিদেশে এই নাগবাজেন নাচ সে দেখাতে পাবে, তাহলে তার ভাগ্যই কিবে যাবে যে! কিন্তু ও কি ধবা দেবে? সভয়ে এগিয়ে আসে সাপুড়িয়া সেই মহানাগের দিকে। আশ্চর্য, নাগবাজ কোন বাধা দেন না—বিনা প্রতিবাদে তিনি প্রবেশ কবেন তার বাঁপিতে। অহিংসাব অবতাব বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ কবেন না। ভাগ্যাব নির্দেশ তিনি মেনে নেন বিনা প্রতিবাদে। ভাগ্যাব কী বিড়ম্বনা! যাব মস্তকে একদিন শোভা পেত হীবা-মুক্তাখচিৎ চম্পের্যরাজ্যের বাজহত্র, তিনি আজ পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়ান সামান্ত এক সাপুড়িয়ার নির্দেশে।

এদিকে নাগবাজ গৃহত্যাগ করাব পর্বদিন প্রভাতে জেগে উঠে চম্পের্য মহাবানী মাথায় হাত দিয়ে বসেন। যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে। সবনাশ হয়ে গেছে। বাজপূবী শূন্য হয়ে গেছে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী, সেনাপতি আর নগর-কোর্টাল। দেশে দেশে চব পাঠানো হল—খুঁজে বাব কবতেই হবে নিরুদ্দিষ্ট রাজাকে। কিন্তু কেউ কোন সন্ধান পায় না। একে একে ফিরে আসে হতাশ চবের দল। মহারাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন। ছুঃখ অল্পশোচনায় মহারানী শয্যা নিলেন। এলেন রাজবৈভব। বানী বলেন : তোমরা পাব নি, আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখব আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই।

রাজবৈভব মাথা নেড়ে বলেন : তা তো হবে না মা। তুমি আজ আর এ স্থিনিয়ায় একা নও। তোমার দেহের মাঝে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যে। মহারাজকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু নাগবাজের ভবিষ্যৎ রাজাকে আমরা হারাতে রাজী নই।

বানী সুমনার ছুঃচোখে ভরে আসে অশ্রুজল। সে জল আনন্দের, সে জল বেদনার।

এদিকে সাপুড়িয়ার সঙ্গে পথে পথে যুরে বেড়ান নাগরাজ চম্পেয়া। অবস্তী, শ্রাবস্তী, বিদিশা প্রভৃতি নিত্য নূতন দেশ; কিন্তু তাঁর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কদম্বের আহাৰ্ঘ্য, সেই বন্ধ ঝাঁপির রুদ্ধ কারা, সেই বাঁশিব সুরে ছলে ছলে নাচা, সেই কৌতুহলী বালকদলের লোষ্ট্রাঘাত! অহিংসাব অবতার দিন গুণছেন শুধু—কে জানে কবে হবে মুক্তি। ক্রমে জ্বলে গেলেন তিনি তাঁর আত্ম-পরিচয়। জ্বলে গেলেন—কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তবু এতদিন মাঝে মাঝে মনে পড়ত নাগকন্যা স্মরণের কথা—ক্রমে সে-কথাও আর মনে রইল না তাঁর! শুধু মহানির্বাণের, মহায়ুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন তিনি।

এদিকে চম্পানদীর অতল জলের গভীরে চম্পেয়া বাজপুবীতে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। বাজপ্রাসাদে বন্ধ হয়েছে নহবাতের মূর্ছনা। স্তব্ধ হয়েছে বৈতানিকের ঘোষণা। প্রতি সন্ধ্যায় মহাবাজের প্রমোদকক্ষে আব জ্বলে না বজ্রদীপাবলী, বাজনতর্কী বাত-ব্যাদিগ্রন্থা। আনন্দ-নিকেতন পবিণত হয়েছে নিবানন্দ লোকে। দিন আসে, দিন যায়, কিন্তু যাব প্রতীক্ষায় বাজপুবীর প্রতিটি প্রস্তুতখণ্ড স্তব্ধ হয়ে প্রহব গণে, সে ফিরে আসে না। এ দৃশ্য আব সহ্য হল না নাগরানী স্মরণাব। তিনিও একদিন গভীর বাত্রে গৃহত্যাগ কবলেন গোপনে। খুঁজে তিনি বাব করবেনই নিকর্দিষ্ট মহাবাজকে।

পথে পথে যুবচে এক উন্মাদিনী নাবী। সাপুড়িয়া পাড়ায় যেখানে শোনে সাপ খেলানো হচ্ছে, সেখানেই ছুটে যায়। দেখে আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে। যাকে খুঁজছে এ তো সে নয়! দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে দেহ অশক্ত হয়ে পড়ে। পা আব চলে না, মনের ভাবের চেয়ে দেহের ভাব বেশী বলে মনে হয়। পথপ্রান্তে বসে পড়েন মহাবানী। এতক্ষণে মনে পড়ে যায় বাজবৈভব সাবধান-বাণী। ঠল দেহেব অভ্যস্তবে চম্পেয়া রাজার ভবিষ্যৎ নুপতির উদ্দেশ্যে বৈতানিকের দল মাজলিক তান শুক কবেছে, কিন্তু নির্বিঘ্নে কি তিনি তাকে আনতে পাববেন এ ধবখামে? হু-চোখে জলের ধাবা নেমে আসে বানীব। পথপ্রান্তে বলিণঘায় শায়িতা নাবী অন্তিম যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করেন অবশেষে!

কাহিনীব এ পর্যন্ত যেটুকু বলেছি তার কাহিনী-চিত্রগুলি কালের কবলে অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তা এব পরের অংশ ( চিত্র—১৫ ):

দেখছি এক রাজদববার। মহামহিম বারাগসীর স্বনামধন্য অধিপতি উগংসেন ( উগ্র-সেন ) বসে আছেন রঙ্গ-সিংহাসনে। তাঁর চারপাশে মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতির দল। দেখছি এক কাশীর পণ্ডিতকেও। মাথায় মস্ত অর্কফলা, হাতে লাঠি, গায়ে চাদব: সকলেই কৌতুহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। কী দেখছে ওবা? দেখছে সাপের খেলা। সাপুড়িয়া তার ঝাঁপি খুলেছে। তাঁর ভিতব থেকে বেরিয়ে এসেছেন ভীমকান্তি এক মহানাগ! অথচ কী শাস্ত, সমাহিত আত্মমগ্ন ভাব তাঁর। সাপুড়িয়ার বাঁশির তালে তালে জ্বলছেন তিনি।

কিন্তু দ্বারের বাইরে ও কার মূর্তি? ছিন্নবসনা শীর্ণদেহা ধূলিমলিনা এক অনাথিনী



ଚିତ୍ର—୧୧  
ଠାକୁରାଣୀ ଜାତବ



নারীমূৰ্তি। কোন ভিখাবিণী হবে বোধ হয়। কিন্তু ওব মুখে তো ভিখারীসুলভ কাঙালপনা দেখছি না। জীৰ্ণমলিন বহিবঙ্গ ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন আভিজাত্যের জ্যোতি। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক শিশু--তার অবোধ দৃষ্টি মেলে। আহা কী সুন্দর! ভিখারিণীৰ এমন সন্তান হয়? মনে হয় যেন কোন বাজুকুমার! মায়ের চোখে নেমেছে ছুটি জলেব ধাবা। যেন দীৰ্ঘ দুৰ্গম পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে তীৰ্থপথেব শেষ প্রান্তে, দেবমন্দিবেব দ্বাৰে। তাব একটি হাত ঐ পুত্ৰেব কাঁখে--যেন ঠেলে দিয়ে বলছে: জ্বাখবে পাগলা--ঐ তোর বাপ।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি নাগরানী স্মনাব এই তীৰ্থযাত্রাব ফলশ্ৰুতিব দৃশ্যটি। কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিৎ ফিবে পেলাম বঙ্গভাষায় একটি বামাকঠেব প্রশ্নে: এ-গুলো কিসেব ছবি?

সঙ্গে সঙ্গে শূনি উত্তৰ--দেখেও বুঝলে না? সাপ খেলানো হচ্ছে। স্নেক-চাৰ্মাব। ও-সব দেখবে ফবেন ট্ৰিস্ট, যাবা আমাদেব মতো পথে-ঘাটে সাপ-খেলানো দেখে না। চল চল, অনেক বাকি আছে এখনও।

সদলবলে ওঁবা চলে গেলেন সাপ-খেলানোব এ-চিত্ৰটি এক নজব দেখে কি না দেখে! সাপুড়িযাব বাঁশিব তালে তালে ছুলাচন নাগবাজ--আত্মনিমগ্ন তিনি--হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল দ্বাবপথে। বিহ্ব্যৎপৃষ্টেব মূৰ্ছ চমকে উঠলেন একবাব। তাবপব স্থিব হয় গেলেন। নাগবাজেব পূবস্মৃতি ফিবে এসেছে। ঐ দ্বাব-প্রান্তেব ভিখাবিণীকে দেখে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাব মত স্থিব হয়ে গেছেন তিনি। তালভঙ্গ হল নৃত্যছন্দে। বিবন্ধ হলেন কাশীবাজ। বিস্মিত হল সাপুড়িযা। কিন্তু নাগবাজেব অভিজ্ঞান ফিবে এসেছে ততক্ষণে। ঐ অনাখিনী ভিখাবিণীকে উপেক্ষা কবতে পাবলেন না তিনি। সব ভুল হয়ে গেল তার--নবদেহ ধাবণ কবে এগিয়ে গেলেন দ্বাবেব দিকে। ভিখাবিণীৰ ভীক ববাস্থুলি তুলে নিলেন নিজ হাতে, বললেন--অপবাধ করেছি, তুমি ক্ষমা কব আমাকে।

নিকৰ্দ্ধিষ্ট নাগবাজ চম্পেয্য-ব কথা কে না জানে জস্তুবীপে? পবিচয় পেয়ে কাশীশ্বব উগ্গসেন সি হাসন ছেড়ে উঠে দাডালেন। সমস্মানে বাজৰ্ষি চম্পেয্যবাজকে এনে বসালেন আৰ একটি সি হাসনে। বাজাস্থপুব থেকে নাগবানী স্মনাব উপযুক্ত বসন-ভূষণ নিয়ে এল পবিচাবিকাৰ দল।

পবেব প্যানেলটিতে দেখছি কাশীবাজ উগ্গসেন আৰ নাগবাজ চম্পেয্য বসেছেন মুখোমুখি। বোধিসত্ত্ব চম্পেয্য শোনাচ্ছেন ধৰ্মেব অন্তশাসন (চিত্ৰ-১৬)।

এই দববাব-দৃশ্বেব এক প্রান্তে শিল্পী একটি কৌতুককব খণ্ড-চিত্ৰ ঐকেছেন। নাটকেৰ মাঝে মাঝে যেমন খণ্ড-দৃশ্বে বিদ্যক এসে দৰ্শকদেব মনটা হালকা কবে দিয়ে যায়, অজন্তাব শিল্পী যেন চম্পেয্য বাজাবানীৰ মিলন-দৃশ্বেব পবে তেমন এক খণ্ড-চিত্ৰ কিছু কৌতুক পবিবেশন কবতে চেয়েছেন।

নাগবাজ ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন। এ-পাশে কয়েকটি লোকের জটলা। মুখে ভাবব্যঞ্জনা দেখে বেশ বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। কেউ ধর্মকথায় আত্মমগ্ন, কেউ পাবলৌকিক তত্ত্বের চেয়ে লৌকিক লাভের আশায় সক্রিয়। একটি লোককে দেখছি, যেন স্পেন বা ফরাসী দেশীয় পোশাক-পরা। একজন সুতনুকা পরিচারিকা তন্ময় হয়ে নাগবাজের মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শ্রবণ করছে। তাব দক্ষিণহস্তে ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ একটি অর্ঘ্য-খালিকা। পিছন থেকে একটি নীচ জাতীয় হস্তলাঘব মুকোশলে ঐ খালিকা থেকে ফল চুঁবি করছে। তাব দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে লোভ-এবং ভয়ের সংমিশ্রণ। ঠিক পাশের বাজনিকাটি এ চৌর্যবৃত্তিটি দেখতে পেয়েছে। সে পার্শ্ববর্তী তন্ময় পরিচারিকাকে যেন সাবধান করে দিচ্ছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী এমনই



চিত্র ১৬০

চম্পিয়া জাতব - কাশীনাথ উগগসেন ও নাগবাজ চম্পিয়া

একটি ঘটনাস্রোতে যেন গা ভাসিয়েছিল, আব শিল্পী যেন এ-ব স্নাপশটে এই খণ্ড-মুহূর্তটিকে শাশ্বত করে ধরে ফেলেছেন হঠাৎ।

ঐ যুরোপীয় পোশাক-পরা মানুষটিকে দেখে মনে পড়ছে অজস্রাব বিভিন্ন চিত্রে অসংখ্য বিদেশীকে বাবে বাবে দেখেছি। মঙ্গোলীয়, পাবলীক, গ্রীক, শক, পহলবদেব দেখেছি বহু চিত্রে। তাদের মুখাকৃতি, তাদের পোশাক দেখে বোঝা যায়, বৌদ্ধ শিল্পীবা একান্তবাসী হলেও, তদানীন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিধেব যোগসূত্রটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হয়তো এই শিল্পীর দলে অনেকেই ছিলেন—খাঁবা বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার আগে, পূর্বাশ্রমে, রাজদরবাবেব দৃশ্যগুলি প্রতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। অজস্রাব একান্ত গুণায় এই সব বিদেশীর যত্নায়ত্ত ছিল না নিশ্চয়—কিন্তু কী নিখুঁতভাবে এদের পোশাক, শিরস্শায়,

মুখাবয়ব এঁকেছেন এই নির্জনবাসী শিল্পীরা শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে! বিভিন্ন গৃহ-চিত্র থেকে সংগৃহীত সামান্য কয়েকটি নমুনা—চিত্র—১৭তে সন্নিবেশিত করলাম এই প্রসঙ্গে।

তা যেন হল—কিন্তু, আমি ভাবছিলাম অজ্ঞ কথ্য। প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :

অজ্ঞতার শিল্পী যা-কিছু এঁকেছেন তার প্রত্যেকটির পিছনে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। চীন, জাপান বা দূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ শিল্পীরা বুদ্ধের জীবনের বা জাতকের যে সব চিত্র এঁকেছেন, তার পশুপাখী গাছপালা ঘরবাড়ী সব-কিছুকেই তাঁদের কল্পনায় দেখতে হয়েছে! কিন্তু অজ্ঞতার বৌদ্ধ শিল্পী যে-সব রাজারানী দাসদাসী সাধু ভিখারীর চিত্র এঁকেছেন, তাদের যে-সব মানন্দ-বেদনার অভিব্যক্তিকে তুলির চাঁনে ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলি তাঁরা অতি নিকট থেকে দেখেছেন। আর তাই সেগুলি এত বাস্তবাত্মক, এত জীবন্ত হয়েছে।



চিত্র—১৭

তাই ভাবছিলাম—এ-কথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অজ্ঞতার বৌদ্ধ শিল্পী কাশীরাজের দরবারের বাহির-দ্বারে ঐ অনাথিনীর ভাববাস্তবাকে রূপ দিয়েছিলেন ?

এ দৃশ্যে ঐ বিদেশীটির চিত্র দেখে মনে হয়েছিল, শিল্পী বিদেশীদের খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজসভার নিখুঁত আলংকার দেখে মনে হয়, যেন কোন এক বাস্তব রাজদরবারের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কল্পনার রাশ আলংকার করে দিলাম। কে জানে, এই অনবস্ত দরবার-দৃশ্যটি এঁকেছেন যে বৌদ্ধ শ্রমণ, তিনি হয়তো সত্যই ছিলেন এক রাজপুত্র। সেই অজ্ঞাত ভিক্ষু কি আজ থেকে হাজার বছর আগে একদিন গোপনে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তাঁর

রাজপ্রাসাদ, শবণ নিয়েছিলেন উখাগত বুদ্ধেব, ধর্মের আব সজ্জব ? কে জানে, হয়তো তিনি নিজেই ত্যাগ কবে এসেছিলেন আসন্ন-প্রসবা এক হতভাগিনী সীমস্তিনীকে কোন অবস্তী-বিদিশা-প্রাবস্তী কিংবা উজ্জয়িনীর এক নির্জন কক্ষে। পীতবসনে আচ্ছাদিত কবেছিলেন অস্তবেব বস্তুরাগকে। হয়তো দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন এই গুহা-মন্দিবে আলেক্ষ্য কপাষণেব কাজে। আব তাবপব কি কোন এক অস্তসূর্ষ-উস্তাসিত গোধূলি লগ্নে আলেক্ষ্য-নিবন্ধ-দৃষ্টি শ্রাশ্র শ্রমণ হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেয়েছিলেন এই গুহা-মন্দিবেব সন্মুখে, ঐ স্তম্ভটিব পাদমূলে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনাথিনী নাবীমূর্তি—অনিন্দ্যকাস্তি এক দেবশিশুব হাত ধবে ? হঠাৎ কি সেই ভিক্ষু ফিরে পেয়েছিলেন পূব অভিজ্ঞান, চিনতে পেবেছিলেন ঐ ভিখাবি'ক, আব তাব দেবত্বলভকাস্তি শিশুপুত্রকে ?

হ অপবিচিত মহান শিল্পী, আজ হাজাব বছবেব এপাব থেকে তোমাকে প্রশ্ন কবতে চাই—তুমিও কি শিউবে উঠে স্থিব হয়ে গিয়েছিলে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাব মত ? নাগবাজ চম্পয্য-র মত তুমিও কি হস্তাব দ্বাবদেশে এগিয়ে এসে বলেছিলে—অপবাধ কবেছি, আমাকে ক্ষমা কব ?

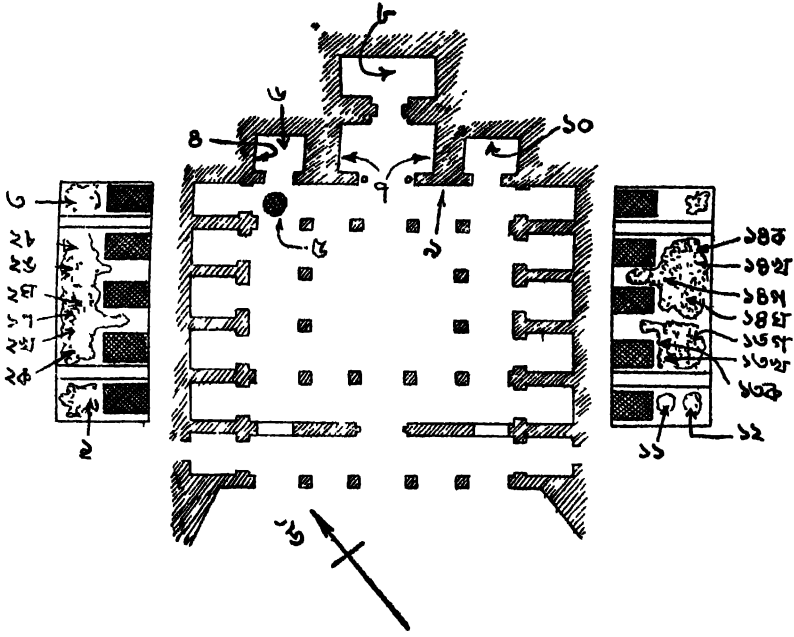
জানি, আমাব এ প্রশ্নেব জবাব বুখাই মাথা খুঁড়ে মববে এ গুহা-প্রাচীবে। তবু বিশ্বাস কবতে মন চায়—এ সত্য। না হলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল কবে সেই বৌদ্ধ শ্রমণ আঁকতে পেবেছিলেন এই মহান দৃশ্যপট।

আগেই বলেছি, অজস্তাব ত্রিশটি গুহা-মন্দিবেক অবস্থান অনুযায়ী এক-দুই-তিন ইত্যাদি নম্বব দেওয়া হয়েছে। এব ফলে, দ্বিতীয় গুহা-মন্দিব মানে এ নম্ব যে, প্রাচীনতাব দিক থেকে এটি দ্বিতীয়। বস্তুতঃ, এটি প্রথম গুহা-মন্দিবেব সমসাময়িক। অর্থাৎ, মহাযান বৌদ্ধ যুগেব। আকাবে প্রথমটিব অপেক্ষা কিছু ছোট। মাঝেব হল-কামবাটি ৪৮ ফুট × ৪৭ ফুট। এটিও বৌদ্ধ শ্রমণদেব আবাসস্থল, অর্থাৎ বিহাব। মূল মণ্ডপেব ছদিকে পাঁচটি কবে এবং সামনে আবও ছুটি কবে ছোট কক্ষ এব সঙ্গে

যুক্ত। এগুলি গবাক্ষহীন অঙ্ককাব কুটুবি। প্রথমেব মত দ্বিতীয় দ্বিতীয় গুহা মন্দিব

মন্দিবেও কুত্রম বৈদ্যাতিক আলোয় ভাল কবে দেখাবাব ব্যবস্থা আছে। এটিও প্রাচীব-চিত্রেব সম্ভাবে অজস্তাব অগতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এখানে প্রাচীব-চিত্রে নীল বস্ত্রেব প্রাবলা লক্ষ্য কবলাম। সন্মুখদিকে চাবটি স্তম্ভ এব দুটি অধ-স্তম্ভ (পিলাস্টাব)। প্রবেশ-দ্বাব দিবে সভামণ্ডপে প্রবেশ কবি। দেখি, পলেস্তাবা অনেক জায়গায় খসে খসে পড়েছে। গুহা-মন্দিবগুলি খনন কবা হয়ে গেলে, বৌদ্ধ শিল্পীব দল তাব উপব যুক্তিকাব একটি আস্তবণ দিতেন। মাটিব সঙ্গে গোময় এবং আশযুক্ত আবও কিছু মেশানো হত। এই পলেস্তাবা বা আস্তবেব বেব আনুমানিক এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি। এটি শুকিয়ে গেলে তাব উপব ডিমের উপবকাব খোলার মত পাতলা ও মসৃণ একটি চূনেব আস্তব দেওয়া হত যেন পঙ্কেব কাজ। তার উপব গিরিমাটি-বওেব বিভিন্ন পেলিলে চিত্রকবেব দল আলেক্ষ্যেব বহিরঙ্গটি

জাঁকতেন। সবশেষে পাথরগুঁড়া গুলে অথবা ভেবজ কিছু বেটে তার উপর জল-রঙের কাজ করতেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'টেম্পো' ও 'ওয়াশ' দুই পদ্ধতিতেই তাঁরা এঁকেছেন।



চিত্র-১৮

দ্বিতীয় 'ওয়াশ-মন্দিরের প্রাণ

- |  |   |
|--|---|
| ১। হংস জাঁক                              | ২১। পূর্ণাঙ্গন বুদ্ধদেবের আঁখা          |
| ২। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা                | ২২। চপ্টা ও হাবিটী মর্ম-মতি             |
| ৩। ত্রিভঙ্গ স্বর্ণে বুদ্ধদেব             | ২৩। গগনদূত (চিত্র-২১)                   |
| ৪। মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন                | ২৪। ক্ষান্তিবাদী জাঁক (চিত্র-২২)        |
| ৫। গুহোদ্যানের বাজসভা (চিত্র-১০)         | ২৫। পূর্ণ অবদান জাঁক (চিত্র-২৩)         |
| ৬। স্তম্ভের পাশে মাথা (চিত্র-২০)         | ২৬। পূর্ণ বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে |
| ৭। বুদ্ধের জন্ম                          | ২৭। ভাবিলাব বাণিজ্যতরী                  |
| ৮। শিশুর সপ্তপদ পরিমাণ                   | ২৮। শ্রাবস্তীতে পূর্ণ ও ভাবিলা          |
| ৯। একসারি বুদ্ধমূর্তি                    | ২৯। বিধুব পণ্ডিত জাঁক                   |
| ১০। অর্থাৎদানেচ্ছুর মনীষ্য               | ৩০। ইন্দ্রপ্রস্থ বাজসভায় পুণ ক         |
| ১১। তেইশটি হাঁসের ঝালা                   | ৩১। অক্ষত্রীড়ার দুগু                   |
| ১২। শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির মর্ম-মতি        | ৩২। বিধর পণ্ডিতের বিদ্যায় যা এ         |
| ১৩। শ্রাবস্তীর সহস্র বুদ্ধ               | ৩৩। নাপবাজে, বিধব (চিত্র-২৭)            |
| ১৪। ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি |   |

অর্থাৎ, চুনের সূক্ষ্ম আস্তবটি ভিজে থাকা অবস্থায় এবং তা শুকিয়ে যাবার পব ছভাবেই জাঁকা হয়েছে। অধিকাংশ চিত্রই অবশ্য দেওয়াল-গাত্র ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পব

আঁকা। ক্ষেত্রবিশেষে রঙ বেশ মোটা কবে দিয়েছেন -তেল-রঙেব ছবিতে অনেক সময় যেমন বড় উঁচু হয়ে লেগে থাকে--চোখ বুজে হাত দিলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনি আর কি। সবশেষে জলবায়ুৰ আক্রমণে যাতে ছবিব বড় অলে না যায়, তাই কিছু একটা আবচ্ছ আস্তর দিতেন তাঁরা। সেটি যে কি, তা আজও জানা যায় নি।

বামদিকের প্রাচীরে প্রথমেই নজরে পড়ল হংস জাতকের একটি কাহিনী ( ২।১ )।

কাশীর মহাবানী ক্ষেমাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, এক স্বর্ণ-বাজহংস তাঁকে ধর্মের বাণী শোনাচ্ছেন। স্বপ্নভঙ্গে বানী কাশীবাজকে তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললেন, মিনতি জানালেন- মহাবাজ যেন ব্যবস্থা কবে দেন, তিনি স্বর্ণ-হংসের কাছে ধর্মকথা শুনেতে চান। শুনে বাজা হাবাক্ হন। এ খাবাব কি অদ্ভুত প্রস্তাব।

হংস জাঃ

মহাবাজের বাস্তবিক্রমে মহাবানী মমাহতা তিনি অল্পজল তাগ কবোন। কাশীবাজ বিবক্ত হলেন, শেষ পর্যন্ত কথা প্রসঙ্গে সভাপণ্ডিতকে সে-কথা বলতেই তিনি সবিনয়ে বললেন, মহাবাজ, মহাবানী যে স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর পিছনে কিছু সত্যের ইঙ্গিত আছে। আপনি অবগত নন, কিন্তু পবমবুদ্ধ বতমানে এক স্বর্ণ-বাজহংসের মূর্তিতে বোধিসত্ত্বরূপে ধবামধমে সতাই অবতীর্ণ হয়েছেন ক্ষেমাদেবী সম্ভবতঃ তাঁকেই দেখেছেন স্বপ্নে। এ স্বপ্ন কল্যাণকর, আপনি বোধিসত্ত্বকে কাশীতে আনয়নের আয়োজন করুন।

তখন সভাপণ্ডিতের পরামর্শমত কাশীবাজ একটি পবিত্র স্থানে এক মনোবম সর্বোব খনন কবালেন। সে বাতা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হল। দু' দেশের যাত্রীবা দলে দলে আসতে থাকে এই অপকূপ সর্বোবটি দেখতে। শেষে হ সর্বাজ বোধিসত্ত্ব সপার্বদ একদিন সে সর্বোব দেখতে এলেন। মহাবাজেব নিদেশ দেওয়াই ছিল। কাশীবাজ-নিযুক্ত শিকাবী বন্দী কবে ফেলে স্বর্ণ-হংসকে। নিয়ে আসে তাঁকে বাজদবাবে। মহাবানী ক্ষেমা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পবম যত্নে তিনি স্বর্ণ-হংসকে সেবা-যত্ন কবতে থাকেন। স্বর্ণ-হংস প্রীত হয়ে বলেন তুমি কি চাও মা ?

ক্ষেমা বলেন : আপনাব কাছে ধর্মের মূল কথা শুনেই প্রভু।

বোধিসত্ত্ব বলেন : বেশ। শোনাব তোমাকে।

বাজাদেশে দববাবেব এক প্রাস্তে আয়োজন কবা হল এক ধর্মসভাব। স্বর্ণ-হংস বোধিসত্ত্ব কাশীবাজ ও মহাবানীকে সং ধর্মের মূল কথাগুলি একে একে বলতে থাকেন।

এই ক্ষেমাটির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু দেখা যায়, তাতে দেখতে পাচ্ছি একটি পদ্মবন-শোভিত সর্বোবব তাতে বাজহংস-ভীবে উত্তত ধনুকহাতে শিকাবী-। আব দেখছি, কাশীবাজেব আয়োজিত ধর্মসভা কাশীবাজেব মুকুট-শোভিত মাথাটি শুধু দেখা যায় বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে অক্ষত আছে তাঁব করাজ্জির ধর্মক্রমুজাটি। বোধিসত্ত্বের বামদিকে বাজমহিষী ক্ষেমাদেবীকে সনাক্ত কবা

(১) পরে ক্ষেমাধেী অত্রণাবিকা হন, অর্থাৎ যৌদ্ধ ধর্মামুসাবে সারিপুত্র, মহামেদগম্মাধন, উৎপলপর্ণী ও শেখা মমজোপীর। বুদ্ধেব অহাস্ত শিষ্ঠ-পিতা ৭ ধর্মামা পান নি।

যায় ভক্তিবসে তাঁর মুখাবয়ব আশ্রুত রানীর পদপ্রান্তে একটি নীলকমল বাজসভাব বাহিবে একটি অস্রদগু লক্ষণীয় দণ্ডে নানান জাতের আয়ুধ ঢাল, ভল্লা, খজা, চামড়ার কোমববন্ধ।



চিত্র—১৯

মভাপগ্নিত মহাবাজ লঙ্কাদান ০ মাষাদেবীকে স্বপ্নর অর্থ বুকিয়ে দিচ্ছেন।

অবস্থান—২।২গ

এব পরেই একটি বিস্তৃত প্যানেলে গৌতম বৃদ্ধের জীবনের আদিপার্শ্বের কয়েকটি অপকপ চিত্র-সম্ভাব (২।২)। এগুলি অধিকাংশই অক্ষত। উপবে প্রথম দেখছি, তুষিত স্বর্গে বোধিসত্ত্ব শেষবাব জন্মগ্রহণের পূর্বমুহুর্তে চিন্তামগ্ন (২।২ক)। তিনি ভাবছেন, কোন্ ভূ-ভাগে, কোন্ পরিবাবে তিনি শেষবাবের মত জন্মগ্রহণ কববেন। অবশেষে মনস্থিব করেন তিনি—ভূমিষ্ঠ হবেন পুণ্যভূমি ভাবতবর্ষে। কপিলাবস্ত্রব মহাবাজ গুচ্ছাদনের বংশকে ধন্য করবেন তিনি। কৃতার্থ করবেন কপিলাবস্ত্রব বাজমহিষী মাষাদেবীকে।

পরের চিত্রে দেখছি, মাষাদেবী স্বপ্ন দেখছেন শূন্যপথে এগিয়ে আসছে এক শ্বেতহস্তী, অমিতবিক্রম সে। এক দেবতুল্য স্বর্ণীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শ্বেতহস্তীব অঙ্গ

থেকে। ক্রমে সেই হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করল। স্বপ্নভঙ্গের পরে মায়াদেবী রাজা শুক্লোদনকে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের কথা শোনালেন ( ২।২খ )  
গৌতমের জন্মকাহিনী  
—কী অর্থ এ বিচিত্র স্বপ্নের ? মহারাজ সভাপণ্ডিতদের ডেকে প্রশ্ন করেন, মহারানীর এ অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের তাৎপর্য কি ?

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, মহারাজ শুক্লোদন এবং মহারানী মায়াদেবী বসে আছেন একটি রত্নসিংহাসনে ( চিত্র—১৯ )। ব্যঞ্জনিকা, ছত্রধারিণী, চামরধারিণীর দল ঘিরে আছে তাঁদের ছুজনকে। সম্মুখে একটু নিম্নাসনে একজন পণ্ডিত স্বপ্নমঙ্গলের কথা শোনাচ্ছেন। পণ্ডিতের মণ্ডকে ইন্দ্রলুপ্ত, তাঁর সম্মুখবিস্তৃত গুহ্মরাজি লক্ষণীয়। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, মহা রানীর দক্ষিণহস্তের বেড় দেহের তুলনায় ছোট। কোনও পাশ্চাত্য চিত্র-রসিকের মতে, এটি চিত্রাঙ্গনের ক্রটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি ভারতীয় চিত্রকর বহিরঙ্গের দিকে অতটা সূক্ষ্ম নজর দিতে নারাজ। স্বপ্নমঙ্গলের বৃত্তান্ত শুনে বসে রানীর মুখে কী অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে—এইটি ঙ্গাকতেই শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করেছেন। এখানেই রাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলোব সঙ্গে অজস্রা শিল্পীর প্রভেদ, এখানেই গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের তফাত। জ্যোতিষী বলেছেন—এ স্বপ্ন-দর্শনের অর্থ হল মহারানীর গর্ভে জন্ম নেবেন এক মহাপুরুষ। তিনি যদি সংসারে থাকেন, তবে হবেন ত্রিভুবনবিজয়ী রাজচক্রবর্তী, আর যদি সংসারে বীতরাগ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে তিনি হবেন জগদগুরু, বিশ্বত্রাতা মহা-অবতার! কোন একটি বিবাহিতা অপুত্রক নারী যদি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধে এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন, তবে তাঁর কী জাতীয় ভাবাবেশ হয় তাই ফুটিয়ে তুলতেই অজস্রা শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা ব্যয়িত করেছেন। নিরলস সাধনায় মায়াদেবীর মুখে তিনি সেই ভাব-ব্যঞ্জনাটি মূর্ত করতে চেয়েছেন তাঁর কাছে তখন হাতের বেড়ের মাপ ছিল তুচ্ছ, নগণ্য, এহ বাহ্য !

শিল্পী যেন মায়াদেবীর অপূর্ব চিত্রটি ঐকে তৃপ্ত হন নি। তাঁর মনে হল, রাজসভায় সর্বসমক্ষে মায়াদেবীর মুখে সেই ভাবাবেশটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি তিনি। মায়াদেবী যেন এ-কথা শুনে ছুটে চলে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর নির্জন নিভৃত কক্ষে। যেন আনন্দের অশ্রুপ্লাবনে ভেসে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। শিল্পী তাই ঠিক পরের প্যানেলেই ঐকেছেন একটি অপূর্ব চিত্র। রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে মায়াদেবী একাকী দাঁড়িয়ে আছেন একটি স্তম্ভের সম্মুখে। তাঁর বামচরণ স্তম্ভ স্পর্শ করে আছে। সজোশ্রুত স্বপ্ন-মঙ্গলের কথাই ভাবছেন তিনি, তাঁর প্রতি রোমকুপে রোমাঞ্চার শিহরণ, তাঁর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার ( চিত্র—২০ )।

পরের প্যানেলে দেখছি, শিবিকারোহণে মায়াদেবী চলেছেন পিত্রালয়ে...মাচ্ছেন লুঙ্ঘনিকাননের মাঞ্চখান দিয়ে...সঙ্গে চলেছেন মহারানীর শত সখী। কিন্তু পিত্রালয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানো সম্ভবপর হল না। পরের চিত্রে দেখছি, একটি শালবৃক্ষের



কাণ্ডে দেহভার শূন্য করে মায়াদেবী দণ্ডায়মানা... তাঁর একটি বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—যেন শালভঞ্জিকামূর্তি। তাঁর রোমাঙ্কিত তনুদেহটি ধরে সাস্তুনা দিচ্ছেন তাঁর ভগ্নী, শুক্লোদনের অপরা মহিষী মহাপ্রজাপতি বা মহাগৌতমী; আব মায়াদেবীর দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত হচ্ছেন মহাজাতক, জগৎ-ত্রাতা ভবিষ্য বৃদ্ধ ( ২।২৬ )।

চলেছে চিত্রের মিছিল—যেন চলচ্চিত্রের সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্স। পরের প্যানেলে দেখছি, স্বর্গ থেকে দেবগণ মর্ত্যে নেমে এসেছেন, ঋষিলোক থেকে সিদ্ধাচার্যের দল এসেছেন মহাজাতককে সম্মান দেখাতে। এসেছেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অসিত, দেবল। দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোড়ে দেখাছি নবজাতককে। ত্রিনয়ন ইন্দ্রকে সনাক্ত করা কঠিন নয়। তাঁর পাশেই দেখছি, প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজছত্র ধরে আতপতাগ; থেকে শিশুকে রক্ষা করছেন। পাশে চামরধারী। চিত্রে দেখছি জন্মলাভমাত্র শিশু বলছেন: অগগোহহম্ অস্মি লোকসু; বণছেন—আমিই এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ! এ-কথা বলেই শিশু সপ্তপদ অগ্রসব হয়ে যান অনায়াসে। তাঁর প্রতি চরণপাতে ফুটে উঠল এক-একটি স্থলপদ্ম ( ২।২৮ )। চিত্রে সেই সপ্তপদ্মকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। দেখাছি ত্রিনয়ন ইন্দ্র রাজছত্র ধারণ করে শিশুর পিছন পিছন অহুগমন করছেন সপ্তপদ! সম্পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে এইভাবে তথাগত বৃদ্ধের জীবনের আদিপর্ব এখানে বিধৃত। এই প্রাচীরের উপর দিকে কয়েকটি বৃদ্ধমূর্তি অঙ্কিত ( ২।৩ )।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসি অন্তবালের বাম-পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটিতে। বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে ( ২।৪ ) কয়েকটি নমণীক দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁরা সাবি বেধে বৃদ্ধদেবকে অর্পণ দান করতে চলেছেন। এ মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ পববহ্নী যুগের, তখন শিল্পের সৌকর্য নিম্নাভিমুখী। চিত্রের মূর্তিগুলি হারিয়েছে অজ্ঞতা-চিত্রের স্বাভাবিক পেলবতা, চিত্রের হর্মামালায় স্তম্ভগুলি অস্বাভাবিকভাবে সরু। মোটকথা, এ চিত্রটি মনে হল পববর্তী যুগের সংযোজন। বঙ্কিমী ভাষায় 'প্রক্ষিপ্ত'।



চিত্র—১০

গঙ্গা সপ্তদেব ভবিষ্যদ্বাণী স্তন  
ভাবাবিগ্না মাষাদেবী  
অবস্থান—২।২৬

এই কুদ্রায়তন কক্ষটির সামনে সিলিঙে (২১৫) তেইশটি হংসের একটি বিচিত্র গোলাকৃতি আলিঙ্গন-রেখা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই তেইশটি হংসের একটিও অপর কোন একটির নিছক অনুকরণ নয়। আলপনার নকশায় এটি অস্বাভাবিক নয় কি? আলপনার ধর্মই হচ্ছে একই চিত্রের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নকশার কারুকার্য গঠন করা। অথচ, এখানে প্রত্যেকটি হংসের চিত্রই মৌলিক চিত্র—কেউ কারও অনুকৃতি নয়। প্রত্যেকটি হংসের ভঙ্গি বিচিত্র, বিশিষ্ট এবং মৌলিক।

এই কক্ষটিতে আছে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির দুই মর্মর-মূর্তি (২১৬)। ঐরা দুজন জম্বল বা কুবেরের দুই অনুচর। অন্তরালের বাম ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে (২১৭) শ্রাবস্তীর সহস্র বৃক্ষের অনুকৃতি—এক-একদিকে পাঁচশতটি। মূল গর্ভগৃহে মর্মর-মূর্তিটি (২১৮) যুগদাবে পদ্মাসনে বসে বৃদ্ধদেবের। তাঁর করাঙ্গুলি এখানেও সেই ধর্মচক্রমূর্তী রচনা করেছে।

ওপাশে একটি দীর্ঘকায় বৃদ্ধমূর্তি অঙ্কিত ছিল (২১৯)। এখন শুধু মস্তক ও পদদ্বয় দেখা যায় মাত্র। তার ওপাশে গর্ভকক্ষ জম্বল ও হাবিতীর প্রস্তব-মূর্তি (২১০)। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে ঐরা যেন কুবের ও তাঁর স্ত্রীর পরিপূরক। কিছুটা প্রভেদ আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে হারিতী ছিল রাক্ষসী। কিন্তু সে শিশুদের ভালবাসে; অনেকটা আমাদের ষষ্ঠীমায়ের মত। বৃদ্ধদেবকে একবার আক্রমণ করেছিল হারিতী; কিন্তু বৃদ্ধদেবের কাছে শেষ পর্যন্ত সে নতিস্বীকার করে। তাঁর আশীর্বাদ পায়। ফলে, তার রাক্ষসী-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে শিশুদের নিয়েই মায়ের ভূমিকায় জীবনযাপন কবে। রাক্ষসীকে মাতৃ-মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন বৃদ্ধদেব। এখানে মর্মর-মূর্তিতে সেই কাহিনীটি বিদ্যুত।

দেখছি, স্বীতোদর জম্বল ও হাবিতী বসে আছে যুগ্মাসনে। হারিতীর এক হাতে স্বর্ণমূর্তীপূর্ণ মঞ্জুষা, অপর হাতে একটি শিশু। জম্বলের হাতটি ভাঙা। সে হাতে কি ছিল জানা যায় না। জম্বলের উপরে দেখছি চতুর্ভুজা রাক্ষসীর বেশে হারিতী আক্রমণ করছে বৃদ্ধদেবকে। বৃদ্ধদেব শাস্ত, অবিচলিত। পরের দৃশ্যটি হারিতীর মূর্তির উপরে খোদাই-করা। সেখানে দেখছি, হারিতী তথাগতকে প্রণাম করছে। হারিতীর ক্রোড়ে এবার দেখছি একটি শিশু। আক্রমণের সময় সে ছিল চতুর্ভুজা আয়ুধধারিণী রাক্ষসী।

### জম্বল ও হারিতী

প্রণামের সময় সে শিশুক্রোড়ে মাতৃ-মূর্তি। সিংহাসনের নীচে দশটি শিশুর মূর্তি। কোতুকপ্রদ এ শিল্প-নিদর্শনটি। দশটি শিশুমূর্তি দুই ভাগে বিভক্ত। জম্বলের পদতলে সর্বদক্ষিণে (দর্শকের দক্ষিণ) দেখছি পাঠশালার গুরুমশাই, তাঁর হাতে বেত্রদণ্ড। তাঁর সম্মুখস্থ প্রথম তিনটি শিশু পড়াশুনা করছে। তাদের পিছনে ছটি শিশু মল্লযুদ্ধ করছে। হারিতীর পদতলে পাঁচটি শিশুই ভেড়ার লড়াই নিয়ে মেতে আছে। অভিকর্ষের সূত্রের অনুকরণে আমরা বলতে পারি, শিশুদের বিজ্ঞার প্রতি মনোযোগী শিক্ষকের দৃষ্টির ব্যস্তানুপাতে নির্ভরশীল। যে যত কাছে সে তত মনোযোগী। যে যত দূরে সে ততই দূরে সরে গেছে বিজ্ঞা থেকে।

দক্ষিণেব দেওয়ালে একটি বুদ্ধ কঙ্ককীৰ চিত্র দেখতে পেলুম, ভাবব্যঞ্জনায সেই অপূৰ্ব। হতভাগা ভগ্নদূত কোন ছুঃসংবাদ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে রাজার সম্মুখে।



চিত্র—২১

জৈনিক ভগ্নদূত বা বুদ্ধ কঙ্ককী

অবস্থান—২।১১

গাইডকে প্রশ্ন করে, বই ঘেঁটে উদ্ধার করতে পারলুম না—কে সেই রাজা, কিসের এই ছুঃসংবাদ। মহাকালের অঙ্গুলিহেলনে সে রাজাও নেই, সেই ছুঃসংবাদও আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া—এমনকি ইতিহাসও ভুলে গেছে সে ঘটনা। শুধু ক্ষতচিহ্ন-লাঙ্কিত প্রাচীর-গাৱের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে অক্ষয় হয়ে আছে ভগ্নদূতের সেই অপূৰ্ব অভিব্যক্তি (চিত্র—২১)। তাব দক্ষিণহস্তেব মুদ্রা, বিবাদখিন্ন দৃষ্টি দেখে অনুমান কবা শক্ত হয় না কি জাতীয় সংবাদ বহন কবে এনেছে হতভাগ্য ভগ্নদূত (২।১১)।

এই গৃহা-মন্দিবেই রুকজাতক ও ক্ষান্তিবাদী জাতকেব ছুটি অনবদ্য চিত্র-কাহিনী ছিল বলে পড়েছি প্রামাণিক গ্রন্থে। অনেক চেষ্টা করেও তাবদেব সনাক্ত কবতে পাবলুম না। বোধ করি; কালেব কবলে সেগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু ক্ষান্তিবাদী জাতকেব একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ টিকে আছে। সেটিব কথা বলি :

সং ধৰ্মেব প্রতি বিরূপ এক ব্রাহ্মণ নরপতি একবাৱ তাব মুল্লবীশ্ৰেষ্ঠা নৰ্তকীদেব নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। উৎসব ও আমোদে ক্রান্ততম্বু মহারাজ প্রমোদ-কাননেব একান্তে নিজাভিভূত হওয়ায়, নৰ্তকীৰ দল ইচ্ছামত কাননে পরিভ্রমণ

করতে থাকে। সহসা তাবা বনেৰ একান্তে এক পীতবসনাবাী সন্ন্যাসীৰ সাক্ষাৎ পায় সন্ন্যাসী ওদেৰ দেখতে পেয়ে কাছে ডাকেন, সন্নেহে নানা কথা আলোচনা কবতে থাকেন

এই সন্ন্যাসী বস্তৃতঃ বোধিসত্ত্ব। তাঁৰ মুখ-নিঃসৃত ধৰ্মকথায় নৰ্তকীৰ দল ক্রমশঃ বিভোর হয়ে যায়। ওদেব প্রধান বাজননৰ্তকী ভাবাবেশে

একেবাৱে তন্ময় হয়ে যায়। নিজান্তে মহারাজ উঠে নৰ্তকীদেব দেখতে না পেয়ে ক্রোধাক্ষ হয়ে পড়েন। সন্দান কবতে করতে তিনি আসেন সন্ন্যাসীৰ নিকটে। মহাবাজ বোধিসত্ত্বকে তরবারি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করতে থাকেন। ক্ষান্তিবাদী বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ কবেন না। সমস্ত আঘাত অবিচলভাবে গ্রহণ করেন। এতে রাজননৰ্তকী আবও অঁভিভূত হয়ে পড়ে। তাই দেখে মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বধ করতে যান নটীকে। রাজনটী তাঁৰ চরণে লুটিয়ে পড়ে।

কাহিনীর সমস্তটাই অবলুপ্ত, শুধু টিকে আছে একটি খণ্ডচিত্র (২।১২)। দেখছি একটি রাজদববা। সিংহাসনে বসে আছেন একজন রাজা, তাঁর দক্ষিণহস্তে কোষমুক্ত তববারি। বিহ্বলা বাজনর্তকী লুটিয়ে পড়েছে তাঁর চরণমূলে। পার্শ্ববর্তী নর্তকী দুহাতে নিজের মুখ ঢেকেছে। অপর একজন পলায়নে উদ্গত। ক্রোধোদ্ভূত বলদর্পী মহাবাজের ভঙ্গিটিও লক্ষণীয় (চিত্র—২২)।



চিত্র - ২২

শাস্তিবাদী জাতক- অপরোধিনী বাজনর্তকীকে শাস্তিদান উদ্গত রাজা  
অবস্থান ২।১০

বাজাব চরণপ্রান্তে প্রণতা বাজনর্তকীর এ প্রণামেব ভঙ্গিটি আমাদের কাছে সুপরিচিত, কিন্তু এই বহুল-ব্যবহৃত নকশা-চিত্রটির গল টুংস কী তা ত্রয়তো জানভূম না সামবা।

ছবিটি দেখে মনে মনে হাস চিত্রটির কিছুটা অশ আছে, কিছুটা নিশ্চয় হয়ে গেছে মহাকালের নির্দেশে। মনে মনে বলি, হে মহান শিল্পী, তুমি এমন একটি খণ্ডমূর্ত্তের পরিকল্পনা করবছিলে, যার পবনুহর্ত্তেই ঐ হতভাগিনী বাজনর্তকীর শিবশ্ছেদ হওয়াব কথা। অন্ততঃ হাজাব বছর পূর্বে তাই তুমি ভেবেছিলে। স্মিনি না আজ অমর্ত্তালোকেব কোন অন্তরাল থেকে তুমি তোমাব এই অনবগ চিত্রপটি দেখতে পাচ্ছ কি না। পেলে তুমি নিশ্চয় আমাবই মত হাসছ তোমাব প্রিয় বাজনর্তকীর মস্তক আজ হাজাব বছবেও দেহহ্যাত হব নি। অস্পষ্ট হয়ে এলেও তাব ঘন-নিবদ্ধ পুষ্পস্তবক-স্নানিত কববীর আভাস আজও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অথচ যে উদ্গত নৃপতি ওব শিবশ্ছেদ করবাব জন্ত

তরবারি উত্তোলন করেছিলেন তিনি নিজেই আজ ছিন্নশিব! খসে পড়েছে পলেশ্রাবার ঐটুকু অংশ!

মহাকাল তোমাকে প্রণাম। ধন্য তোমাব সৃষ্টি রসবোধ! মহারাজেব মুণ্ডপাত কবাব পবেও কৌতুক কবে জিইয়ে বেখেছ তাব কোষমুক্ত নিশ্ফলা তববারিটিকে।

কিন্তু তাই তো দেখতে পাই ছুনিয়ায়! গবাক্ষ পল্লিউন্ পিলাভ-এর বিচাবসভাব খুলিকণাও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ টিকে থাকে দুর্শ্ববিদ্ধ নগ্নকায় মাগুঘটির বাণী! হিটলাবেব বিপুল পান্ৎসাব বাহিনী ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়, অথচ ঝড়বঞ্জায় হারিয়ে যায় না অ্যানি ফ্রাঙ্কেব দিনলিপিব একটি পাতাও!

দ্বিতীয় গুহা-মন্দিবে উত্তর দিকেব প্রাচীবে দুটি বৃহদায়তন প্যানেলে দুটি জাতক-কাহিনী বিচিত্রিত। সে দুটি হচ্ছে পূর্ণ-অবদান জাতক ( ১১১৫ ) এবং বধুব পশুন্তের কাহিনী ( ১১১৬ )।

পূর্ণ-অবদানেব জাতক-বর্ণিত কাহিনীটি আগে বাস :

সূর্য্যাবক জনপদে একজন বণিকের পুত্র ছিলেন পূর্ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন দাসীপুত্র। পিতাব দেহাবসানেব পব পূর্ণ জানতে পাবলেন পিতা তাকে এব তাব জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাবিলকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেলেন। এজন্য মহামতি পূর্ণেব মনে কোন ক্ষোভ নেই। অগাণ্ড ঠাকুরেব প্রতি কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষ পূর্ণ গবদান জাঃ। ছিল না তার। তিনি নিজ চেষ্টায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ কবলেন। পব পব ছয়বার তিনি সমুদ্রযাত্রা কবলেন এব দেশ-বিদেশ থেকে বহু সম্পদ আহরণ কবে আনেন। ক্রমে পূর্ণ হয়ে পড়েন একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ বণিক। ভগবাব বাণিজ্যে সফলকাম হওয়ায় পূর্ণ অবসব নিতে চাইলেন, কিন্তু ঠাকুরীয-বন্ধুদেব একান্ত অন্তবোধে শেষ পর্যন্ত সপ্তমবার তিনি বাণিজ্যযাত্রা কবলেন।

সেবার সমুদ্রযাত্রায় শ্রাবস্তীব বধিকজন নাবিককে তিনি নিজ নৌকায় নিয়েছিলেন। পূর্ণ লক্ষ্য কবলেন, প্রতিদিন এই নাবিকেব দল একত্র হয়ে একটি অপূর্ব সঙ্গীত গায়। সে সঙ্গীতের প্রভাব স্নদুবপ্রসাবী পূর্ণেব হৃদয়ে তা অননুভূত ভাবেব সঞ্চাব কবে—তাঁব মন-প্রাণ যেন ভবে যাব। শেষে একদিন তিনি নাবিকদেব ডেকে জানতে চাইলেন—এই স্বর্গীয় সঙ্গীতটি তাবা কোথায় শিখেছে।

উত্তবে বিনয়াবনত নাবিকবা বলে : প্রভু, এ কোন সঙ্গীত নয়—এ প্রার্থনা-গাথা। এ মন্ত্রধ্বনি। এ মন্ত্র আমবা শিখেছি এক মহাপুরুষেব কাছে।

পূর্ণ প্রশ্ন কবলেন : কে সেই মহাপুরুষ ?

—কে তা জানি না। শুনোছি তিনি ছিলেন বাজপুত্র। এখন সন্ন্যাসী।

—কোথায় গেলে তাঁব দেখা পাওয়া যায় ?

—এখনও তিনি শ্রাবস্তীতেই আছেন।

পূর্ণ মনে মনে ভাবে ইতিপূর্বে ছয়বার বাণিজ্যযাত্রায় সে প্রভূত ধনসম্পদ আহরণ

করে এনেছে; কিন্তু কই তাতে তো তার মনের তন্ত্রীতে এ ধরনের অমুরণন হয় নি। সে ভাবে এই অপূর্ব সঙ্গীত-গাথার যে মূল উৎস তার সঙ্গেই প্রথমে এক হাত বাণিজ্যের লেন-দেন করে নিলে কেমন হয় ?

শ্রাবস্তীতে এসে পূর্ণ এক নূতন আলোকের সন্ধান পেল। পীতবসনধারী দেব-ছল্লভকাস্তি দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীর রাজপথে ভিক্ষা করতে দেখে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। মহাভিক্ষু আশীর্বাদ করলেন ঐকে।

পূর্ণ শুনল, ইনি যুগাবতার --নাম গৌতম বুদ্ধ।

সংসারে আর মন নেই পূর্ণের। পার্থিব ধনসম্পদ সব তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সে য পরশমণির সন্ধান পেয়েছে -মণিকে ছাড়া মণি-জ্ঞান করে না। ওর দাদা ভাবিল এসে বলে— তোর কি হয়েছে বল তো ?

পূর্ণ হেসে বলে -সে তুমি বুঝবে না দাদা। তবে আমার যা-কিছু বিষয়-সম্পদ আছে, তা দান করে আমি সজ্জ্ব যোগদান করতে চাই।

: তোর এত এত বিষয়-সম্পত্তি সব দান করে যাবি ?

: না ঠিক দান নয়, ভাবছি এ-সবের বিনিময়ে একটি চন্দনকাঠের চৈতা-বিহার নির্মাণ করাব। তারপর তাঁকে নিয়ে আসব সেখানে।

ভাবিল ছোট ভাইয়েব হাত ছুটি ধরে বলে--সন্ন্যাসীই চন্দনকাঠে কী প্রয়োজন ভাই ? আমার দিকে চেয়ে দেখ বরং। পিতৃধনে বঞ্চিত হয়েছি—তুইও ত্যাগ করে যাচ্ছিস্ -

বাধা দিয়ে পূর্ণ বলে নাও দাদা, তুমিই নাও এ-সব। আমি ববং ভিক্ষা করেই আমার শেষ মনোবাসনা পূরণ করব -

ভাবিল মনে মনে হাসে। ভাবে, তাব ভাই পূর্ণের একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জম্বুদ্বীপে তখন চন্দনকাঠের প্রচণ্ড অভাব, তাব বিক্রয়-মূল্য বর্ধিত হয়ে গেছে শতগুণ! ভিক্ষালব্ধ ধনে পূর্ণ সেই চন্দনকাঠের সজ্জারাম নির্মাণ করতে চায়! পাগল আর কাকে বলে !

পূর্ণের যা-কিছু সম্পদ তা গ্রহণ করে ভাবিল। বাণিজ্য-সস্তারে সপ্ত-মধুকর-ডিঙা সাজিয়ে প্রস্তুত হয় সমুদ্রযাত্রায়। মুণ্ডিতশীর্ষ পীতবসনধারী পূর্ণ অগ্রজকে প্রণাম করে বিদায় নেয়—সে যেতে চায় এক নির্জন দ্বীপে। সেখানে শ্রোণপরন্তক নামে নরমাংসভুক্ এক হিংস্র জাতির বাস। পূর্ণের অভিজ্ঞতা, সে ঐ হিংস্র জাতির মধ্যে প্রচার করবে অহিংসার বাণী, সং ধর্মের অমুশাসন !

ভাবিল বলে : ভাই, আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না ?

পূর্ণ বলে : হবে না কেন ? যেদিন প্রয়োজন বুঝবে আমাকে স্মরণ করবে ! আমি আহ্বানমাত্র উপস্থিত হব তোমার কাছে।

ভাবিল অস্বাভ মনে মনে বলে : একেবারে বন্ধ উদ্ভাদ !

দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে থাকে ভাবিল। ক্রমশঃ তার সপ্তডিঙা পরিপূর্ণ হয়ে যায় মণি-মুক্তা, লাক্ষা ও গন্ধ দ্রব্যে। সমস্ত বাণিজ্য-সম্পদ নিয়ে সে অবশেষে আসে চন্দনদ্বীপে। ভাবিল জানে, এই চন্দনদ্বীপে বাস করে ছুঁদাস্ত যক্ষ মহেশ্বর—একখণ্ড চন্দনকাঠও সে দ্বীপের বাইরে যেতে দেয়, না। তাই আজ জন্মদ্বীপে চন্দনকাঠের এই কৃত্রিম অভাব। ভাবিল সংবাদ পেয়েছে, যক্ষ মহেশ্বর চন্দনদ্বীপে অনুপস্থিত। সেই সুযোগে সে সমস্ত বাণিজ্য-সম্ভারের বিনিময়ে তার সপ্তডিঙা পূর্ণ করে উৎকৃষ্ট চন্দনকাঠের সম্ভারে। মহেশ্বর দ্বীপে ফিরে আসার আগেই যাত্রা করে স্বদেশে।

দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রার পব নাবিকের দল খুশী হয়ে ওঠে। সপ্তডিঙার পালে যে লেগেছে ঘবে-ফেরার-হাওয়া।

বাণিজ্যতরী যখন দ্বীপ ছেড়ে মধ্যসমুদ্রে, তখন হঠাৎ ওঠে ছরস্তু সমুদ্র-ঝটিকা। প্রচণ্ডভাবে তুলতে থাকে সপ্তডিঙা।

প্রধান নাবিক ছুটে এসে বলে—প্রভু সর্বনাশ হয়েছে! যক্ষ মহেশ্বর সংবাদ পেয়ে গেছে! তাবই আক্রোশে এ অকাল ঝটিকা।

দক্ষ নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকা বক্ষা করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে! ঝড়ের বেগ যেন ক্রমবধমান, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি বাণিজ্য তরীগুলিকে ক্রমাগত নীচের দিকে টানছে। নাবিকের দল ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

নিকপায় ভাবিল তখন যুক্তকরে প্রার্থনা করতে থাকে, বলে—পূর্ণ, তুমি বলেছিলে আমার বিপদের সময় আমাকে রক্ষা করবে। আজ আমি একান্তমনে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে বিপদমুক্ত কর, ছুঁদাস্ত যক্ষ মহেশ্বরকে বধ কবে ত্রাণ কব আমাকে!

কিন্তু সে প্রার্থনায় কোন ফল হয় না। নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী। ভাবিল পুনরায় বলে: হে পূর্ণ, আমি জানি তুমি মহাপুরুষের আশীর্বাদে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী। তুমি এসে রক্ষা কর আমাদের। আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এভাবে ধ্বংস হতে দিও না!

কিন্তু তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না!

সহসা ভাবিলের মনে পড়ে যায় পূর্বকথা। বলে: হে পূর্ণ, তোমার অভিল্লাষ পরিপূরণ করব আমি। প্রতিশ্রুতি করছি, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তবে এই সমুদ্র চন্দনকাঠ দিয়ে আমি তথাগত বুদ্ধের জন্ম একটি অপরূপ সজ্জারাম নির্মাণ করে দেব!

আশ্চর্য! তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না। তিল তিল করে নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী।

তখন চতুর্থবার চীৎকার করে ওঠে ভাবিল: নিষ্ঠুর! তোর কি একটুও দয়া নেই? আমি কিছুই চাই না, শুধু আমার সহকর্মী নাবিকদের শ্রাণরক্ষা করতে চাই। এতগুলি নিরপরাধ প্রাণীর কি সলিল-সমাধি হবে ভাই?

উচ্চারণমাত্র নৌকায় আবির্ভূত হন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গীতবনন, মুণ্ডিতশীর্ষ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। ভাবিল সবিস্ময়ে দেখে, অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যপথে উড়ে



চিত্র --২৩

উপবে : ( বামে ও মধ্যভাগে ) পূর্ণ ও ভাবিল বুদ্ধদেবকে অর্থাদান কবতে চলেছে ,  
( সর্বদক্ষিণ ) বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইতে ধর্মপ্রচারে বত ।

নীচে : ( সর্ববামে ) পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ কবছে ,  
( মধ্যভাগে ) ভাবিলের বাণিজ্যতরী ,  
( দক্ষিণে ) আকাশপথে পূর্ণের আগমন ,  
( সর্বনিম্নে ) বন্ধ মহেশ্বরের অলুচর মৎস্যকল্যাণয় ।

অবস্থান—২।১৩

এসেছেন মহাভিক্ষু পূর্ণ। পূর্ণের আবির্ভাবমাত্র শাস্ত হয়ে যায় সমুদ্র-ঝটিকা, পরাভূত বন্ধ সহ কবতে পাবে না সে সন্ন্যাসীর অমিত পুণ্যপ্রভাব। পলায়ন কবে সে।

আনন্দাশ্রম-বিগলিত ভাবিল আলিঙ্গন কবে পূর্ণকে। বলে : ভাই, এত বিলম্ব করলে কেন? আমি যে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

পূর্ণ বলে : ভুল বলছ দাদা। আমি আহ্বানমাত্র এসেছি।

ভাবিল বলে : কী বলছ ভাই! তোমাকে আমি চারবার ডেকেছি।



হেসে পূর্ণ বলে : না। একবার মাত্র। তুমি চারবার আমাকে স্মরণ করেছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ কেন ডেকেছিলে। প্রথমবার তুমি ডেকেছিলে যক্ষ মহেশ্বরকে বধ করবার জন্তু ; কিন্তু দাদা, হননেচ্ছা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। দ্বিতীয়বার ডেকেছিলে তোমার সর্মস্ত জীবনের সম্পদ রক্ষার জন্তু ; কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পত্তি রক্ষা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। তৃতীয়বার ডেকে বলেছিলে এ উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে প্রতিদান দিতে চাও ; কিন্তু দান-প্রতিদানের নিরিখে তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র রচিত হতে পারে না। ভেবে দেখ, শেষবার তুমি আমাকে ডেকেছিলে জীবে দয়া প্রদর্শনের জন্তু ; অহিংসার মন্ত্রে সে প্রার্থনা-ধ্বনি অন্তর স্পর্শ করেছে আমার। আমি আহ্বানমাত্র ছুটে এসেছি তোমার পাশে।

ভাবিল ভাইকে আলিঙ্গন কবে বলে—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি ভাই ! কিন্তু আর ভুল করব না। আমিও যোগ দেব ঐ ব্রতে। শরণ নেব বৃদ্ধের, ধর্মের এবং সম্বের।

পূর্ণ বলে—আর তোমার এই চন্দনকাঠের বিপুল সম্ভার ?

: ও দিয়ে নির্মাণ করব আমরা দুই ভাইয়ে মিলে এক অপরূপ সজ্জারাম। না না, কোন প্রতিদান চাই না আমি। আমি চাই, এই চন্দনকাঠ ধ্বংস হোক সেই তথাগত বৃদ্ধের সেবায়।

দুই ভাইয়ে মিলে অবশেষে রচনা করে একটি অপরূপ চৈত্য-বিহার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে তথাগত বৃদ্ধ স্বয়ং এসেছিলেন সেই অপরূপ সজ্জারামে !

জাতকানুসারে মূল কাহিনী এইটুকুই। দ্বিতীয় গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে ( ২।১৩ ) অজন্তার শিল্পী এই কাহিনীটি অবলম্বন করে যে প্রাচীর-চিত্র ঐক্যেছেন, এবার তার কথা বলি। কথা-সাহিত্যের খাতিরে মূল কাহিনীকে কিছুটা ঢেলে সাজিয়েছি আমি—ইচ্ছামত সংলাপ সংযোজন করেছি, যেমন—জাতকের মূল কাহিনীতে ভাবিল চারবার প্রার্থনা করেছিল এমন কোন উল্লেখ নেই ; সেটি আমার কল্পনা। অজন্তার শিল্পীও শিল্পের খাতিরে কাহিনীকে নিজ ইচ্ছানুসারে সাজিয়েছেন ( চিত্র—২৩ )।

প্যানেলের নীচে বামদিকে দেখছি, শ্রাবস্তীনগরে এসেছেন পূর্ণ ( ২।১৩ ক )। তথাগত বৃদ্ধের সম্মুখে তিনি প্রণামরত ! পীতবসন সন্ন্যাসী একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ণের মস্তকের উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। ছুটি আলোখোই মস্তকের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

তার দক্ষিণ দেখছি, সমুদ্রের মাঝখানে ভাবিলের বাণিজ্যতরী ( ২।১৩ খ )। চৈনিক শিল্প-পদ্ধতি জল ঝাঁক হয়েছিল। নৌকার উপর পাল তোলা ; তাতে তিনটি দাঁড়। নৌকার গলুইয়ে বারোটি জলপূর্ণ পাত্র—অর্থাৎ এ সমুদ্রযাত্রা ; পানীয় জল তাই সুরক্ষিত। নৌকা চন্দনকাঠে বোঝাই। তলদেশে জলজন্তুর আক্রমণ করেছে। ছুটি উৎকীর্ণবাহু মংস্রকণ্ঠা—সম্ভবত যক্ষ মহেশ্বরের অনুচর। এদের উৎকীর্ণ মনুষ্যাকৃতি,

নিয়ন্ত্রণ মীন। এ দুজনের উৎক্লিষ্ট বাহু দুটিব ভঙ্গিমা লক্ষণীয়—সে বাহুর বেথায় সমুদ্র-তরঙ্গের লীলায়িত ছন্দ। নৌকাটি মকবমুখী মধুভিঙা। দেখতে পাচ্ছি নৌকার উপর যুক্তকবে ভাবিল প্রার্থনা করছে। তার চোখে আর্তি। আরও দেখতে পাচ্ছি শূণ্যপথে উড়ে আসছেন একজন দেবদূত—ভাবিলেব রক্ষাকর্তা। দেবদূতের উপর আকাশপথে নেমে আসছেন অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী মহাভিক্ষু পূর্ণ। এই আলোখ্যাটিতেও পূর্ণের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে ( ২।১৩ গ )।

এই সমুদ্রযাত্রা দৃশ্যটির উপরে এক বিস্তারিত প্যানেল। সেটি পববর্তী ঘটনাব স্তোভক উদ্ধারপ্রাপ্ত ভাবিল পূর্ণকে নিয়ে শ্রাবস্তীনগবে এসেছে তথাগত বুদ্ধকে অর্ঘ্যদান করতে। বামদিকে একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে দুটি বমণী, তৃতীয় একটি কামিনী সোপানের নিকটবর্তী। তাব হাতে অর্ঘ্য-খালিকা, তার চাহনি বঙ্কিম চটল। পাঁচটি সোপান অতিক্রম কবে আসতে হবে সভামণ্ডপে। এই সোপানের উপর আরও একটি মেয়ে। পিছন ফিবে সে কিছু দেখছে। মণ্ডপেব মাঝামাঝি পূর্ণ ও ভাবিল। ভাবিল তাব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে—এ অপরিচিত স্থানে কিভাবে সহবত বন্ধা করতে হয় তা ভাইয়ের কাছ থেকে সে জেনে নিতে চায়। পূর্ণের আকৃতি কিছু বড়। এই প্যানেলে পূর্ণের আলোখ্যই মূল আকর্ষণ। অজস্রাব শিল্পী অনেক স্থলে প্রতিভা ও মহানুভবতা আদ্যোপ কবতে বিশেষ কোন মূর্তিকে পার্শ্ববর্তী মূর্তিগুলিব তুলনায় বড় করে ঐকেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম গুহায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিব মূর্তি, কিংবা সপ্তদশ মন্দিবেব বিখ্যাত ‘গোপা ও রাজল’ চিত্রে বুদ্ধদেব ( চিত্র—৬৭ )। কিন্তু এ কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা নয। কাবণ অজস্রাব শিল্পী জানেন, ত্রি-মাসিক বাস্তব দৃশ্যকে দ্বি-মাত্রিক আলোখে রূপায়িত কবাব মূল সূত্র হচ্ছে কাছের জিনিস বড় দেখাব। দূবেব জিনিস ছোট। তাই এই চিত্রেব সর্বদক্ষিণে যখন তিনি তথাগত বুদ্ধকে ঐকেছেন, তখন তাঁকে আকাবে বৃহৎ কবেন নি। প্রতিভায় ও মহানুভবতায় বুদ্ধদেব পূর্ণের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু যেহেতু তিনি দূবে আছেন তাই তাঁকে বৃহদায়তন কবে ঐকা সম্ভব হয় নি। বিকল্প ব্যবস্থায় শিল্পী সেখানে আলোকপাতেব পবিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধমূর্তিটি তাই সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। উজ্জলতা যেন আয়তনের পবিপূবক হয়ে উঠেছে। বাস্তবে বঙিন চিত্রটি দেখলে, এ সত্য অনুধাবন কবতে পাববেন।

মণ্ডপেব যেখানে ভাবিল ও পূর্ণকে ঐকা হয়েছ সেখানে দেখছি, ওদেব দুজনকে ঘিরে চারজন দাসী চলেছে অর্ঘ্য-খালিকা বহন কবে। পিছনে একটি নহবংখানা। তাতে তিন কক্ষ—তিন কক্ষে তিন বমণীমূর্তি। একজন বাজাচ্ছে খঞ্জনি, একজন মাদল, তৃতীয় জন কি বাজাচ্ছে তা জানবাব উপায় নেই। সে চিত্রটি অক্ষত নেই। নহবংখানাব পাশে দেখছি আর একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে পুনরায় দুটি নাবীমূর্তি। একজন সূসজ্জিতা, মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘবেব মহিলা, সঙ্গে তাঁব সহচরী। ঐরাও পূজা নিবেদন করতে আসছেন।

সর্বদক্ষিণে একটি গর্ভগৃহে বৃদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সর্বসমেত নয়জন ভক্ত। সাতজন পুরুষ, দুটি রমণী। স্ত্রীলোক দুজন বসেছেন শালীনতা রক্ষা করে কিছু তফাতে।

তার পরের চিত্রে দেখাচ্ছি (চিত্র—১৩-এর অন্তর্ভুক্ত নয়) চন্দন-বিহারে বৃদ্ধদেব আসছেন। তিনি আসছেন শূণ্যপথে দুই শিষ্যসমেত। দেখছি একটি ধাতব পাত্র নিয়ে পূর্ণ এসেছে তাঁর চরণ ধৌত করতে। পূর্ণের পশ্চাতে চারজন পুরকামিনী। পশ্চাৎপটে দেখতে পাচ্ছি চন্দন-বিহার।

অজস্রার শিল্পী চিত্র-কাহিনীর যবনিকা টেনেছেন পূর্ণের অভিলাষ পূরণে। চন্দন-বিহারে বৃদ্ধদেবের আগমনে।

পূর্ণ-অবদানের উপবে আঁকা আছে এক বিস্তারিত কাহিনী-চিত্র। পুণ্যক ও ইরান্দাতীর উপাখ্যান। এটি বস্তুত বিধুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী (২।১৪)।

পাতালপুরীর অতল গভীবে বাসুকি-পরিশাসিত নাগলোকে রাজকণ্ঠা ইরান্দাতীর মনে নেমেছে শ্রাবণ রাত্রির ঘনাক্ষয়। নাগরাজ্যে বিলাস-বাসন, আমোদ-প্রমোদের কোন বিরাম নেই। রাজপ্রাসাদের রত্নমণিদীপিত নৃত্যসভা, রাজোত্তান-সংলগ্ন ফটিক-স্বচ্ছ পদ্মশোভিত সরোবর, মুক্তাখচিত স্বর্ণখট্টাঙ্গে আল্পেষষয্যা, বিধুর পণ্ডিত জাতক

রাজকুমারীর বিলাসের উপকরণের অভাব নেই কোন। তবু এ প্রাচুর্যের মধোও রাজকণ্ঠার মনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। মর্ত্যলোকের এক নির্বাসিতা মাল্লুসীকে পৌঁছে দিয়ে গেছে কণ্ঠকী রাজকণ্ঠার কাছে,—সে বর্তমানে তাঁর পরিচাবিকা প্রিয় সখী মাতলী। রাজনন্দিনীর চিন্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে সে তাঁকে শুনিয়েছে পৃথিবীর কাহিনী। আর তাই শুনে মনোবিলাস হয়েছে বাসুকি-তনয়া ইবান্দাতীর।

স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ শুক-সারীকে দেখেন আব তাঁর মনে পড়ে যায় মাতলীব বর্ণনা—মুক্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের সম্ভরণের কথা!

নাগকণ্ঠা প্রশ্ন করেন—মুক্ত নীলাকাশ কাকে বলে মালতী?

নির্বাসিতা মাল্লুসী হেসে বলে—কেমন করে তোমাকে বোঝাব রাজকণ্ঠা? মনে কর, এই পাতালপুরীর স্ববর্ণ-চন্দ্রাতপ নেই—সেখানে কেবল দূর—শুধুই দূর—সীমাহীন ব্যাপ্তি!

রাজকণ্ঠা অবাক হয়ে বলেন—তা কি কখনও হয়?

মাতলী বলে—হয় বইকি নাগকণ্ঠা, আর সেই নীলাকাশে অন্ধকারেব যবনিকা সরিয়ে ধরণীর বৃকে যখন উঠে আসেন সূর্যদেব, তখন বালার্করঞ্জিমরাগে লঙ্কারূপ হয়ে ওঠে পার্থিব প্রভাত! আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের উজ্জল আলোকে পৃথিবী যখন সাজে, তখন তার দিকে তাকানো যায় না। মণিদীপ্ত নাগলোকের কৃত্রিম আলোকের সঙ্গে সে উজ্জলতার তুলনাই হয় না। আবার দিনান্তে অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত সূক্ষ্ম মুহূর্তের যে স্বপ্না, তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি—না বাজকণ্ঠা, এ নাগলোকের স্বর্ণপুরীতে তেমন কিছু আজও দেখি নি।

নাগরাজ-হুহিতার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি জানেন যুক্ত পৃথিবীতে কোনদিনই পদার্পণ করতে পারবেন না তিনি। নাগকণ্ঠার অধিকার নেই এই পাতালপুরীর বাহিরে যাবার। এ অতলান্ত নাগলোকের গভীরে জন্মলাভ করেছেন একদিন, এখানেই শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আর একদিন। সে-কথা স্মরণ করে ম্লান হয়ে যান রাজকণ্ঠা।

মাতলী বলে, তুমি যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছ রাজনন্দিনী!

বিশ্মিতা ইরান্দাতী বলে : কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলা কাকে বলে সখী ?

মাতলী হাসে, বলে, তাও জান না নাগকণ্ঠা ? উপরের পৃথিবীতে পূর্ণচন্দ্র যে প্রতিদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, ক্ষয়িত হতে থাকে তার আকার ও জ্যোতি।

ভীতা রাজকণ্ঠা বলে, কী সর্বনাশ, এভাবে যে শেষ হয়ে যাবে সে একদিন!

—তাই তো যায়, অমাবস্তায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যায় সে।

—তারপর ?

—তারপর আবার শুক্রপক্ষে তিল তিল করে সে বাড়তে থাকে। দিন দিন উজ্জলতর হয়ে এগিয়ে যায় পূর্ণিমা রাত্রির সার্থকতার দিকে।

করতালি দিয়ে হেসে ওঠেন কিশোরী নাগকণ্ঠা, বলে—কী মজা! ওখানকার রাত্রিগুলো তাহলে এ কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত নাগরাজ্যের রাত্রির মতো স্থির-জ্যোতি নয় ?

—মোটাই নয়। পৃথিবীতে হাসির পাশেই আছে অশ্রু, আনন্দের পাশেই বেদনা। আলো আর অন্ধকার, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা সেখানে মিতালি পাতায়। তোমাদের এ নাগলোকের মত শুধু হাসি, শুধু আমোদ, আর শুধু আলো দিয়ে ঠাসা নয়।

ইরান্দাতী বলে, আমি চাই না এ নাগলোকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! আমিও কাঁদতে চাই।

মাতলী শিহরিত হয়, বলে—চুপ চুপ। এ-কথা মহারাজের কর্ণগোচর হলেই সর্বনাশ!

কিন্তু অশ্রুর ধর্মই হচ্ছে সে যখন আসে আষাঢ় সঘন ঐশ্বর্যরাত্রির মত সমস্ত আকাশ আবৃত করে আসে। মহারানীর মহলে ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন বাসুকি-মহিষী বিমলা তাঁর প্রিয়সখীকে। বলছিলেন,—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, অথচ এদেশে যে কাঁদবারও আইন নেই।

প্রিয়সখী প্রত্যুত্তর করে না। সে জানে মহারানীর অপূরণীয় মনোবাসনার কথাটি। জানে, কেন অভিমান-স্কন্ধা মহারানী অরুজল ত্যাগ করেছেন। সে আর এক কাহিনী!

নাগরাজ বাসুকি গিয়েছিলেন মর্ত্যলোকে কুরুনৃপতির আমন্ত্রণে, তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এক ধর্ম মহাসভায়। কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষ মহাপণ্ডিত বিধুর। বসন্ত তিনি ছিলেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কুরুরাজকে তিনি শুধু ঐহিক পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না—প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি মহারাজকে শোনাতেন সং ধর্মের

মর্মকথা। তিনি ছিলেন সমস্ত আর্থাবর্তের সর্বজন-মমস্ত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামতি। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতের স্মৃতি ছিল সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুবিদিত—ভূ-ভারতের দূরতম প্রান্ত থেকে প্রতিদিন দলে দলে মুমুকু যাত্রীর দল সমবেত হত ইন্দ্রপ্রস্থে—বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মর্মকথা শুনতে। গিয়েছিলেন নাগরাজ বাসুকিও, মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর মর্ম-ব্যাখ্যায়। এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, নিজ কণ্ঠের ইন্দ্রনীল মণিহার খুলে জড়িয়ে দিয়েছিলেন বিধুর পণ্ডিতের উষ্ণীষে।

নাগপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে মহারানী বিমলার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন বিধুর পণ্ডিতের কথা। ভুল করেছিলেন সেখানেই। সব কথা শুনে মহারানী আবদার করেন—তিনি স্বকর্ণে বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মর্মের মর্মকথা শুনতে চান। মহারাজ কত বৃথিয়েছেন, সে অসম্ভব। নাগকন্যা হিসাবে বিমলার পক্ষে নাগলোকের বাহিরে পদার্পণ করা সম্ভবপর নয়, ওদিকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ নিশ্চয় সন্মত হবেন না একটি দিবসের জ্ঞাত মহামতি বিধুর পণ্ডিতকে চাক্ষুর আড়াল করতে।

শুনে প্রমোদকক্ষ তাগ করে উঠে যান বানী। শয়নকক্ষের অর্গলবন্ধ একান্তে সহচরীকে ডেকে বলেন—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

প্রাসাদ-কাননেব এক নিভৃত প্রান্তে সপ্তপর্ণীর শাখায় রাজকুমারী ইবান্দাতীর একটি প্রিয় প্রেঙ্খা প্রলম্বিত ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজনন্দিনী এই দোলনায় এসে বসে, কাটিয়ে যায় নিঃসঙ্গ কয়েকটি সন্ধ্যা মুহূর্ত। সেদিনও গোধূলি লগ্নে যথারীতি উত্থানের এই নির্জন প্রান্তে এসে প্রেঙ্খার উপর বসেছে রাজপুত্রী। কর্ণে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃষ্ণকজ্জলী, কালাগুরু-ধূপিত অলকগুচ্ছে বনকুমুমের মালিকা—প্রসাধনদক্ষা মাতঙ্গীর রূপসজ্জায় ক্রটি নেই, রাজকন্যা ইবান্দাতী উত্থানভূমিকে আলোকিত করে প্রেঙ্খায় দোলায়িত করছিল নিজ অনিন্দ্য কস্তুরহুটি।

শুধু দেহে নয়, ওর অন্তরেও যে আজ দোলা লেগেছে। সরোবর-নীরে মৃৎস্পন্দিত যৌবনভারনম্র নিজ দেহের প্রতিবিম্বটি দেখে আজ হঠাৎ এক বেদনা অমুভব করেছে রাজকন্যা। জীবনে এই প্রথম এভাবে ভাবতে শুরু করেছে সে। মাতঙ্গী বলে—এ উর্ধ্বলোকের পৃথিবীতে হাসি অশ্রুর সন্ধানে ছোট্টে, আনন্দ বেদনার অন্বেষণে ফেরে, আলোক অন্ধকাবের অভিসারে ধাবমান! অভাব ভিন্ন পূর্ণতার উপলব্ধি নেই! কিন্তু কেন? শুধু হাসি, শুধু আনন্দ, শুধু আলোক কেন একাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না? দোসর ছাড়া কি ছনিয়ায় কেউ তৃপ্ত নয়? আর সে দোসর কি হতে হবে বিপরীতধর্মী? হাসি যেমন আলোককে পেয়ে পূর্ণ হয় না, সে অশ্রুকে খোঁজে—আলোক যেমন হাসির মিতালিতে তৃপ্ত হয় না, সে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে মরে। আজ কি রাজকন্যা নিজেও তেমনি কোন দোসর খুঁজছেন? সরোবর-সলিলে তাঁর বিকচযৌবন প্রতিবিম্ব কি সে কথাই তাঁর কানে কানে বলে গেল? এমন একজন দোসর, যে ওঁর শত সহচরীর মত সমধর্মী নয়, অশ্রু কিছু? বিপরীতধর্মী? কিন্তু কী তা?

যনপ্রাস্তরের দিকে কজ্জললাঙ্ঘিত ছুটি নয়ন তুলে রাজনন্দিনী সহসা প্রত্যক্ষ করেন তাঁর মনোগত প্রশ্নের মূর্তিমান উত্তর। স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। নবোদিত প্রভাতসূর্যের মত দীপ্তিমান এক তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন যুবাণুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন নিঃশব্দে। তরুণবীথিকার অন্তরালে অনিমেঘ লোচনে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন।

ধীরপদে প্রেঙ্খা থেকে নেমে এসে দাঁড়ায় ইরান্নাতী।

মহুর চরণে তরুণবীথি থেকে এগিয়ে আসে তরুণ, বলে—আমি যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক। এ পথে আমার এই পক্ষিরাজ অশ্বের পিঠে যাচ্ছিলাম মর্ত্যলোকে, তোমাকে দোল খেতে দেখে নেমে এলাম।

রাজনন্দিনী সভয়ে ধীরে ধীরে বলে—কেন, দোল খাওয়া কি দোষের ?

অনাজ্ঞাতার এ সরল প্রশ্নে হেসে ওঠে পুণ্যক। রাজকন্যা আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পুণ্যক বলে—নিশ্চয় দোষের। দোল খাওয়া নয়, একা একা দোল খাওয়া। দেখ না, কুমুদিনী দোলায়িত হয় যখন আকাশে ওঠে পূর্ণচন্দ্র, পঙ্কজকানন আনন্দের হিন্দোলে মাতে যখন দিনকর উদিত হন পূর্ব গগনে ?

সরলা বালিকা এর নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না; বলে—কেমন করে জানব ? চন্দ্র-সূর্য তো এদেশে নেই। এ যে পাতালপুরী !

পুণ্যক বলে, দেখতে চাও পৃথিবীকে, চন্দ্রসূর্য-উদ্ভাসিত দেশকে ?

সাংগ্রহে ইরান্নাতী বলে—নিয়ে যাবে আমাকে তোমার পক্ষিরাজে ?

পুণ্যক বলে—যাব, কিন্তু তোমার পিতার অল্পমতি ভিন্ন তুমি তো যেতে পারবে না !

ইরান্নাতী বলে—কেন ?

—তোমার গাত্র স্পর্শ করি কোন্ অধিকারে ?

—কেন স্পর্শ করলে কি হয় ?

পুণ্যক বুঝতে পারে এ সরলা বালিকা কিছুই জানে না, বলে—কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার জন্ত এত আগ্রহ কেন তোমার ?

রাজকন্যা অবাক হয়ে বলে—আগ্রহ হবে না ? সে যে একেবারে অজানা নূতন দেশ ?

—কিন্তু আরও একটি অজানা মহাদেশ যে তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তার সংবাদ কি তুমি পেয়েছ পাতালপুরীর নাগকন্যা ? এ নাগলোকের রাজ্যসীমা অতিক্রম করার জন্ত তুমি উদ্গ্রীব, কিন্তু সন্ধান রাখ কি কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে যৌবরাজ্যে পদাৰ্পণের শুভলগ্ন আজ এসেছে তোমার ?

সরলমতি অনভিজ্ঞা কুমারী কন্যা ও প্রশ্নের অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। মুগনয়ন ছুটি পুণ্যকের মুখে সংস্থাপিত করে অক্ষুটে বলে, তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না যক্ষ সেনাপতি।

আর আশ্ব-সংবরণ করতে পারে না পুণ্যক। ছুই আঙ্কানুলম্বিত বাহুতে বন্দী করে কেলে উদ্ভিন্নবোঁবনা শ্রুতমুকা ইরান্দাতীর কল্পতরু। ওর কম্পমান বিহ্বল বিহাধরে এঁকে দেয় তার একান্ত প্রণয়ের রক্তিম স্বাক্ষর।

শিহরিততনু ইরান্দাতী তার পদ্মকোরকতুল্য ছুটি হাতে আরও করে লঙ্কারণ মুখপঙ্কজ। সে বুঝতে পেরেছে সেই উদ্ভ্রান্ত গোধূলিলগ্নে কিসের তৃণায় উন্নয়ন হয়ে ছিল এতক্ষণ। কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে সে দেখতে পেয়েছে যৌবরাজ্য-সীমান্ন নূতন মহাদেশ। দ্রুতপদে অমৃহিতা হয় সচকিতা রাজনন্দিনী—রাজোচ্চানের পাষণ-বেদীতে প্রতিহত হয়ে ফেরে পলায়নপরার নূপুর নিকণ।

নাগরাজ বাসুকি বিনিদ্রনয়নে ত্রিয়ামা রাগি একা বসে থাকেন। অস্তিমান-ক্ষুধা মহারানী বিমলা বাক্যলাপ বন্ধ করেছেন—অন্যদিকে আরও গুরুতর বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে নাগরাজ্যে। অমিতবিক্রম যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক এসে নাগরাজ বাসুকির কাছে প্রস্তাব করেছে, সে রাজকন্যা ইরান্দাতীর পাণিপ্রার্থী। নাগরাজ স্থিরনিশ্চয় জানেন, এ বিবাহ অসম্ভব। নাগকন্যার সঙ্গে নাগরাজপুত্রের বিবাহই বিধেয়। যক্ষের পক্ষে নাগকন্যা লাভ কিছুতেই সামাজিক অনুমোদন পাবে না। নাগপণ্ডিতরা মেনে নেবেন না এই অসবর্ণ বিবাহকে।

সমস্যা সমাধানের কোন সূত্রই যখন দেখতে পাচ্ছেন না মহারাজ, তখন তাঁর একান্ত-সচীব ওঁর কানে কানে বলে—আমার পরামর্শ শুমন মহারাজ। আমি আপনীর সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি যক্ষ সেনাপতিকে বন—কন্যা সম্প্রদানে আপনীর সম্মত, কিন্তু তাকে উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে হবে।

—কি সে কন্যাপণ ?

—ইন্দ্রপ্রস্থরাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে বিধুর পণ্ডিতের ছয় পণ্ডটিকে।

—তাতে কি লাভ ?

—যক্ষ সেনাপতিকে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নাগ ও যক্ষে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাবে কুরুরাজের। তৃতীয় পক্ষ নাগলোক থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে।

—কিন্তু সেক্ষেত্রে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকেই অপহরণ করে আনতে বাঁচ না কেন ? তাঁর হৃৎপিণ্ডের কথা উঠছে কি কারণে ?

মন্ত্রী হেসে বলে—এ কুট রাজনীতি মহারাজ। যক্ষ সেনাপতির পক্ষে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকে নাগলোকে আনয়ন অসম্ভব নাও হতে পারে। যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক কুরুরাজ কিছুদিনের জন্ত বিধুরকে এ নাগলোকে পাঠাতে সম্মত হলেও হতে পারেন। কিন্তু যক্ষ যখন বিধুরের হৃৎপিণ্ডটি প্রার্থনা করবে, তখন যুদ্ধ হয়ে পড়বে অনিবার্য।

• নাগরাজ বলেন—যথ তোমার কুটবুদ্ধি নাগমন্ত্রী।

মন্ত্রী হুঃখ প্রকাশ করে বলেন—তবু তো মহারানী এখনও আমাকে সেই প্রাকৃত নামেই সম্বোধন করে থাকেন।

হাস্ত সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে নাগরাজের পক্ষে। তিনি জানেন, তাঁর এই কুটিল মন্ত্রীটি বিধূর পণ্ডিতকে ঈর্ষা করে, আর তাই মহারানী বিধূর পণ্ডিতের অনুকরণে এই পণ্ডিতমণ্ড কুচক্রী নাগমন্ত্রীর নামকরণ করেছেন—বাহুড় পণ্ডিত!

যক্ষ সেনাপতি প্রতিশ্রুত হল এ কন্যাপণ প্রদানে। শ্বেত পক্ষিরাজে আরোহণ করে সে যাত্রা করে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে। ঈর্ষাকাতর নাগমন্ত্রীর উল্লাস আর ধরে না। এইবার বিধূর পণ্ডিত কেমন করে আত্ম-রক্ষা করে সে দেখবে একবার।

কিন্তু বাহুড় পণ্ডিতের আশা ফলবতী হল না মোটেই। পুণ্যক জানে, কুকেরাজ অক্ষত্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত। সে একটি মহামূলা ইন্দ্রকান্দমণি সংগ্রহ করে উপস্থিত হল কুকেরাজসভায়। এই অমূল্য মণিখণ্ডটিকে পণ রেখে সে কুকেরাজকে অক্ষত্রীড়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। একে অক্ষত্রীড়ায় আসক্তি, তদুপরি ইন্দ্রকান্দমণির লোভ। ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি সম্মত হলেন; কিন্তু তিনি কী পণ রাখবেন? পুণ্যক বলে, এই মহামূল্যমণির একমাত্র উপমান হতে পারেন বিধূর পণ্ডিত। কুকেরাজ বলেন, তথাস্ত।

অক্ষত্রীড়ায় পরাজিত হলেন কুকেরাজ। নিকপায় হয়ে তাঁকে বিদায় দিতে হল বিধূর পণ্ডিতকে। শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল গুণমুগ্ধ কুকেরাজবাসী। সেখানে পুণ্যক বিধূর পণ্ডিতকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। আকাশে উঠল পক্ষিরাজ, কিন্তু অনতিবিলম্বে এক নির্জন প্রান্তরে পুণ্যক অশ্বের গতিবেগ সংবরণ করে। বিধূর পণ্ডিত বলেন, আমরা কি নাগরাজের সীমানা উপনীত হয়েছি যক্ষ সেনাপতি?

পুণ্যক বলে, না, কিন্তু আপনি আপনার জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর। নাগরাজ বাসুকির কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আপনার হৃৎপিণ্ডটি উৎপাটিত করে নিয়ে গেলে তবে তিনি তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করবেন আমার হাতে।

তরবারি নিক্ষেপিত করে পুণ্যক বলে—মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হন মহামন্ত্রী।

মহামন্ত্রী হেসে বলেন, জীবনে ঐ একটি জিনিসের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই পুণ্যক। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত সকলের কাছে মৃত্যু একই বেশে আসে।

পুণ্যক বলে, এভাবে আপনাকে হত্যা করছি বলে আপনি কি আমাকে অভিশাপ দেবেন?

বিধূর হেসে বলেন? অভিশাপ কেন দেব পুণ্যক? আমার হৃৎপিণ্ডে যদি ছুটি তরুণ-তরুণীর মিলনের অন্তরায় ঘুচে যায়, তাহলে আমার প্রাণদান তো সার্থক।

পুণ্যক অবাক হয়ে যায়। এ ধরনের কথা তো সে কখনও শোনে নি। তরবারি উত্তোলন করতে যায়, পারে না। মনের মধ্যে দ্বিধা এসেছে তার।

বিধূর বলেন, তরবারি আমার হস্তে অর্পণ কর যক্ষ সেনাপতি। আমি স্বহস্তে আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করে দিচ্ছি। তাহলে নরহত্যার পাপ তোমার লাগবে না।



একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে পুণ্যক। বলে—কিন্তু তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন? জগুদ্বীপে আপনিই সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত। যত্নের পূর্বে আমার এক প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে যান আপনি।

—কি তোমার প্রশ্ন? বল।

—নাগকন্যা ইরান্দাতীকে আমি হৃদয় সমর্পণ করেছি, কিন্তু আমি যক্ষ—নাগ নই। এ অসবর্ণ বিবাহ কি অনুমোদনযোগ্য?

বিধুর হেসে বলেন: এ প্রশ্নের জবাব তো এককথায় হবে না। তোমার যে প্রিয়-মিলনে বিলম্ব হয়ে যাবে যক্ষপ্রবর!

পুণ্যক বসে পড়ে ভূ-শয্যায়, বলে, হোক বিলম্ব, আপনি বলুন।

বিধুর পণ্ডিত তখন বলতে থাকেন তাঁর কথা।

• অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে যক্ষ সেনাপতি। নাগরাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে বিশ্ব-বিজ্ঞাত বিধুর পণ্ডিতকে। সংবাদ পেয়ে নাগলোকের যাবতীয় নরনারী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত।

বিধুর পণ্ডিতের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন নাগরাজ।

সহসা বাহুড় পণ্ডিত বলে ওঠে, কিন্তু এমন কথা তো ছিল না যক্ষ সেনাপতি। আপনি বিধুর পণ্ডিতকে সশরীরে এখানে এনেছেন কেন? শর্ত ছিল—

কিন্তু তার বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। ততক্ষণে রাজাস্তঃপুর থেকে এসে পৌঁচেছেন রাজমহিষী বিমলা, সম্মানিত মহান অতিথির জন্তু স্বহস্তে পাড়-অর্ধা নিয়ে। তাঁর পশ্চাতে সলঙ্কচরণে এসে দাঁড়িয়েছে। চত্রাঙ্গিতবৎ রাজকন্যা ইরান্দাতী। মুগ্ধনয়নে পুণ্যক তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাগরাজার কানে কানে মহারানী বলেন: বাহুড় পণ্ডিত এখানে কেন?

সে অল্পচ কণ্ঠে শ্রবণগোচর হয় লগকর্ণ বাহুড় পণ্ডিতের। স্থানতাগ করে সে অধোবদনে।

রাজা ও রানী মহান অতিথিকে নিয়ে বাস্তু। রাজপ্রাসাদের প্রহরীর দল ক্রমাগত ছুটাছুটি করছে। এমন সুযোগ হারাতে রাজী নয় পুণ্যক। সে গোপনে প্রবেশ করে অন্তঃপুরে। রাজকন্যার নিভৃত শয়ন-কক্ষে এসে দাঁড়ায়।

সচকিতা রাজকন্যা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। পুণ্যকের সন্নিকটে এসে বলে: কেমন করে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন আপনি?

পুণ্যক বলে, প্রেমের মন্ত্রে তুমি যে আমাকে অজ্ঞেয় করে দিয়েছ বাসুকি-তনয়া।

তবু উৎফুল্ল হতে পারে না ইরান্দাতী। আতপ-তাপিত কুমুদিনীর মত ম্লানমুখী কিশোরী বলে, কিন্তু সে প্রেম যে শেষ পর্যন্ত নিফল্য হয়ে গেল যক্ষ সেনাপতি।

—নিফল্য! কেন?

•—আপনি শোনেন নি, মহারাজের সভাপণ্ডিত কি বিধান দিয়েছেন?

পুণ্যক হেসে বলে—নাগরাজ্যের বাহুড় পণ্ডিতের বিধান নিশ্চয়োজন ইরান্দাতী ।  
ত্রিভুবনে আজ যিনি সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত, তাঁর বিধান নিয়েই আমি তোমার দ্বারে এসে  
দাঁড়িয়েছি বাসুকি-তনয়া ।

—কে সেই পণ্ডিত ?

—এখনও বোঝ নি ? স্বয়ং বিধুর পণ্ডিত ।

—কি বলেছেন তিনি ?

—তিনি বলেছেন, সামাজিক বিধান অমোঘ । কিন্তু সমাজ সৃষ্টি করেছে জীব ,  
সেই জীবের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিধান আরও অমোঘ । তিনিই সৃষ্টি করেছেন  
পুরুষ ও প্রকৃতি—সৃজনের মহানন্দে বিভোর তিনিই সঞ্চারিত করেছেন তাদের অন্তরে  
অমুরাগের অমৃত ! তাকে অমর্যাদা করাই পাপ । সামাজিক বিধানের অজুহাতে যারা  
সেই স্বর্গীয় প্রেমকে হত্যা করে, তারাই প্রকৃত পাপী ।

আনন্দের আতিশয্যে নাগকন্যা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না । তাঁর  
ভীকু কপোতকম্পিত মুখ আশ্রয় খোঁজে যক্ষ সেনাপতির কবাটবক্ষে ।

জাতক-বর্ণিত এই মূল কাহিনীটিকে অজস্র শিল্পী রূপায়িত করেছেন একটি  
দীর্ঘায়ত চিত্র-কাহিনীতে ( ২।১৭ ) । কাহিনী কালানুক্রমিকভাবে সাজালে যে দৃশ্যগুলি  
পর পর আসা উচিত, চিত্র-কাহিনী কিন্তু সেভাবে সাজানো নয় । ফলে, যে দর্শক মূল  
কাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ চিত্র দেখে তাঁর পক্ষে মন-গড়া একটি কাহিনী গঠন করে  
নেওয়া শক্ত । শিল্পী কেন এভাবে কোন কোন চিত্র-কাহিনী সাজিয়েছেন জানি না—  
চিত্র-নাট্যের ব্যাকরণ নিয়ে না হয় আমরা এর পর আলোচনা করব । আপাততঃ যা  
দেখছি তাই বলি :

বাঁদিকের উপরে দেখছি ইন্দ্রপ্রস্তরাজ ধনঞ্জয়ের সভায় এসেছে পুণ্যক ( ২।১৪ক ) ।  
কুকরাজ সিংহাসনে আসীন—সিংহাসনে দাগ-কাটা নকুশা । বাজার দক্ষিণে দর্পণহস্তে  
কুকমহিষী । ধর্মপ্রাণা নাগরানী বিমলার মুমুকু চরিত্রটি ভবিষ্যতে ফুটে তুলতে হবে  
মনে করেই কি শিল্পী কুকমহারানীর হাতে এই প্রদানধনের প্রতীক দর্পণটি দিয়েছেন ?  
তাঁর কি বক্তব্য এই যে, যার ঘরে বিধুর পণ্ডিত সমপস্থিত তিনি রাজসভাতেও নিয়ে  
আসেন প্রমোদ-কক্ষের প্রদান সামগ্রী,—আর যার ঘরে তিনি নেই তিনি প্রমোদ-কক্ষেও  
নিয়ে আসেন ধর্মসভার উপকরণ, জপমালা ? রাজার সম্মুখে পুণ্যক, সে বিনয়বনত,  
তার হাতে ইন্দ্রকান্তমণি, সেটি সে স্নুকৌশলে প্রদর্শন করছে কুকরাজকে । রাজার পার্শ্বে  
হুজ্জন অমাত্য । পিছনে হুজ্জন বাজিনিকা । অমাত্যের মধ্যে একজন অস্থমনস্ক, অপরজন  
চিস্তিত । রাজা দক্ষিণকরে যে মুদ্রাটি রচনা করেছেন সেটি ‘হুই’-সংখ্যার দ্ব্যতক ।  
চিত্র যদি নির্বাক না হয়ে সবাক্ চলচ্চিত্র হত, তাহলে আমরা স লাপ শুনতে পেতাম—  
‘হে যক্ষ সেনাপতি, রাজহুত্র এবং ক্ষত্রিয় পৌকষ এই দুটি ছাড়া যে-কোন পাণ্ডি-  
অপাণ্ডি সম্পদ আমি পণ রাখতে রাজী !’

পরের প্যানেলে দেখছি পাশা খেলা হচ্ছে ( ২।১৭খ )। অক্ষকীড়ার ছকুট কিছু আসনের উপর শায়িত নয়, যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে—যেন উপর-থেকে-দেখা পাশার ছকের প্ল্যান আঁকা হয়েছে। এটিকে পাশ্চাত্য চিত্র-ব্যাকরণের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেডি বলে মনে হতে পারে। বস্তুত তা নয়; কেন নয় সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এই চিত্রে দেখছি রাজা হেরে যাচ্ছেন। রানী তাকিয়ে আছেন পুণ্যকের দিকে, যেন মিনতি করে কিছু বলছেন তাকে। রাজার পাশে দুজন অমাত্য। তাদের মুখ অক্ষত নেই, তাদের ভাবব্যঞ্জনা বোঝা যায় না।

ঐ চিত্রের নিচে দেখছি কুকরানী দাসীকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে দেখছি মহারাজ ধনঞ্জয় বিধুর পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপনরত। যেন তিনি পরাজিত হবার পর বিধুর পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ চাইছেন, এখন কি কর্তব্য, আর পণ্ডিত বলছেন, শর্ত অনুযায়ী বিধুর এখন পুণ্যকের ক্রীতদাস। তাঁকে যেতে হবে।\*

পরের চিত্রটি দেখে বুঝতে পারি মহারানী দাসীকে কী নির্দেশ দিবেছিলেন। তিনি তাকে ণদেশ করেছিলেন—বিধুর পণ্ডিতকে রানীর মহলে আহ্বান জানাতে। এ চিত্রে দেখছি, রানীর মহলের কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে বিধুর পণ্ডিত আসীন, আর পুরকামিনীর দল তাঁকে ঘিরে আছে যুক্তকরে। এই চিত্রে বিধুরের আলোখাটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ছবিটি দেখে বোঝা যায়, কীভাবে তাঁর মনুষ্যাকৃতিতে শিল্পী দেবভাব আরোপ করেছেন। প্রতিভাদীপ্ত মহামতি বিধুরের এই আলোখাটি সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ খণ্ডাংশ।

এই ছটি খণ্ডচিত্রের নিচে একটি বিশালায়তন প্যানেলে দেখছি ( ২।১৭গ ), কুকরাজ্যের ভক্ত প্রজাবন্দ বিধুর ও পুণ্যককে শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। এই প্যানেলটির কম্পোজিসন লক্ষণীয়। শক্তিপূর্ণ মহামতি বিধুর—দ্বিতীয় হস্তিতে পুণ্যক স্বয়ং তাঁর পাশে।

চল্লিশ বছর পূর্বে শিল্পী মুকুল দে এই প্যানেল-এর বর্ণনায় বলেছিলেনঃ\*

জানদিকের প্রাচীরে এ গুহাব অল্পতম কোঁতুললোদীপক চিত্রসম্ভার। শোভাযাত্রা করে একজন বাক্য ( বিধুর পণ্ডিত ) চলেছেন রাজপথ দিয়ে হস্তিপৃষ্ঠে। তাঁর মস্তকে রাজচক্র ( বস্তুতঃ সম্মান-ছত্র ) এবং হস্তে অক্ষয়ী...পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হস্তিতে অপর একজন সম্মানীয় অমাত্য ( বস্তুতঃ পুণ্যক )। ...সম্মুখ পাচটি অখাবোহী, তাদের দৃষ্টি বাজার দিকে ফেবানো ( বিদায়কামী বিধুরের দিকে )। ...তৎসং চতুর্দশ সংখ্যক পদাতিক। এদের মধ্যে এগাবোজন সৈনিক বলে মনে হয়, তাদের হস্তে নয় রূপাণ ও ঢালিকা। ...দুজন বংশীবাদক এবং একজন ঢোলকও চলেছে শোভাযাত্রার সঙ্গে।

তখনও জাতক-কাহিনীর সঙ্গে চিত্রটির সম্পর্ক ছিল অনাবিকৃত।

এর পরের প্যানেলটি নাগরাজ্যে ( ২।১৪ঘ )। নাগরাজসভায় বিধুর পণ্ডিত নাগরাজ বাসুকিকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। নাগরাজার মস্তকে পঞ্চনাগের কুণা, যুক্তকর মুমুকুর

(১) My Pilgrimage to Ajanta & Bagh—Mukul Dey, London, 1925.

অভিব্যক্তি। বিধুর বসেছেন একটি চারণায়তে,—নাগরাজ ভূমিতলে আসনে উপবিষ্ট। অন্দরমহল থেকে অঙ্গুর হয়ে আসছেন নাগরানী বিমলা ও নাগকণ্ঠা ইরান্দাতী। সকলের দৃষ্টিই বিধুর পশুভের দিকে নিবন্ধ। একমাত্র ব্যতিক্রম চিত্রের সর্ববামে যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক—তার দৃষ্টি সর্বদক্ষিণের উত্তিম্বোবনা একটি নারীমূর্তির দিকে দৃঢ়নিবন্ধ।

পরের চিত্রে নাগরাজ ( পঞ্চনাগ কণায়ুক্ত ) অমাত্যদের নিয়ে জল্পনা করছেন এ ক্ষেত্রে কি করণীয়। সম্মুখে নাগ অমাত্যরা উপবিষ্ট। অমাত্যদের পদমর্ষাদা তাঁদের কণার সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। দুইকণা-বিশিষ্ট অমাত্য বসেছেন কুশাসনে, এককণা-বিশিষ্ট ভূমিতলে। রাজার দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে ইরান্দাতী ও বিমলা। সম্মুখে পুণ্যক।

পরের একটি খণ্ডচিত্রে দেখতে পাচ্ছি একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ। তাতে নিভৃত আলাপে মগ্ন একটি পুরুষ ও একজন রমণী। ইয়াজদানী বলেছেন, এঁরা দুজন বিধুর ও বিমলা। বিধুর নিভৃতে নাগরানীকে ধর্মের মূল কথা শোনাচ্ছেন; যুক্তির সপক্ষে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে পুরুষ-চিত্রটির হস্তে পদ্মফুল। এটি অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির ছোটক। পদ্ম ইঙ্গিত করছে পুরুষ-চিত্রটি বোধিসত্ত্বের।

হতে পারে। কিন্তু আমি তো বিশেষজ্ঞ নই, আমি শিল্প-রসিক—আমার মনে হল এ মিলনাস্তক নাটকের শেষ দৃশ্যে গবাক্ষপথে দেখা এই নিভৃত আলাপনরত যুগল মূর্তিটি নায়ক ও নায়িকার। পুণ্যক ও ইরান্দাতীর। পদ্মফুল? তাতে কি শুধু বোধিসত্ত্বেরই একচেটিয়া অধিকার? অনুরাগরঞ্জিত পুণ্যকের পক্ষে ইরান্দাতীকে পুষ্প উপহার দেবার প্রয়াস কি এতই অসম্ভব?

সর্বশেষে দেখছি একটি দোলনা। ইরান্দাতী দোল খাচ্ছে ( চিত্র—২৪ )। দোলনায় আবদ্ধ বস্ত্রখণ্ড হাওয়ায় উড়ছে। তার সামনে ষেত অশ্বের সম্মুখে যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক এবং তার কাছে পুনরায় ইরান্দাতী। স্ত্রীড়াবনতা নভুমুখী বালিকামূর্তি। দোলনায়-বসা নাগকণ্ঠার মস্তকে মনে হয় যেন সাপের কণা, আসলে সেটি হাওয়ায়-ওড়া বস্ত্রখণ্ড মাত্র। এ ঘটনাটি কাহিনী-চিত্রের সর্বপ্রথমে আসা উচিত ছিল। বোধ করি মিলনদৃশ্যের পরে শিল্পী পূর্বকথন গুনিয়েছেন। অর্থাৎ, আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় যেন “ফ্ল্যাশ-ব্যাক”।

প্রথম ছটি গুহা-মন্দির দেখা শেষ করে অজন্তা-গুহাচিত্র সম্বন্ধে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছি। অজন্তা মন্দির দর্শনের আগে এবার অজন্তা-চিত্রের জাত ও শিল্পরীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

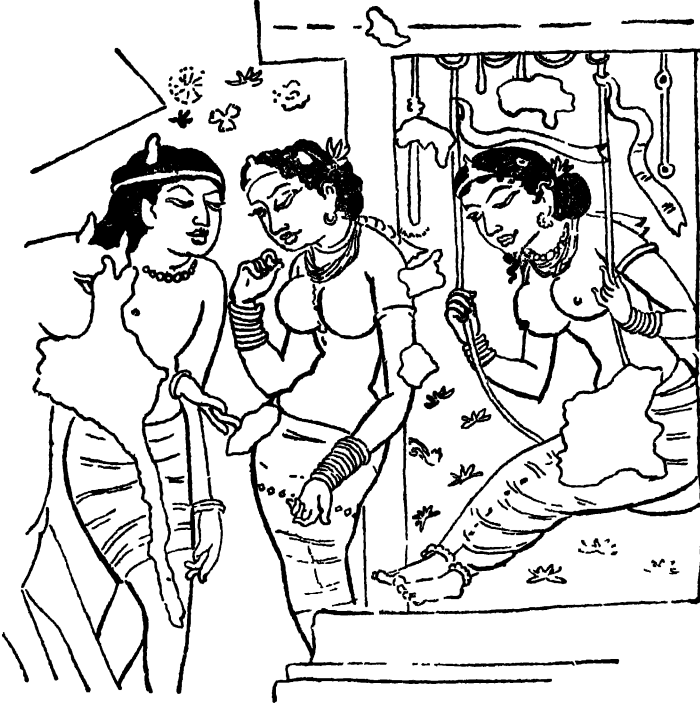
অজন্তা-চিত্রকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ, সমাপিকা বা একক-চিত্র; দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্র এবং তৃতীয়তঃ, নকশা। সমাপিকা-

সমাপিকা-চিত্র,  
কাহিনী-চিত্র  
ও নকশা

চিত্র আমি সেগুলিকেই বলতে চেয়েছি, যেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ—যারা একটি বিশেষ মুহূর্তকে শাস্বত করে ধরে রেখেছে। যেমন—সপ্তদশ গুহায় বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুল, অথবা প্রথম গুহায় মার ও বুদ্ধদেব,

কিংবা ষোড়শ গুহায় প্রসাধনরতা নারীত্রয়ের আলেখ্য; এগুলির বক্তব্য একটি খণ্ড-

মুহূর্তে সীমিত। দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্রগুলি। সেগুলি অধিকাংশই জাতক অবলম্বনে রচিত, অথবা স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবনের নানান ঘটনার অনুসারী। এই চিত্রগুলি একক-চিত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাতে সময়ের বিস্তার আছে,—পরবর্তী চিত্রে দর্শককে এগিয়ে দেওয়ার কাজে এরা যেন রীলে-রেসের, অগ্ন্যুত্তম প্রতিযোগী। এই জাতের চিত্রগুলিকে বিচার করতে হলে সম্পূর্ণ কাহিনী-চিত্রটির সামগ্রিক কলশ্রুতিকেও তোল করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নকশা। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কোন আলোচনাই করি নি; কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভায় গানের যে স্থান, অজন্তার মহিমায় এই নকশাগুলিরও সেই মর্যাদা।



চিত্র—২৪

ইবান্দাতী ও পুণ্যক।

অনবত্ত গীতি-কবিতা, অপূর্ব উপস্থাস-ছোটগল্প-নাটক অথবা অচিন্ত্যপূর্ব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন যেমন সম্পূর্ণ হয় না রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে, তেমনি অতুলনীয় একক-চিত্র, মর্মস্পর্শী কাহিনী-চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সম্বন্ধেও অজন্তার কথা শেষ হবে না এই অপূর্ব নকশাগুলির কথা আলোচনা না করা পর্যন্ত।

একে একে আলোচনা করা যাক।

চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলিতে, বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ

গৃহায়, প্রবেশ করলে প্রথম কয়েক মিনিট দর্শক রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। চারিদিকের দেওয়াল যেন ছবিতে মোড়া। কোথাও একটু ঝাঁক নেই, যেন ভীড় করে আছে তারা। কোথায় কোন দর্শনীয় চিত্র আছে, কী তাদের বক্তব্য, কোথায় তার শুরু ও শেষ যেন বোঝাই যায় না। তারপর আঁধারে চোখ একটু সয়ে এলে, মন একটু শান্ত স্বাস্থ্য হলে একে একে দেখা যায় যে, চিত্রগুলি মোটেই এলোমেলোভাবে সাজানো নয়—তাদের একটি ছন্দ আছে। অসংখ্য জনপদ, অট্টালিকা, শোভাযাত্রা, রাজসভা, পশু-পাখী, গাছ-পালার ভিতর থেকে এক-একটি গ্রুপ ফুটে বের হয়। বোঝা যায়, এক-একটি অংশে এক-একটি কাহিনী-চিত্র শুরু ও শেষ হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে দর্শক যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়েন, তাই মাঝে মাঝে একক-চিত্রে অথবা নকশা দিয়ে ছুটি কাহিনীর মাঝখানে বিরাম বা ছেদ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেন ছুটি একাক্ষ নাটিকা অভিনয়ের বিরতিকালে কিছুটা বাণীহীন সুরের আলাপ।

সমাপিকা বা একক চিত্রের রীতি, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞাসের (কম্পোজিশন) সঙ্গে কাহিনী-চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। একক-চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রতিসাম্যমূলক। অর্থাৎ, কেন্দ্রস্থলের কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তিতে শিল্পী সমাধিক গুরুত্ব

সমাপিকা বা  
একক চিত্র

আরোপ করেন এবং তার দু-পাশে উপরে ও নিচে ফিগার বা বস্তু-নিচয় এমনভাবে সাজাতে থাকেন, যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যাতে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রাভিমুখী হয়। পুকুরের জলে ঢিল ফলে যেমন সেই কেন্দ্র-বিন্দু ব চতুর্দিকে সমতা রক্ষা করে তরঙ্গ-ভঙ্গিমা ব্রহ্মকারে ছড়িয়ে পড়ে, কোন কোন চিত্রে সেইভাবে ফিগার-গুলি চারপাশে সাজানো। যেমন বুদ্ধ ও মার (১১০) যেমন সারীপুত্রের পরীক্ষা (১৭২) অথবা স্বর্গে বুদ্ধদেব (১১২ক)। এ তিনটি উদাহরণেই এবং এ জাতীয় চিত্রের প্রায় সবত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সামনে-ফেরা। স্বর্গে বুদ্ধদেবের চিত্রে তো শিল্পী যার্মিনী বাঘের কাঠেব পুতুলের মত একেবারে সামনে-ফেরা। এতে স্বতঃই কেন্দ্র-বিন্দুটি প্রতিসাম্য রক্ষা করে। শিল্পী তখন দু-পাশে, উপরে ও নিচে, অসংখ্য ফিগার-গুলি সাজাতে থাকেন। দু পাশে যে সম-সংখ্যক ফিগার থাকবে এমন কোন বাঁধা আইন নেই। সংখ্যার বাটাত রঙের গাঢ়তা দিয়ে, ভেজলা দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছেন কে নাবশেষে। এই নিয়মের বাতিগ্রহণ করে আবার নতুন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন কোথাও বা। যেমন ধরা থাক, বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুল চিত্রটি (১৭১৬)। এটিও প্রতিসাম্যমূলক চিত্র। কিন্তু কেন্দ্র-বিন্দু কি? কেন্দ্র-বিন্দু এক্ষেত্রে শূন্য। বুদ্ধদেবের বাম কনুইয়েব উপর দিয়ে টানা একটি কল্পিত ভার্টিকাল রেখার দু-পাশে চিত্রটি প্রতিসাম্য রক্ষা করেছে। বিশালায়তন বুদ্ধদেবের দেহের তুলনায় গোপা ও রাহুল অত্যন্ত নগণ্য। শিল্পী এভাবে ছোট-বড় করে আকতে বাধ্য হয়েছেন বুদ্ধদেবের চরিত্রে মহত্ব ও বিরাটত্ব আরোপ করতে। তাই ভারসাম্য রক্ষা করতে শিল্পী গোপার পিছনে একটি বিশাল তোরণ-দ্বার একে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। ঘোর রঙের

প্রলেপ দিয়েছেন গোপা ও রাহুলকে আঁকতে। ম্যাস ও রড নিয়ে যদি তোল করেন, দেখবেন ঐ কল্পিত সরলরেখার ছুঁদিকের পাল্লাই সমান ওজনের।

এবার কাহিনী-চিত্রগুলির বিচার বা কম্পোজিশনের প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে একটি গ্রুপ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—তাল কাজ হচ্ছে দর্শককে বিশেষ একটি ঘটনার কথা জানিয়ে দেওয়া এবং পববর্তী ঘটনার দিকে তাকে ঠিকমত চালিত করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, কোথায় যে ঐ খণ্ডচিত্রের ঘটনাটি শেষ হল তাও দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া। ফলে, এখানে যতিচিহ্ন—

কাহিনী-চিত্রের  
ব্যাকরণ

কমা, সেমি-কোলন, ছেদ ও স্ফায়ায়ৈব বিভাগ বা পাঞ্জয়েসন-মার্কগুলি দর্শকের জানা থাকা চাই। কথা-সাহিত্যে আমবা পবিচ্ছেদ টেনে, অধ্যায়েব মাধ্যয় সংখ্যা লিখে কাহিনীটিকে কালানুক্রমিকভাবে ভাগ করে থাকি। নাটকে পটক্ষেপণেব ব্যবস্থা থাকে, চলচ্চিত্রে ফেড-আউট, ফেড-ঈন কবে স্ফবা ডিসল্ভ-কাট-ওয়াইপেব মাধ্যমে দর্শককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনা হয়। অজস্তাব শিল্পীকেও তেমনি কতকগুলি যতিচিহ্নেব আবিষ্কাব করতে হয়েছে। চিত্র থেকে চিত্রান্তরে যাবাব মাঝখানেব ফাঁকে কোথাও বসিয়েছেন তোরণ-দ্বার, কোথাও বৃক্ষ, কোথাও বা অট্টালিকাব একটি অলিন্দ। বেণ অল্পভব কথা যায়, একটি যতিচিহ্ন পাব হয়ে এলাম। বিশ্বাস্তব জাতক-কাহিনীতে ( ১৭১৬ ) অথবা নন্দেব ধর্মান্তর-গ্রহণে ( ১৬৩ ) এই যতিচিহ্নগুলি প্রায়শই স্তম্ভ। পূর্ণ-অবদান জাতকে ( ২১১৩ ) ভাবিলেব নৌকা বক্ষা ও ছুই ভাইয়েব শ্রাবস্তী আগমনেব মাঝখানেে সময়েব ব্যবধান বোঝাতে শিল্পী ছুটি সমান্তরাল বেখা টানতে বাধ্য হয়েছেন ( চিত্র-১৭ )। এছাড়া, প্রথম যুগ থেকেই আব একটি অভিনব যতিচিহ্নেব ব্যবহাৰ কবেছেন তাঁরা। সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ফিগরেব মুখ-ফেবানোব ভঙ্গি। শিল্পী দেখলেন, চিত্র থেকে চিত্রান্তরেব সংক্রমণেব পথে কোন স্থল বস্তু না বেখেও শুধুমাত্র ফিগবগুলিব মুখ এদিক থেকে ওদিকে ঘুবিয়ে দৃশ্যান্তব বোঝানো সম্ভব হচ্ছে।

একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপাবটা বোঝানো সহজ হবে। ধবা যাক, মহাজনক জাতকেব প্রথম অংশটি। চিত্র—৮-এ আমরা যে অংশটি দেখেছি, তাব পববর্তী অংশেব সঙ্গে সংযুক্তি এবাব দেখানো হল চিত্র—১৫-এ। চিত্রে দেখুন, ছুটি কালনিক বৃত্তেব মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ কিভাবে সন্নিবেশিত। প্রথম ছুটি বৃত্তেব পবে একটি তোরণ-দ্বার—এটি প্রথম অঙ্কেব যবনিকা। প্রথম ছুটি বৃত্ত একই উপবৃত্তেব যেন ছুটি অংশ। এ-ছুটি দৃশ্য যেন অঙ্গাজিভাবে জড়িত। ৩নং বৃত্তে মহাজনক হস্তিপৃষ্ঠে হিমাবলী পর্বতে চলেছেন। তাব উপরে ৪ ও ৫-চিহ্নিত ছুটি বৃত্ত আবার একটি বৃহদাকার উপবৃত্তেব অন্তর্ভুক্ত। এ-ছুটি বৃত্তে আছেন হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী ও মহাজনক। ৫নং বৃত্তেব নিচে আরও একটি বৃত্তাকার গ্রুপ আছে, কিন্তু সেটি মূল কাহিনীব শ্রোত্রেব বাহিবে। ৫নং বৃত্তেব পবে আরও এগিয়ে যেতে হবে কাহিনীব অপর অংশেব সন্ধানে।

এখন দেখুন, প্রথম দৃশ্যেব সীমান্তে, বস্তুতঃ প্রথম বৃত্তটিব প্রান্তে, ছুটি নারী দ্বিতীয় অলঙ্কার—১১

বৃহত্তর দিকে ভাঙ্কিয়ে আছে (বিস্তারিত চিত্র—৮)। ছুটি স্তম্ভের মাঝখানে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সীবলীর পদসেবাকারী দাসীটিকে দেখুন এবং—তারা দুজনে দ্বিতীয় বৃত্তটির দিকে মুখ ফিরায়ে দর্শকের দৃষ্টিকে কেমনভাবে পববর্তী চিত্রের দিকে চালিত করে দিচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্ত পাশাপাশি, মণ্ডপের ভিতরে প্রমোদ-ভবনে রাজা-রানী ও বাহিরে অপেক্ষমানা নর্তকী এবা একই কালেব, একই সংলগ্ন স্থানেব। ফলে, এই দুটি দৃশ্যেব মধ্যে কোন পূর্ণচ্ছেদ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বৃত্তেব পবে হয়েছে স্মৃতিস্থিত পটক্ষেপ—সেটি ঐ তোবণ-দ্বাব। তৃতীয় বৃত্তেব পবে দর্শককে উপবদিকে যেতে হবে কাহিনী



চিত্র ২৫

চিত্রনাট্যেব বিস্তারিত (কম্পোজিসন) ৫ যতিচিত্র

প্রব. তরু	প্রথম দৃশ্য	১ন বৃত্ত— প্রমোদ ভবন ( পাণ্ডুরাজিবে দৃশ্য ), চিত্র—৭
	দ্বিতীয় দৃশ্য	২ন বৃত্ত— অর্জুনে নর্তকী দল ( একই স্থানে কাল ), চিত্র
দ্বিতীয় অঙ্ক :	প্রথম দৃশ্য	৩ন বৃত্ত— সন্ন্যাসী দর্শনে যাত্রা
	দ্বিতীয় দৃশ্য	৪ন বৃত্ত— হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী
		{ ৫ন বৃত্ত— হিমাবলী পর্বতে মহাজনক
তৃতীয় অঙ্ক :	প্রথম দৃশ্য	( বর্তমান চিত্রেব বাহিরে ) প্রমোদ ভবনে রাজা-রানী, চিত্র—৮

হত্যাদি

সূত্র ধরে—তাই দেখুন, উল্ল মুখী হবিগটি কেমন সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করছে। চতুর্থ ও পঞ্চম বৃত্ত আবার একই স্থানেব, একই কালেব—তাই সেখানে তাদের মাঝখানে কোন ব্যতিচিহ্ন নেই, আবে তাই তাবাও যেন একটি বড় উপবৃত্তেব অংশমাত্র।

এইভাবে যদি শিল্পীই ইঙ্গিত, নির্দেশ ও যতিচিহ্নগুলি লক্ষ্য করে অগ্রসব হন, তবে পথ হারাবার ভয় নেই। চিত্রাবলীই আপনাকে হাত ধবে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাহিনীৰ পরিণতিৰ দিকে।



চিত্র—১৩-এ পূর্ণ-অবদান জাতক কাহিনীর অনেকখানি একসঙ্গে আঁকবার চেষ্টা কবেছি। সেখানে লক্ষণীয়, কাহিনী-চিত্রে ছুটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে। উপবে আবস্তীতে পূর্ণ ও ভাবিল বৃদ্ধদেবের দর্শনপ্রার্থী। উপবের সম্পূর্ণ প্যানেলটি একই স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত, ফলে, বিভিন্ন গ্রুপের মাঝখানে কোন সুস্পষ্ট যতিচিহ্ন নেই। বামদিকে উচ্চতর মণ্ডপে বৃত্তাকার প্রথম গ্রুপ। সোপানের উপরে ও নিচে ছুটি মেয়ের মুখ-ফোনোর ভঙ্গিতে আমবা পববর্তী খণ্ডদৃশ্যে আসি। সেটি পূর্ণ ও ভাবিলের গ্রুপ। এটি ত্রিকোণাকৃতি। ইংবেজিতে একে বলে পিবামিড কম্পোজিসন। পূর্ণের মস্তক এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু। বৃদ্ধদেবের নিকটবর্তী গ্রুপটি একটি উপবৃত্তে বিধৃত। উপবের গবাক্ষবর্তিনীবা কাহিনীর গতি-নির্দেশক একটি সবলবেখায় সংস্থাপিত।

নিচের প্যানেলটির কম্পোজিসনে মৌলিক ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি ত্রৈণীগত চান্দসিক কম্পোজিসন। এব মূল ছন্দ হচ্ছে নৌকাটি। লক্ষ্য কবে দেখুদ, বামদিক থেকে বৃদ্ধদেব, পূর্ণ, নৌকার তলদেশের বক্রবেখা, দেবদত ও উড্ডীয়মান পূর্ণ যেন একটি অন-চক্রাকার মালাব আকাবে সাজানো। যেন সেটিও একটি নৌকা। কিন্তু যেহেতু বামপ্রান্তের বৃদ্ধদেব ও পূর্ণ ভিন্নতর স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত, তাই নৌকার পালের মাধ্যমে একটি যতিচিহ্নের সুস্পষ্ট ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অজস্তাব কাহিনী-চিত্রে কম্পোজিসন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু হতে পারে এবং সে আলোচনা চিত্রবহুল হওয়া চাই। বর্তমান নিবন্ধে তাব স্থানের অভাব। ফলে, এ প্রসঙ্গের এখানেই যবনিকা টানছি।

একক-চিত্র ও কাহিনী-চিত্রের অঙ্গন-বীতি ও কম্পোজিসন নিয়ে আমবা এতক্ষণ আলোচনা কবেছি, এবাব তৃতীয় জাতের ছবি-নকশাব প্রসঙ্গে আসতে হয়। অজস্তাব এই নকশা বা অলঙ্করণ-চিত্র হচ্ছে তাব প্রাণের বস্তু। একথা স্বীকার কবতেই হবে যে, আখ্যান-চিত্রে কাহিনীই মৌল, চিত্র গৌণ। কাহিনীর প্রয়োজনেই চিত্র সৃষ্টি করা হয়েছ, স কাহিনী শাস্ত্র-সম্মত ও পব-নির্ধারিত। শিল্পের প্রয়োজনে কাহিনীর সামান্য রকমফের হতে পারে, মদল-বদল হতে পারে না। ফলে, চিত্রই কাহিনীর অন্তর্গ। তাছাড়া, শিল্পীব মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকের মনে ধর্মের অনুশাসন ও ভাব জাগিয়ে তোলা—তাই 'আর্ট ফব আর্টস সেক' এ বাণী সেখানে অচল। তবু দেখাছি, কাহিনী কোথাও চিত্রশিল্পের ভাব হয় নি—

নকশা বা  
অলঙ্করণ চিত্র

তাব প্রাণ। কিন্তু এই নকশাগুলিতে কোন কাহিনী নেই, সেখানে কোন বাণী বা কথা নেই তা যেন শুধু সা-বে-গা-মা সান্বেতিক-ধ্বনিব সাহায্যে ধ্রুপদী-সঙ্গীতের আলাপ। সেই সা-রে-গা-মা

এখানে হচ্ছে রেখা আব রঙ। রেখাব কড়ি ও কোমলে, বণ্ডের মীড় ও মূর্ছনায় শিল্পী যেন চিত্রের আসবে রাগপ্রধান সুবের আলাপ কবেছেন এই নকশাগুলিতে।

কিন্তু ধ্রুপদী-সঙ্গীত নয়, আমবা এই নকশাগুলির সঙ্গে ইতিপূর্বেই তুলনা কবেছি

রবীন্দ্রসঙ্গীতের! গীতবিদানের সহস্র সঙ্গীত যেমন সহস্র ভাবের স্রোতক, এই অলঙ্করণের নকশাগুলিও তেমন সহস্র ভাবের ব্যঞ্জক। তাতে কখনও কব্জ রস, কখনও বীভৎস রস, আবার কখনও বা হাস্য রস, করুণ রস। এই অলঙ্করণ-নকশায় আছে আম-আতা-আজুর-আনারসের নৈবেদ্য, আছে পদ্ম-চাঁপা-চন্দ্রমুখী-চামেলীর সীতিমালা, আছে রঙ ও রেখার গীতাজলি। এত বিচিত্র ভঙ্গি, বিচিত্র ভাব। এত রেখার কারিগরি এই নকশাগুলিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হতে হয়। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যই কি কম? হাতী, ঘোড়া, মহিষ, ধাবমান হরিণ, হনুমান, কাকাতুয়া, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বানর, বাঘ, সাপ—কী নেই? আবার উদ্ভট কিম্বৃত নাগ, কিম্বর, কৃষ্ণনগরী পটুয়ার আছলাদী-পেছলাদী, আজগুবি জন্তুও আছে। বিষয়-বস্তু ছাড়াই শুধুমাত্র রঙ ও রেখার আলপনাও আছে। ফল-ফুল-লতা-পাতার বৈচিত্র্যই কী কম? পদ্মফুলই বা কত বকম। শাড়ির পাড়ের মত লম্বা নকশা আছে, লক্ষ্মীগুজাব আলপনার মত গোলাকৃতি নকশা আছে, আবার ছোট ছোট চৌথুপিতে ছোট-ছোট বিষয়-বস্তুও আছে।

চুটি কথা বলব। প্রথমতঃ, অলঙ্করণের মৌলিকতা। আলপনা-নকশার মর্মকথা হচ্ছে কতকগুলি রেখা ও বণ্ড একই ভাবে বাবে বারে ফিবে ফিবে আসবে। যাতে সবটা মিলিয়ে একটা সুসম ছন্দে নকশার রূপ নেয়। মুঘলযুগের চিত্রে বা জাফরির কাজে, রাজপুত স্থপতিতে ও চিত্রাঙ্কনে আমরা এ সত্যকে বারে বারে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু অজন্তা এ-বিষয়ে এক অভূত ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি নকশাই নূতন ও মৌলিক। কেউ কারও নকল নয়। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় গুহার সিলিঙে একটি গোলাকৃতি নকশায় তেইশটি হাঁসের একটি আলপনা আছে (২।৫)। সেখানে প্রত্যেকটি হাঁসের ভঙ্গি মৌলিক ও বিশিষ্ট। অলঙ্করণ-শিল্পে এটা নূতন কথা। এর কাবণ হিসাবে বলতে পারি, অজন্তাব চিত্রকব হচ্ছেন জাতশিল্পী; প্রত্যেকটি মুহূর্তেই তিনি নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় আত্মহাবা।

দ্বিতীয় কথা, শিল্পী এই সব নকশায় যা-কিছু ঐকেছেন, তার ভিতর তাঁর শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ের পরিচয় পাই। বিশ্ব-সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যকে তিনি বণ্ড ও রেখায় ধবতে চেয়েছেন, ছোট ছোট চৌথুপিতে; কিন্তু প্রতিটি বিষয়-বস্তু প্রতি পবিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ আর সংবেদনা বর্তমান। ইউরোপীয় চিত্রকরের মত বাস্তবের ছবছ নকল করার দিকে তাঁর বঁাক নেই—কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর প্রাণসত্তাটিকে তিনি সযত্নে বিকশিত করে তুলেছেন। গাছ-ফুল-পাখী-পশু বাস্তবায়ন হল কিনা এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই—কিন্তু সেগুলি যে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ-প্রপঞ্চে ভীষণ ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ, এ-কথা শিল্পী কখনও ভোলেন নি। পদ্মফুল যখন ঐকেছেন তখন তা বলতে পেরেছে—‘এই দেখ অভিজ্ঞান, আমি সেই সুন্দরের দূত!’ ‘স্বাভাবিক পদ্মকে পৃথিবীতে যদি কেউ হারা মানিয়ে থাকে, তবে তা অজন্তার ছবি: শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে জড়িয়ে ধরতে চান, জাপটে ধরতে চান!’

অজন্তার অসংখ্য প্রাচীরে, অযুত স্তম্ভে ও সিলিঙে যে লক্ষাধিক নকশা আছে,

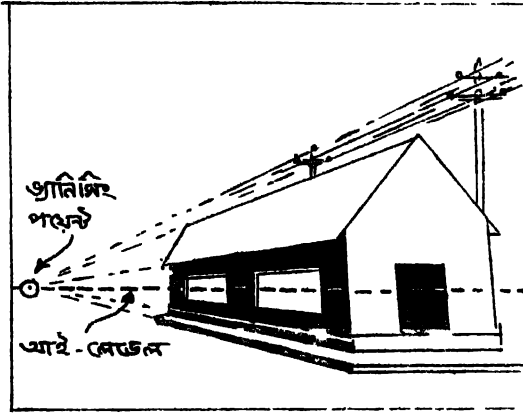
ছ-চারটি নমুনাচিত্র ঐকে তার পরিচয় দিতে যাওয়া হবে ঋষ্টতা। এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদের সমাপ্তিসূচক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্যবতীয় নকশা বা আলপনা অজস্তা-গুহা থেকে অমুকৃত।

অজস্তা-চিত্রের বিচার বা কম্পোজিসন, যতিচিহ্ন বা পাঙ্কয়েসান এবং ব্যাকরণ নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। চিত্র-রীতির আর একটি বিশেষ দিকের কথা

অজস্তা-চিত্রে  
পরিপ্রেক্ষিত

আলোচনা না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে অজস্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের (পারস্পেক্টিভের) সংজ্ঞা এবং তার প্রচলিত ধারা। বিষয়টা বুঝতে হলে পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্টিভ

কাকে বলে, তা আগে জেনে নিতে হবে :



চিত্র—১৬

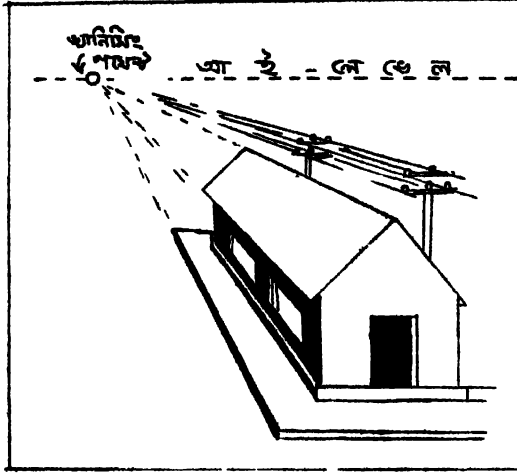
পারস্পেক্টিভ—পতঙ্গদৃষ্টিতে

জগতে আমরা যা-কিছু দেখি, তার তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনসান,—লম্বা, চওড়া ও খাড়াই। এই ত্রিমাত্রিক বিষয়-বস্তুকে আমরা যখন দ্বিমাত্রিক কাগজে ছবি ঐকে দেখাই, তখন চিত্রকরকে একটা কৌশল করতে হয় যাতে ছবিটা অবাস্তব বলে না মনে হয়। এই কৌশলটির মূলে আছে দুটি জিনিস—‘বিলীয়মান বিন্দু’ (ভ্যানিসিং পয়েন্টস্) এবং ‘দৃষ্টিভঙ্গ’ (আই-লেভেল)। এবার এ-দুটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমরা যখন একটি রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাইন-জোড়ার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই সমান্তরাল রেলের লাইন দুটি যেন দিগন্ত রেখার দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। তেমনি কোন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়, টেলিগ্রাফের তার, গাছ বা বাড়ীগুলি যেন ক্রমশঃ দূরে যেতে যেতে আকারে ছোট হয়ে গেছে—যেন সব সমান্তরাল রেখাই দিগন্তের একটি বিন্দুর দিকে মিলিত হতে চাইছে। এই বিন্দুকেই বলি বিলীয়মান বিন্দু। ছবি আঁকবার সময় ঐ কথাটি মনে রেখে আমরা যদি কাছের জিনিস বড় ও দূরের জিনিস ক্রমশঃ ছোট করে আঁকি, তবে সেটা বাস্তবায়ন হয়, ছবিতে

গভীৰতাবোধ দেখা দেয়। এই ক্ৰমশঃ ছোট হযে যাওয়াৰ বাপাৰটা একটা গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয়তঃ, 'দৃষ্টিভঙ্গি' বা আই-লেভেল। একটা ছবিৰ উপৰ কল্পিত একটা সরলবেখা জমিৰ সমান্তৰালভাবে টানা হয়। ছ-পাশেৰ দুটি বিলীয়মান বিন্দু এই সবলবেখায় এসে মেখে। এই কল্পিত সবলবেখাটি ছবিৰ নিচেকাৰ দিক থেকে ক্ৰমশঃ উপৰেৰ দিকে তুলে



চিত্ৰ—২৭

পায়াম্পকটিভ—গৰুডাবলোকনে

আমবা আমাদেৰ দৃষ্টিভঙ্গিকে (এয়াল্জেল অব ভিসানকে) 'পতঙ্গদৃষ্টি' (ওয়াম্ আই-ভিযু) থেকে ক্ৰমশঃ গৰুডাবলোকনেৰ (বার্ড্ আই-ভিযু) দিকে নিয়ে যেতে পাৰি। চিত্ৰ—২৬ এবং চিত্ৰ—২৭-এ এটাকেই বোঝাবাব চেষ্টা কবানো হযেছে।

বিলীয়মান বিন্দুৰ সংস্থাপন ও দৃষ্টিভঙ্গিৰ নিৰ্বাচন বস্তুতঃ গাণিতিক ছকে বাঁধা। এই গণিত-সূত্ৰগুলি বেনেচাঁস যুগেৰ পূৰ্ববৰ্তী ইউৰোপীয় চিত্ৰকৰবা জানতেন না। এই আইনগুলি ইউৰোপখনে প্রথম আবিষ্কাৰ কৰেন ফিলিপ্পো ব্ৰানেলেস্চি (Filippo Brunelleschi, 1377 1448 A D.)। পৰে লিওনাৰ্দো, ডুৰাব প্ৰভৃতি চিত্ৰবিশাৰদৰা আইনগুলি ঠিকমত বিবিধ কৰেন। তাৰ পূৰ্বে ইউৰোপীয় চিত্ৰে গভীৰতাবোধ ছিল না। মিশৰ এবং চীনেৰ প্ৰাচীন চিত্ৰকৰৰা এই পৰিপ্ৰেক্ষিত্তেৰ কথা জানতেন না। মিশৰীয় চিত্ৰকৰবা দুবৈৰ মানুহকে উপবেৰ সাৰিতে আঁকতেন, মাৰ্গে তাৰে ছোট কৰতেন না।

প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিত্ৰকৰবা সম্ভবতঃ পৰিপ্ৰেক্ষিত্তেৰ এই মূলসূত্ৰগুলি জানতেন, কিন্তু সব সময়ে মেনে চলতেন না। কোন কোন সময়ে তাঁৰা উল্টো-পৰিপ্ৰেক্ষিত্তেৰ আশ্ৰয় নিতেন। অৰ্থাৎ, দুবৈৰ জিনিসই বড় কৰে আঁকা হত, কাছেৰ জিনিস ছোট কৰে। এই প্ৰাচ্য পৰিপ্ৰেক্ষিত্ত অল্পস্বাৰে চৌকি বা পালঙ্কেৰ যে ধাৰটি আমাদেৰ থেকে সবচেয়ে দুবৈ

সেটাই ছবিতে সবচেয়ে চণ্ডা দেখানো হত, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটাই হবে সবচেয়ে সুরু। বলা বাহুল্য, এটা বাস্তবের উপ্তে। ধরা যাক, চিত্র—৮-এ নৰ্শকী দলের পিছনের বাড়ীটি। ঢোকা ছাদেব যে পাঁচিলটা আমাদের কাছে সেটাই মাপে ছোট, যে পাঁচিলটা দূরে সেটাই আকারে বড়। প্যারাপেটের সমান্তরাল রেখাগুলি বিলীয়মান বিন্দুব দিকে দূরে গিয়ে মেশে নি—দর্শকের দিকে যেন এসে মিশতে চায়। পরিপ্রেক্ষিতের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ-কে ক্রটি ছাড়া আর কি বলা যাবে ?

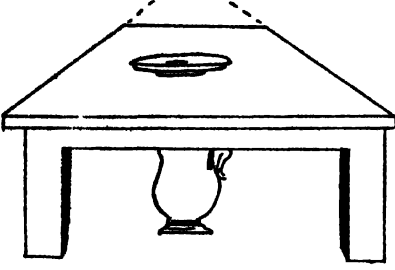
এই আপাত-অসঙ্গতির সমাধান হিসাবে আমরা তিনটি যুক্তি দাখিল কবতে পারি। এক, ধরে নিতে পারি অজ্ঞতা-শিল্পী পবিপ্রেক্ষিতের আইন-কানুন জানতেন না। জুই, ধরে নেওয়া যায়, অজ্ঞতা-শিল্পী এটা জানতেন কিন্তু খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না। তিন, শিল্পী সজ্ঞানে এই আপাত-বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিশেষ কোন কাবণে।

প্রথম প্রস্তাবটাকে আমরা সবাসবি পরিত্যাগ করতে পারি। চিত্রশিল্পেব অজ্ঞাত বিষয়ে যাঁবা অন্তত পবাকষ্ঠা দেখিয়েছেন, পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে তাঁদেব এই প্রাথমিক ধারণা ছিল না—এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁবা পবিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভুল প্রয়োগ করেছেন। না জেনে তাঁবা তা কেনন করে কববেন ? দ্বিতীয় প্রস্তাবটাও ঐ একই কাবণে বাতিল কবতে হচ্ছে। চিত্রের সম্বন্ধে যাঁবা এত বেশী যত্নশীল, যাঁদের হাতের কাজ একেবাবে নিখুঁত, তাঁরা পবিপ্রেক্ষিত বিষয়েই বা কেন অথবা এমন অসাবধানী হবেন ?

প্রশ্ন হতে পারে, তবে জেনেশুনেই বা তাবা এ ভুল কবলেন কেন ?

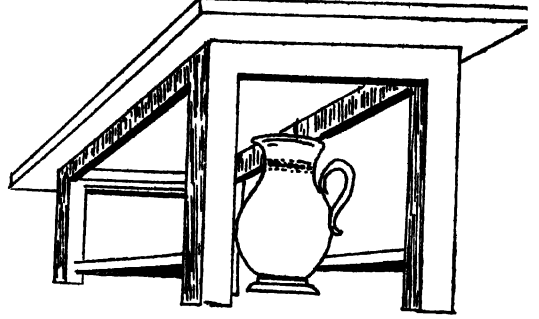
তাৰ প্রতিপ্রশ্ন হিসাবে আমি বলব, জেনেশুনে কি প্রচলিত রীতিকে যুগে যুগে শিল্পী লঙ্ঘন কবেন নি ? পোলকেব 'এবাস্ট্রাক্ট এঞ্জপ্রেসানিস্ম' অথবা পল সেজানের 'পোস্ট-ইম্প্রেসানিস্ম' যদি আজ থেকে হাজার বছর পবে কোন চিত্র-সমালোচকেব নজবে পড়ে, তবে সে-ও তো বলবে পোলক ও সেজান পবিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শিল্পী যামিনী রায়কে হাজার বছর পবে কোন চিত্র-সমালোচক তো অনায়াসে মিশরীয় চিত্রকরদের সমকালীন বলে মনে কবতে পাবেন, যেহেতু যামিনী বায়েব চিত্রে সামনে-ফেরা মুখে পাশ-থেকে-দেখা চোখ আঁকতে দেখা গেছে ! ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রকর পারমিগিয়ানিনো (Francesco Parmigianino) যে দীর্ঘগ্রীবা ম্যাডোনার চিত্রটি একেছিলেন 'ম্যানারিস্ম'-এর খাতরে, সেটি দেখেও তো আমরা বলতে পারি, চিত্রকর স্ত্রীলোকের গ্রীবা কত লম্বা হয়—এ সামান্য কথাটিও জানতেন না। গত শতাব্দীর 'ইম্প্রেসানিস্ট' এখং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ডাডাইস্ট' ও 'সাররিয়ালিস্ট' চিত্রকররা জ্ঞাতসারে প্রচলিত চিত্র-রীতিকে যে কত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন, তা তো আমরা চোখেব উপবেই দেখছি। আধুনিক চিত্র-রীতিতে তো পরিপ্রেক্ষিত একেবাবেই অপাংক্তেয়। তার মানে কি ঐরা কেউ পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে অবহিত নন ? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

মনে করা যাক, চিত্রকর দেখাতে চান একটি টেবিলের উপর একটি প্লেট রাখা আছে, যাতে সুন্দর নকশা-কাটা, আর দেখাতে চান যে, টেবিলের নিচে রাখা আছে, একটি ফুলদানি। 'দৃষ্টিভঙ্গ' গুরুড়াবলোকনের দিকে নিয়ে গেলে (চিত্র—৩০) প্লেটের নকশাটা দেখানো যায়, কিন্তু ফুলদানিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, দৃষ্টিভঙ্গ নামিয়ে এনে যদি



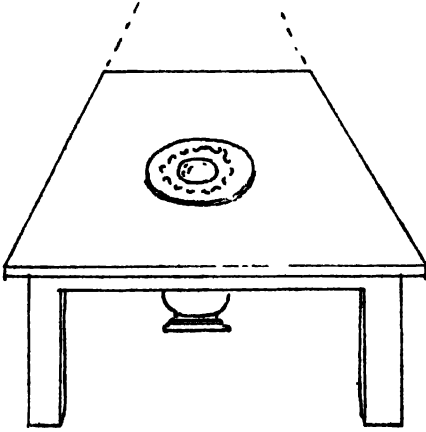
চিত্র—২৮

প্লেট ও ফুলদানি—সাধারণ দৃষ্টিতে



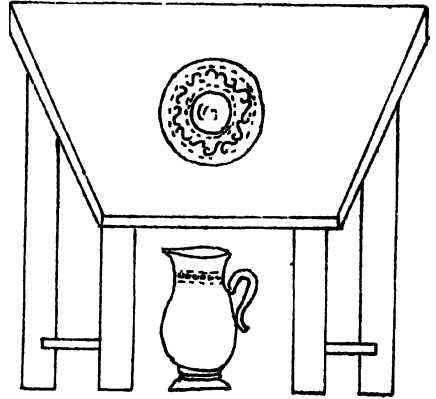
চিত্র—২৯

প্লেট ও ফুলদানি—পতঙ্গদৃষ্টিতে



চিত্র—৩০

প্লেট ও ফুলদানি—গুরুড়াবলোকনে



চিত্র—৩১

প্লেট ও ফুলদানি—প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতে

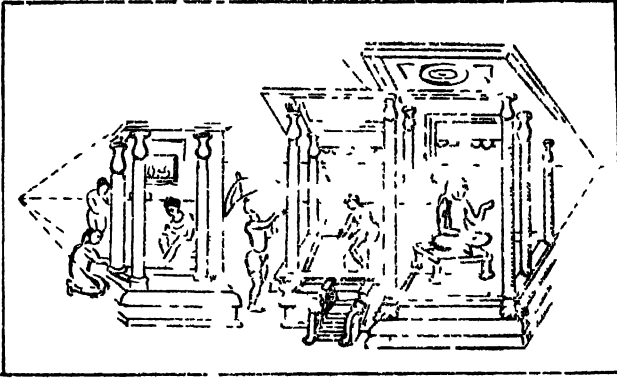
'পতঙ্গদৃষ্টি'তে ছবিটা ঝাঁকতে বসি, তখন ফুলদানিটা স্পষ্ট হয় বটে, প্লেটটা হারিয়ে যায় (চিত্র—২৯)। এবার যদি দৃষ্টিটা ছবির দৃষ্টিভঙ্গের মাঝামাঝি রাখি, তাহলে দেখছি, ফুলদানি ও প্লেট দুটোই দেখা যাচ্ছে; কিন্তু প্লেটের নকশাগুলি ভালভাবে ঝাঁকি যাচ্ছে না (চিত্র—২৮)।

এবার যদি পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত পাশ্চাত্য সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্য রীতিতে ছবিখানি ঝাঁকতে বসি? তাহলে দেখছি (চিত্র—৩১) ফুলদানি এবং প্লেটের নকশাকে

একই চিত্রে ঝাঁকা সম্ভব হচ্ছে, যদিচ ছবিটা আলোকচিত্রের মত বাস্তবায়ন মনে হচ্ছে না।

প্রায় এই জাতীয় সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল অজন্তার চিত্রকরকে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এজন্তাই তিনি এ-সব স্থলে প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের নূতন ধারায় কোন কোন চিত্র ঐকেছেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

অজন্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক শ্রীমতী জান ওবোআইয়ে<sup>১</sup> যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা সেটিকেই মান হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। চিত্রটিতে পাশাপাশি তিনটি সভামণ্ডপ আছে। এটির অবস্থান ১৭ এবং ১১২২। সর্বদক্ষিণে মহাজনকের (?) অভিষেক-স্থানের দৃশ্য; মাঝেব মণ্ডপে সীবলীকে (?) স্নান করানো হচ্ছে এবং সর্ববামেব মণ্ডপে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কয়েকটি



চিত্র—৩১

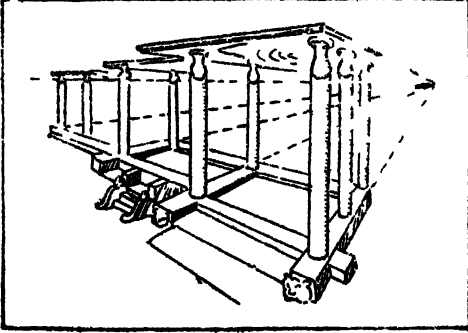
প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের বীতি অনুসারে ঝাঁকা মণ্ডপত্রয়, অবস্থান—১১২২ ও ১৭

দ্বীলোক অর্ঘ্য দান করছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মণ্ডপেব মাঝখানে, পথে কয়েকজন ভিক্ষু (অভিষেক-) দান গ্রহণ করছে। অজন্তা-শিল্পী বিষয়-বস্তুটা যেভাবে ঐকেছেন, তার চূষক চিত্র এখানে চিত্র—৩২-এ দেওয়া গেল। লিওনার্দো-নির্দেশিত পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিত মেনে ঝাঁকলে এবং সর্বদক্ষিণের মণ্ডপের সামনে থেকে ঝাঁকলে মণ্ডপ তিনটিকে চিত্র—৩৩-এর মত দেখাবে।

নিঃসন্দেহে চিত্র—৩৩ অনেক বেশী বাস্তবায়ন,-ফটোগ্রাফিক! চিত্র—৩২-এ 'দৃষ্টিভঙ্গ' বদলে গেছে, আর বিলীয়মান বিন্দু তো বাবে বাবে স্থান বদলেছে। শ্রীমতী ওবোআইয়ে বলছেন—“এই বিশ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যিকারের কোন বাড়ী দেখে ঝাঁকেন নি বা নকল করেন নি। বাড়ীর রূপটি মানসচক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।”

(১) "Composition & Perspective at Ajanta", Art and Letters, India & Pakistan, Vol. 22, No. 1. London, 1948—by Jeanne Auboyer.

আমার মনে হয়েছে, কারণটা তা নয়। শিল্পী সজ্ঞানে সম্মুখ-চিত্র বা মণ্ডপত্রয়ের কাঁসাদ আঁকবার সময় জমিব সমান্তরাল বেখাগুলিকে বিলীয়মান বিন্দুর দিকে তেরছা কবে আঁকেন নি। কেন আঁকেন নি, তা উপলব্ধি কবা যায় চিত্রেব মূল বিষয়-বস্তুব কথা চিন্তা করলে। শিল্পী তিনটি মুখ্য ফিগব আঁকতে চেয়েছেন। ফলে, পাবস্পেক্টিভেব ব্যাকরণ



চিত্র-৩৩

পাশ্চাত্য বীতিতে ঙকা মণ্ডপদ্বয়

মানতে গিয়ে তিনি মণ্ডপ-কাঁসাদেব বিস্তার কমাতে বাজী নন। এমনকি সর্ববামেব মণ্ডপেব কাছে গিয়ে তিনি সচ্ছন্দে বিলীয়মান বিন্দুটিকে উর্শ্টো দিকে সবিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ, চিত্রকব যেন স্থিব নন, এক-একটি স্থান থেকে যেন এক-একটি মণ্ডপ তিনি ঙকোজন, দর্শক যেন চিত্রেব বাজ্যে প্রবেশ কবে ঘুরে ঘুরে মণ্ডপগুলিকে দেখতে পাচ্ছেন। তা হলে গলিপথে-দাঁড়ানো ভিশুদেব ঙকা যাবে কেমন

কবে? বৌদ্ধ ভিক্ষুব চরণে অচানানকাবা মহিলাবুন্দেব সঙ্গেই বা দর্শকদেব বেমন কবে পবিচয় কবিয়ে দেবেন চিত্রকব? আজকেব চলচ্চিত্রেব ঙাযায বলতে পারি, ঙ্র মণ্ডপত্রয়েব বিভিন্ন ঘটনা একই সিবোথেসেব অঙ্কিত ও, ১২ স্থ সেটিকে কপাখিত কবতে অজস্রা-শিল্পেব কামেবামান তিন-তিনবার ঙব স্যামেব স্থান বদলেছেন, তিনটি পিভিন্ন স্ট নিতে।

ব্যাকরণ কি? প্রচলিত সাহিত্য-বীতিব সম্বলিত মূলসূত্র বে তো নয়? কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যেব অঙ্গ, তাব পদাঙ্ক অনুসারী। জ্ঞেই যখন সৃষ্টিব তাগিদে ব্যাকরণ-বহিষ্কৃত কোন শব্দ বা বাক্য বচনা কবেন, তখন বেযাকরণেব সর্বিগে ঙ্র মেনে নিয়ে বলেন—এ হল ‘আম প্রয়োগ’ অধন-বীতিতে প্রয়োজনেব ঙগিদে বদলাতে পারে। আর্কিটেঙ্ক যখন বাডীব পনিপ্রেক্ষিত আকেন, তখন তিনি বিলীয়মান বিন্দুব বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সহ্য কবেন না। কিন্তু বাস্তবাব যখন তাব বাডীব ‘এলিভেসান’ বা ‘সাইড-ভিউ’ আঁকেন, তখন বিলীয়মান বিন্দু বিলীন হয়ে যায়। চিত্রকব যদি তখন এসে বলেন—এহে বাপু বাস্তবাব, তোমাব এ ছবি লিওনার্দো-নিদেশিত সূত্র হিসাবে আগাগোডা ভুলে ভরা। কোথাব তোমাব আই-লেভেল? কোথাব ভ্যানিসিং পয়েন্ট? বাস্তবাব তখন তাব জবাবে বলবেন—মশাই, এ হল সাক্ষতিক চিত্র, বিশেষ জগত্বেব চিত্র। বাস্তব জগতে এ-চিত্র একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন কববাব প্রয়োজনে আকা হয়েছে, তাই এব ব্যাকরণও পৃথক।

অজস্রাব শিল্পীও ঠিক ঙ্র কথাই বলবেন। এখানে কোন ‘বিভ্রম’ বা anomaly নেই। এ-চিত্রও একটি বিশেষ প্রয়োজনে আকা হয়েছে। তাব চিত্র এখানে তিনটি ঘটনাকে



একই চিত্রের পবিসবে দেখাতে চায়। ভক্তি ও ভাববসেব আবেদনই এখানে মুখ্য, চিত্রের ব্যাকবণ-সূত্র গৌণ। শিল্পের প্রয়োজনে তাই শিল্পী নূতন ব্যাকবণ-সূত্র নির্দেশ করতে চান। সে সূত্র এইঃ মণ্ডপ তিনটির সামনের দিক বা ফাসাদ আঁকবার সময় নিছক 'এলিভেসান' আঁকা হবে, তখন বিলীয়মান বিন্দু অপাংক্ত্যে এবং পাশ আঁকবার সময় বিষয়-বস্তু প্রয়োজনে বিলীয়মান বিন্দু ইচ্ছানুসাবে সরানো যাবে।

এই নূতন সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই একই চিত্রে তিনটি মণ্ডপে তিনটি দৃশ্য এবং গলিপথে আরও একটি দৃশ্য আঁকা সম্ভবপর হয়েছে। লিওনার্দো-নির্দেশিত পঞ্চাষ চিত্র—৩৩-এর সঙ্কুচিত পবিসবে এত বিষয়-বস্তুগুলি একত্রে থাকা অসম্ভব।

ওবোআইয়ে অবশ্য তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে এ সত্য স্বীকার করেছেন, Here there is a certain proof that Indian artists, unlike their western counterparts, did not attempt to reproduce what they saw as they saw it, but rather as they knew it to be from a mental picture in which it appeared with its essential characteristics.

প্রাচ্য-পারাম্পরিকচিত্র-বীতিতে কণ্ঠবেখা বা ডায়াগোনাল-গুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেবিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে। অর্থাৎ, চোকন যে প্রান্তটা আমাদের কাছে আছে, সেটাকেই আমরা ছোট দেখি, দূরের প্রান্তটা বড় দেখি। এ-জাতীয় পবিকল্পনা অজস্তায় অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, শিল্পী আবিষ্কার ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনেই এ বীতি অনুসরণ করেছেন— নিছক বাস্তব মনে চলাব জগৎ নয়। যেমন ধরা যাক, বিবর পাড়িও জাহাজে সেখানে পুণ্যাব ও ইন্দ্রপাত্ৰবাজ পাশা বেসেছেন, সেখানে পাশার মেডটিকে প্রাচ্য বীতিতে আঁকা হয়েছে (অনুসং ১১৩০ক) এবং জগৎ পাশার ছকটিকে গর্বিবকাল দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন শিল্পী উদ্ভাব থেকে পাশাব হবব প্লান এবেছেন, অথবা বলা যায়, পাশাব ছকটা যেন টেবিল থেকে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে উঠেছে। এটি কেন কবেছেন শিল্পী? কবেছেন এজন্য যে, ঐ পাশাব ছকটিই এই খণ্ডদৃশ্যে সবচেয়ে জরুরী জিনিস, তাই কাহিনী-চিত্রের প্রয়োজনের দিক থেকে পাশাব ছকটিকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। এ দৃশ্যে কাহিনীটি তখন ঐ পাশাব ছকের পাবে পাবে ফিবছে। পাশ্চাত্য-পরিপ্রাক্ষিতের আইন অনুসাবে আঁকতে গিয়ে ঐ অক্ষক্রেীডাব ছককে শিল্পী ছোট করে দেখাতে বাজী নন। তাই এ প্রাচ্য বীতির অনুসরণ।

আবও ভাল একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। বাস্তবে চিত্রটি একেবাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এ বসোপলন্ধি কবতে হলে গিফিখ সাহেবের ছুপ্রাপ্য মূল গ্রন্থটি আপনাকে দেখতে হবে।

চিত্রের বিষয়-বস্তু—যশোধবা ও বাছলকে শযায় বেখে বুদ্ধদের গৃহত্যাগ করছেন। সেখানে শিল্পী দেখাতে চান পালঙ্কের উপর যশোধবা শায়িতা এবং দেখাতে চান পালঙ্কের নিচে কিছু তৈজসপত্র। পাশ্চাত্য বীতিতে আই-লেভেল উঁচুতে ধবে, গকড়াবলোকন কবে

শিল্পী দেখেছেন নিজামগা গোপাকে আঁকতে অনুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পালঙ্কের নিচে তৈজসপত্র। কিন্তু শিল্পী তাতে রাজী নন; কারণ, ঐ তৈজসপত্রের মধ্যে ছুটি জিনিস যে তাঁকে আঁকতেই হবে। একটি ছিন্নতার বাত্ময়ঙ্গ এবং একটি নির্বাপিত-দীপ দীপাধার! এ ছুটি তো সামান্য তৈজসপত্র নয়, এ যে তাঁর চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ; ঐ নির্বাপিত-শিখা দীপাধারটি যে এ চিত্রের অন্তর্গত বেদনার মূর্ত প্রতীক! ঐ ছিন্নতার বীণাটি যে সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরার ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবনের অবসানের ছোতক। ও ছুটি চাই। শিল্পী পাশ্চাত্য বীতিতে আই-লেভেল নামিয়ে এনে দেখেছেন— ও ছুটিকে আঁকা যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্চাভিত্তা মন্দভাগিনী যশোধবার দেহটি ছোট হয়ে যাব. সঙ্কুচিত হয়ে যায়। শিল্পী এ-ছুটি বিষয়-বস্তুব কোনটিকেই খাটো করতে রাজী নন; ফলে, ত্যাগ করলেন ঐ নির্ভুব পঙ্খ পাশ্চাত্য-পারম্পেকটিভেব ব্যাকরণ-নৃত্তকে। প্রাচ্য রীতিতে ছবিটি আঁকলেন তিনি। বিলীযমান বিন্দু ছুটিকে সরিয়ে আনলেন দূর দিগন্ত, রেখা থেকে সম্মুখের দিকে, দর্শকেব দিকে। এইবাবে পালঙ্কেব উপবে নিদ্রিতা যশোধবা এবং নিচে নির্বাপিত-শিখা দীপাধার ও ছিন্নতার বীণাকে একই দৃশ্যপটে আঁকা গেল!

স্বস্তিব নিশ্বাস পড়ল যেন শিল্পীব এতক্ষণে!

এ পবিচ্ছেদেব শেষ পর্ষায়ে আব একটি কথা বলব। শিল্পীরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ: কিন্তু মনে হয়, হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রকারদের মল নির্দেশ তাঁবাও মেনে চলতেন। সে শাস্ত্র বলে, 'শিল্পানি শংসতি দেব-শিল্পানি।' সমস্ত শিল্পই দেব-শিল্পেব অন্তপ্রেরণায়, সর্ব-শিল্পের মূলে দেব-শিল্প। ঐতলেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আত্মসংস্কর্তির্বািব শিল্পানি ছন্দোময়ঃ বা ঐতৈর্ষজমান আত্মানং সংস্কৃতো।' অর্থাৎ, এই দেব-শিল্পেব দ্বাবা যে লাভ হয় তা আত্ম-সংস্কৃতি। এই শিল্প-সাধনাই এক যজ্ঞ। সেই যজ্ঞেব মাধ্যমে যজ্ঞমান আপনাব আত্মাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করে তোলেন।

অজস্তুার শিল্পী সেই মহান্ শিল্পযজ্ঞেব স্বত্বিক্, তিনিই তাব হোতা। রঙ আর তুলি সে যজ্ঞের সমিধ্ আর হোমদণ্ড। শিল্পেব পথে তিনি মুক্তিব সন্ধান কবেছেন—তিনি মুক্ত হয়েছেন, তাঁব পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে।

সা মুক্তি— সাতিমুক্তি:।



তৃতীয় ও পঞ্চম গুহা-মন্দির দুটি অসমাপ্ত। পঞ্চম মন্দিবেব প্রবেশ-পথে ছুদিকে দুটি মকববাহিনী নাবীমূর্তি খোদিত। এ-দুটি বিহাব সপ্তম শতাব্দীতে অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত। চতুর্থ বিহাবটি আকারে বৃহত্তম। কেন্দ্রস্থলেব চত্ববেব মাপ ৮৭ ফুট X ৮৭ ফুট। সর্বসমেত আঠাশটি স্তম্ভ। প্রবেশ-পথে দেখছি ছোট ছোট চৌখুপিতে কয়েকটি খণ্ডদৃশ্য পাথবে খোদাই-কবা—সিংহ, হস্তী, অগ্নি, সর্প ইত্যাদি আটটি আধিভৌতিক শক্র দ্বাবা আক্রান্ত মহুগুমূর্তি। শিল্পীব বক্তব্য, তথাগতেব শবণ নিলে মব-মানুষ এই অষ্ট প্রকাব দুর্দেবেব হাত থেকে রক্ষা পেতে পাবে। হল-কামবায় স্তম্ভগুলিব পাদমূল চতুষ্কোণ, মধ্যভাগ আট-কোণ। হলেব সম্মুখে বারান্দাব দুই প্রান্তে দুটি গর্ভমন্দিব। হলেব ভিতবেও দু-পাশে দুটি কবে গর্ভগৃহ এবং পিছন দিকে আবও কয়েকটি গর্ভগৃহ। অন্তবালেব সম্মুখবর্তী কেন্দ্রীয় স্তম্ভ দুটিব অলঙ্কবণ বিশেষভাবে লক্ষ্য কববাব মত। মূল গর্ভমন্দিবে ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্তি, বসে আছেন পদ্মাসনে, ধমচক্রমুদ্রায়। দু-পাশে দুই বোবিসহ। বদ্ধমূর্তিব পদতলে ধর্মচক্র ও মুগয়ুগল। অন্তবালেব দুই প্রান্তে দুটি কবে সর্বসমেত চাবটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। এবদাহস্তমুদ্রা।

তৃতীয়, চতুর্থ ও  
পঞ্চম বিহার

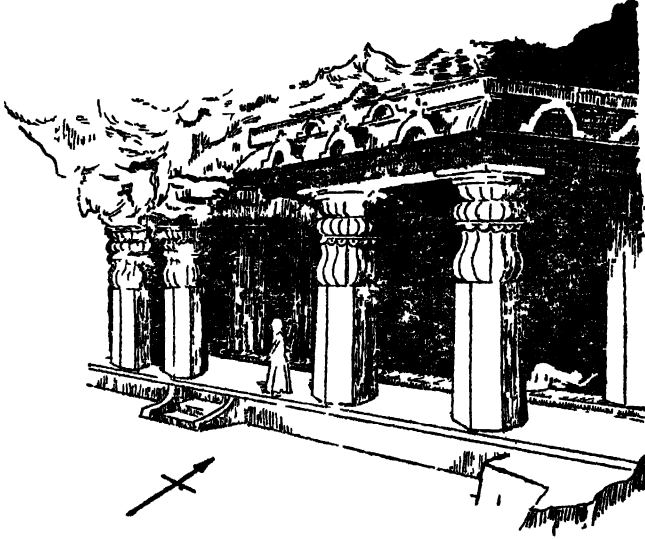
ষষ্ঠ গুহা-মন্দিবটি অজস্রায় একমাত্র দ্বিতল বিহাব। এটি পঞ্চম ঐষ্ঠাঞ্জে নির্মিত। লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, একতলায় যোলটি এবং দ্বিতলে বাবোটি স্তম্ভ আছে, এবং সেগুলি একটিব মাথাব উপব একটি নয়। তাব কাবণ, অজস্রায় চাদেব ভাব গ্রহণ কববাব জন্ম স্তম্ভগুলি নির্মিত হয় নি—পাথর কেটে এগুলিকে কপায়িত কবা হয়েছে শুধু অলঙ্কবণেব উদ্দেশ্যে। ফলে, স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়লেও চাদ ভেঙে পড়বে না।

বস্তুতঃ, অনেক গুহাতেই প্রথম আবিস্কাবের সময় গত শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল অনেক স্তম্ভ ভেঙে গেছে চাদ আছে অক্ষত। সপ্তম গুহাব যে ছবিটি চিত্র—৩৫-এ দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখলে বাপাবটা বরাতে পাববেন। ষষ্ঠ বিহাবেব প্রবেশ-পথেব দুদিকে দুটি ছোট গবাং। একতলাব স্তম্ভগুলিতে কোন পাদপীঠ বা শীষপীঠ নেই। আট-কোণ স্তম্ভগুলি উপরদিকে দক্ষিণ-সক হয় উঠেছে। একতলায় অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ভগুহা আছে। এখানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্র নজবে পড়ে। অধিকাংশই নক্ষা—কিছু দ্বাবপাল, দু-একটি বুদ্ধমূর্তি বা বোবিসহ। বদ্ধ ও মাবেব সংগ্রামেব একটি চিত্রও অল্প অল্প দেখতে পাওয়া যায়। একতলায় মূল গর্ভমন্দিবে সিংহাসনে উপবিষ্ট গভয়-মুদ্রায় বুদ্ধদেবকে এবং দ্বিতলেব মূল গর্ভগৃহে ধর্মচক্রমুদ্রায় মুগদাবেব বুদ্ধদেবকে দেখতে পাবেন। এছাড়া, অনেকগুলি প্রস্তব-মূর্তিও আছে এখানে।

৭ষ্ঠ বিহার

সপ্তম বিহারটিব পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। এব সম্মুখ-ভাগে দুটি পোর্টিকো বা প্রবেশ-মণ্ডপ। এ-বকম জোড়া-পোর্টিকো অজস্রাব অল্প কোনও গুহায় নেই। এলিফান্টা গুহার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য মনে হল যেন। ভিতবে অন্তবালে শ্রাবস্তীব অলৌকিক

ঘটনাটি পাথরে খোদাই করা আছে। মূল গর্ভমন্দিরের পবেশ-পথে যে দ্বার, তাব ছ-পাশে ছুটি মকববাহিনী নাবীমূর্তি। মূল মূর্তিটি বুদ্ধদেবের। ছ-পাশে চামববাহী ছই বোধিসত্ত্ব এবং উজ্জয়মান গম্বৰ্বমূর্তি। চিত্র—৩৪-এ সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথের একটি চিত্র দেওয়া গেল। এটি দক্ষিণ-পূব কোণ থেকে জাঁকা। এতে জোডা-পোটিকোকে বেণ গবিষ্কাবভাবে দেখা যাচ্ছে। পূৰ্বদিকের জোডা-স্তম্ভের উপবে ছাদটিকে দেখা যাচ্ছে অক্ষত অবস্থায়, অথচ পশ্চিম দিকের ছাদ অনেক অংশে ভেঙে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলি, অজন্তায় আমবা আজ গিয়ে যা দেখি, তাব সঙ্গে ওতপ্রোত্ত-ভাবে মিশে আছে মেবামন্দিব কাছ। আমাব মনে হয়েছে, এভাবে মেবামন্দিব কবানো উচিত



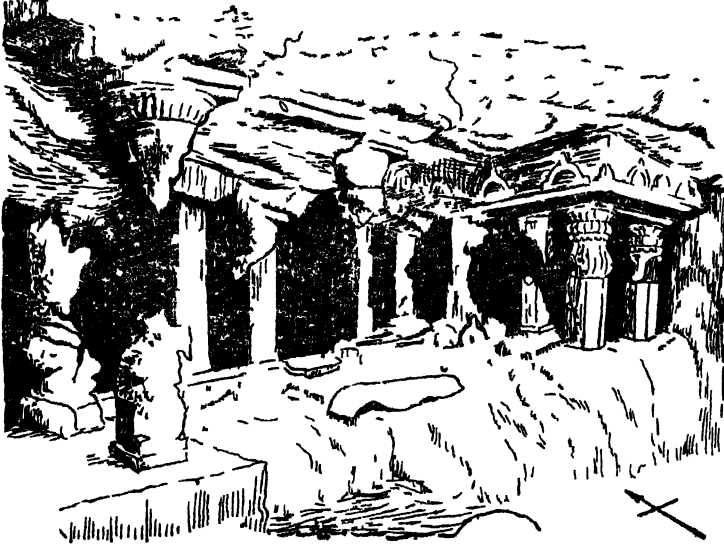
চিত্র—৩৪

সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথ

[ বর্তমান অবস্থা ]

হয় নি। এমনভাবে ভেঙে-পড়া স্থাপত্য-কীর্তিগুলি সাবানো উচিত ছিল, যাতে দর্শক বুঝতে পাবেন কতটুকু অরিজিনাল বা আদিম রূপ, আব কতটুকু বর্তমান যুগের কারিগরি। মেবামন্দি-অংশে সিমেন্ট-গোলা দিয়ে অথবা অত্যন্ত হাল্কা চুনাপাথরের বড় কবে এই পার্থক্যটুকু বজায় রাখা যেত। এই নীতি আর্কিওলজিকাল-বিভাগ চিত্রগুলিব মেবামন্দিব সময় মেনে চলেছেন। প্রাচীর-চিত্রের যে অংশ ভেঙে পড়েছে, সেখানে নূতন কবে জাঁকবাব চেষ্টা করেন নি। সিমেন্টের পলেস্তাবা করে ছেড়ে দিয়েছেন। ভালই কয়েছেন। আমি

খুশী হতুম সেই নীতি ভাঙ্কর্য ও স্থাপত্য-কীর্তিতেও অনুসরণ করা হলে। আমার বক্তব্যটা বুঝিয়ে বলি : চিত্র—৩৪ হচ্ছে আমি অজন্তায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যা দেখেছি তাই, কিন্তু চিত্র—৩৪ দেখলে কি বুঝতে পাবতেন কতটুকু অজন্তা-শিল্পাব কাজ আর এতটুকু এ-যুগের ? না, তা পাবতেন না। এইরকম চিত্র—৩৫-এর দিকে চেয়ে দেখুন। এটি শিল্পী মুকুল দে-এর গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকা। পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঐ প্রবেশ-পথেব যে রূপ তিনি দেখেছিলেন,



চিত্র—৩৫

সপ্তম বিহাবেব প্রবেশ পথ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ( পঞ্চাশ বছর পূর্বেব অবস্থা

তাই দেখতে পাচ্ছি। তিনি অবশ্য এ-কিছলেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। চিত্র—৩৬ ও চিত্র—৩৫ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কতখানি মেবামত করা হয়েছে বুদ্ধগয়াব মূল মন্দিরটি মেবামত করতে গিয়া যে ভুলটি করা হয়েছিল গত শতাব্দীতে, অজন্তাতেও প্রায় সেই জাতীয় ভুল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

অষ্টম বিহাবটি বাস্তা থেকে কিছুটা নিচুতে। ঠিক সংকোচিব ধাবে। দর্শনীয় কিছুই নেই। এটি কিন্তু অজন্তাব অশুভম প্রাচীন গুহা। প্রায় নবম অষ্টম বিহাব চেতোর সময়সাময়িক। ডায়নামোটিকে এখানে বসানো হয়েছে—এখান থেকেই সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়।

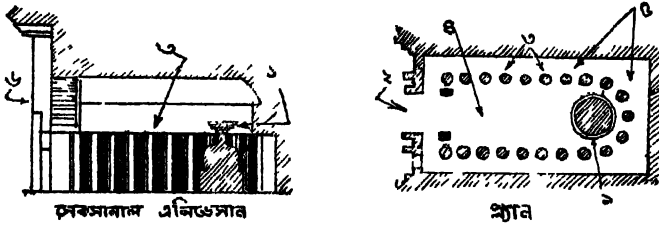
নবম ও দশম গুহা-মন্দির দুটি, আগাই বলেছি, বিহাব নয়—শৈত্য। অর্থাৎ, বৌদ্ধ ঋমণদের আবাস-গৃহ নয়, উপাসনা-মন্দির। এ-দুটি অতি প্রাচীন গুহা-শৈত্য, অজন্তায়।

নবম গুহাটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত, দশমটি সম্ভবতঃ মারও প্রায় একশ বছর আগেকার, বস্তুতঃ অজস্রায় তৈবী প্রথম চৈত্য।

নবম চৈত্যটি দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট, প্রস্থে ও উচ্চতায় ২৩ ফুট। তুলনায় দশম চৈত্যটি অনেক বড় : দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট, প্রস্থে ৪১ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৬ ফুট। চৈত্যগুলির নির্মাণ-কৌশলের

নবম চৈত্য

একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। এর সম্মুখে থাকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত সম্মুখ-ভাগ বা 'ফাসাদ'। প্রবেশ-পথের দ্বারের উপরে থাকে একটি বৃহদায়তন গবাক্ষ। তাকে বলা হয় সূর্য-গবাক্ষ। হল-কামরাটি হয় লম্বাটে ধরনের। দু-পাশে দুই সারি স্তম্ভ, তার মাঝখানে উপাসনা-স্থল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'নেভ' এবং স্তম্ভ ও পর্বত-গাত্রের মাঝখান দিয়ে যে গলিপথ তাকে বলে প্রদক্ষিণ-পথ, ইংরেজিতে বলে 'আইল্'। এই চৈত্যগুলি পবিত্রবান সঙ্গে বোমান 'বাসিলিকা'র আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।



চিত্র—৩৬

নবম চৈত্যের প্যান ও এলিভেসান

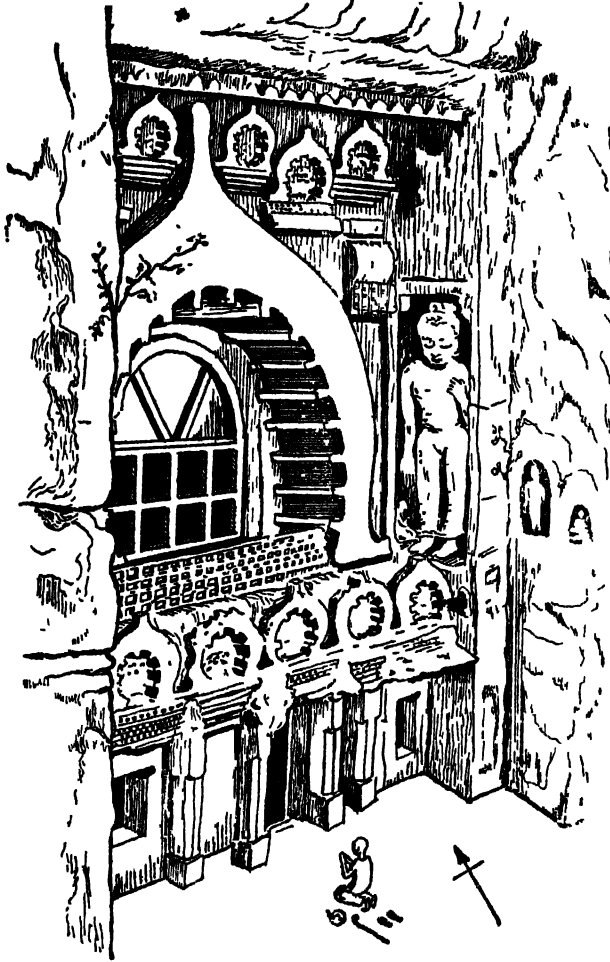
১—স্তূপ, ২—প্রবেশ-পথ, ৩—স্তম্ভ; ৪—উপাসনা-স্থল; ৫—প্রদক্ষিণ-পথ, ৬—সূর্য-গবাক্ষ।

চিত্র—৩৬-এ নবম চৈত্যের প্যান ও সেকসানাল এলিভেসান দেখানো হয়েছে। প্রবেশ-পথের (২) বিপরীত প্রান্তে রয়েছে স্তূপটি (১)। সর্বসমেত ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ উপাসনা-স্থলকে (৪) বিযুক্ত করেছে প্রদক্ষিণ-পথ (৫) থেকে। প্রবেশ-পথের উপরে রয়েছে সূর্য-গবাক্ষটি (৬)। এই ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ ছাড়াও প্রবেশ-পথের দুদিকে দুটি চার-কোণা স্তম্ভ আছে।

নবম গুহার সম্মুখ-দৃশ্য বা 'ফাসাদ'টির স্বরূপ বোঝাবার উদ্দেশ্যে এখানে একটি চিত্র সংযোজিত করা গেল। এই চিত্র- ৩৭ নবম গুহার বাহিবেব পথ থেকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আঁকা।

এখানে সূর্য-গবাক্ষটিকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। সূর্য-গবাক্ষের উপরে ও নিচে ছোট ছোট খিলানগুলিও এই সূর্য-গবাক্ষের অন্তর্করণে খোদিত। প্রবেশ-পথের দু-পাশে দুটি, তারও পাশে আবার দুটি অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। এছাড়া, দুই প্রান্তে দুটি গবাক্ষও আছে। পূর্বদিকের প্রাচীরে দৃশ্যমান বৃহদায়তন বুদ্ধমূর্তি এবং ছোট ছোট যে বুদ্ধমূর্তি দেখছেন, এগুলি পরবর্তী যুগের সংযোজন। কারণ, এই চৈত্যটি হচ্ছে শীনযান যুগের, তখন বুদ্ধমূর্তি

তৈরি করা হত না। হয়তো কয়েক শত বছর পরে এই মূর্তিগুলি খোদাই করে প্রবেশ-পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। চৈত্যের ভিতবে কিছু কিছু চিত্রের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি প্রভৃতি। এগুলিও পরবর্তী যুগের সংযোজন।



চিত্র—৩৭

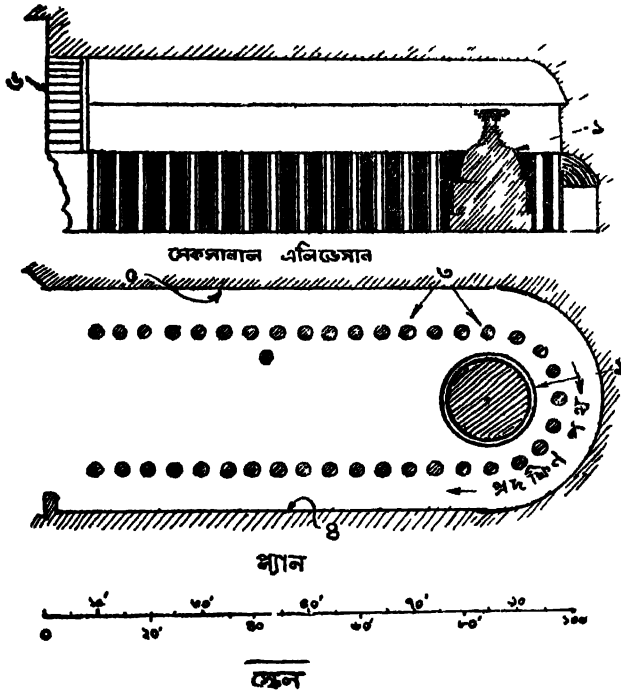
নবম চৈত্যের সম্মুখ-ভাগ বা কানাদ

নবম ও দশম চৈত্যের আলোচনায় ভারতবর্ষে গুহা-চৈত্য নির্মাণের বিবর্তনের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বস্তুতঃ, এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই আলোচনা করি নি। এখনও করব না—সেটি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে। আপাততঃ তাই এ ছুটি চৈত্যে দর্শনীয় যা-কিছু আছে, তাই দেখে যাব আমরা।

দশম গুহা-চৈত্যটি অজস্র প্রাচীনতম চৈত্য, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। আকারে এটি নবম গুহাব তুলনায় বেশ বড়; দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট, প্রস্থে ৪১ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৬ ফুট।

দশম চৈত্য

দশম চৈত্যের শেষপ্রান্ত গোলাকার, নবম চৈত্যের মত কোণ-বিশিষ্ট নয়। ভিতরে সর্বসমেত ৩৯টি আট-কোণা স্তম্ভ। প্রবেশ-পথে নবম গুহায় যেমন দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে, এখানে তেমন কোনও স্তম্ভ নেই। চৈত্যপ্রান্তে দুটি অলঙ্করণ-বর্জিত এবং আকারে বেশ বড়। চিত্র—৩৮-এ দশম চৈত্যের প্ল্যান ও সেক্সানাল এলিভেসান দেওয়া হয়েছে।



চিত্র—৩৮

দশম চৈত্যের প্ল্যান ও এলিভেসান

- ১—স্তম্ভ, ২—প্রবেশ-পথ, ৩- স্তম্ভ, ৪—ছদ্মস্তম্ভ জাতক (চিত্র—৪০ ও ৪১),  
৫—নাগরাজার শোভাযাত্রা (চিত্র—৩৯), ৬—ফুর্ক-গবাক।

দশম চৈত্যে যে চিত্রগুলি আছে, আছে না বলে অবশ্য 'ছিল'ই বলা উচিত—কলা-বিশারদরা তাদের গুহাটি বিভিন্ন যুগের বলে সনাক্ত করেছেন। কিছু চিত্র খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর; বস্তুত: অজস্র প্রাচীনতম চিত্র। আব কিছু পরবর্তী মহাবান যুগের সংযোজন।



প্রথমেই বাম প্রাচীরে নাগরাজার শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য (১০।৫)। সপার্বদ্ নাগরাজ স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন। অজ্ঞস্তায় গিয়ে আপনি এ চিত্র আর দেখতে পাবেন না। না, মহাকালের হস্তক্ষেপ নয়, মানুষের অত্যাচারে। বলছি সে-কথা। আর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল ষড়দন্ত বা হৃদন্ত জাতকের একটি অনবস্থ কাহিনী-চিত্র। এটিও নিঃশেষে অবলুপ্ত। ঐর্ষ্যশীল দর্শক যদি নমুনাচিত্র নিয়ে খুঁজতে থাকেন, তবে অল্প অল্প অংশ হয়তো এখনও দেখতে পাবেন। মেজর গিল, গ্রিফিথ, ইয়াজদানী অথবা লেডি হেরিংহ্যামের গ্রন্থ অত্যন্ত দুঃস্বাপ্য; তাই তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বনে এই ছটি চিত্রের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি এখানে।



চিত্র—৩৯

নাগরাজ। সপরিবারে স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন—দশম শতাব্দী,  
প্রাচীনতম চিত্র অজ্ঞস্তায়। অবস্থান—১০।৫—স্ত্রী: পু: প্রথম শতাব্দী

নাগরাজাব চিত্রটি দেখে কে বলবে, এই চিত্রের মানুষগুলি ছ'হাজার বছর আগেকার যুগের। মনে হয়, দণ্ডকারণ্যেব একদল 'মাড়িয়া' আদিবাসীকে জড়ো করে কেউ বুঝি নাগরাজার স্তূপ-পূজা রঙিন গ্রুপ-ফটো তুলেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। ঐ রকম মোটা রুলি, পুঁতি ও কড়ির মালা, টিকলি, কর্ণাভরণ, শিরস্কাণ,—অমনি ঐনাবৃতবন্ধা নারীর দল আমি যে এই সেদিনও দেখে এসেছি দণ্ডকারণ্যেব 'কোকোমেটার মাড়াই'-এ।

বামদিকের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পিলারের মাঝখানে ছিল শ্যাম জাতকের একটি কাহিনী। এর পরিষ্কার ছটি অংশ ছিল। প্রথমাংশে ছিল বারাণসী-রাজ ধনুকহস্তে শরসন্ধানরত। তাঁর দক্ষিণে একটি অশ্ব, তাঁর পরিধানে খাটো ধুতি। শ্যাম জাতক রাজার অনুচরদলেব হাতেও নানা জাতের আয়ুধ। দ্বিতীয় দৃশ্বে তাঁকা হয়েছিল শ্যামের বুদ্ধ পিতামাতাকে। তাঁদের মুখ বিষাদে ম্লান। পঁচাত্তাণ্ডে পলায়ন-পর একসার হরিণ।

দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল বিবাটাকাব একটি প্রাচীর-চিত্র ( ১০৪ ) । বিষয়-বস্তু বড়দস্ত জাতক । এ চিত্রটিও ইয়াজদানী অবলম্বনে এখানে সন্নিবেশিত করলুম । প্রথমে কাহিনীটা বলে নিই :

পূর্বজন্মে বুদ্ধদেব বড়দস্ত-গজরাজের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামে । তিনি বুদ্ধ নন, বোধিসত্ত্ব । হিমালয়ের পাদদেশে ছিল ছন্দস্ত নামে একটি বিশাল হ্রদ,— নিত্যপদ্ম, নির্মল তার জল । গজরাজের আয়তন ছিল বিশাল । বিরামি হাত উঁচু এবং একশ-বিশ হাত লম্বা এই মহাগজের অধীনে ছিল আট হাজার গজ বড়দস্ত জাতক অনুচর । মহাধার্মিক এই মহামতি গজরাজের ছিল দুই রানী—খুল্ল-সুভদ্রা আর মহা-সুভদ্রা । দুই মহিষীকে গজরাজ সমান স্নেহ করতেন—একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না সমদর্শী এই মহাগজের চরিত্রে । কিন্তু হুর্ভাগ্য এই যে, বড়রানী খুল্ল-সুভদ্রা সব সময় সন্দেহ করতেন যে, গজবাজ কনিষ্ঠা মহিষীকেই বেশী স্নেহ করেন ; তাঁর এ অনুযোগের উত্তরে গজরাজ তাঁকে বাবে বারে বুঝিয়েছেন—এ-জাতীয় ঈর্ষাকাতরতায় মহিষী অহেতুক মনোবেদনায় কষ্ট পান—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ; কিন্তু তবু মাৎসর্য-বিষে জর্জরিতা জ্যেষ্ঠা মহিষীর চেতনা হয় না ।

একদিন পক্ষজ সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে গজরাজ ভীরে উঠবার সময় দেখতে পেলেন ফুল্ল-কুমুমিত একটি অশোকতরু । মহারাজ ক্রীড়াচ্ছলে বুদ্ধের কাণ্ডটি শুনে আলিঙ্গন-বন্ধ করে প্রকম্পিত করলেন । ঝড়ে পড়ল বনকুমুম । কিন্তু দৈবের কী নির্দেশ ! ফুলগুলি সবই বাবে পড়ে কনিষ্ঠা মহিষীর বৃন্তে । আব কিছু গুরু শাখা ভেঙে পড়ে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মাথায় । কলকণ্ঠে হেসে ওঠে গজসখীর দল । অভিমানিনী বড়বানীর ঈর্ষাকাতরতার কথা গোপন ছিল না সখীমহলে—তাই এ নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়ল না ওরা । প্রচণ্ড অপমান-বোধ হল জ্যেষ্ঠা মহিষীর, ছুবন্ত অভিমানে স্থানত্যাগ কবলেন তিনি । ক্ষুব্ধ মহারাজ পিছন থেকে বাবে বাবে তাঁকে ডাকলেন . কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না ।

এই সামান্য হুর্ভটনার পথ বেয়েই এল চরম সর্বনাশ । সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রইলেন গজরাজ, কিন্তু ফিবে এলেন না বড়বানী । যুথবেষ্টনী ভেদ কবে ছরন্ত অভিমানে সেই যে তিনি চলে গেলেন, তারপব থেকেই আব তাঁর সন্ধান নেই । পবদিন থেকে মহারাজ অনুসন্ধান চালালেন । বনে-বনান্তরে অন্বেষণ করতে থাকে অনুচরের দল, কিন্তু মহারানী যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন । শেষকালে স্বয়ং গজরাজ উন্মাদের মত নিজেই নিরুদ্ধিষ্টার অন্বেষণে বেব হয়ে পড়েন । কত মরু-প্রান্তর, কত গহন অবণা অতিক্রম কবে এলেন তিনি—কিন্তু নিরুদ্ধিষ্টার কোন সন্ধান পেলেন না ।

দুঃখে অনুশোচনায় গজবাজ শয্যা নিলেন ।

দীর্ঘদিন পরে মহারাজের এক বিশ্বস্ত অনুচর ফিরে এল মহাবানীর সংবাদ নিয়ে । রাজমহিষী হিমালয়ের এক গহন অরণ্যে গিয়ে তপস্বী করেছিলেন ।

গজরাজ সোৎসাহে বলে ওঠেন, তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ ?

অধোবদনে অম্লচর বলে, না মহারাজ—যে সব নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করেন, তাঁদের কাছেই সন্ধান পেয়েছি আমি। তাঁদের শরণ নিয়েছিলেন মহারানী। তাঁদের নির্দেশেই কঠিন তপস্চর্যা করে সেই হিমশীতল রাজ্যেই তিনি দেহ রেখেছেন।

ষড়দন্ত-গজরাজের ছুঁচোখে নেমে আসে ছুটি জলের ধারা।

মহামন্ত্রী প্রশ্ন করেন, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তিনি ?

অম্লচর বলে, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারলাম না মহামন্ত্রী। যে সন্ন্যাসীর কাছে মহারানীব সংবাদ পাই, তিনি বলেছিলেন—শেষ তপস্যায় রাজমহিষী সাফলালাভ করেছিলেন। তাঁর ইষ্টদেব এসে তাঁকে বরদানও কবে যান, অথচ—

—অথচ কি ?

—অথচ তিনি তো আজ জীবিতা নেই! কেমন করে প্রার্থনা পূরণ হবে তাঁর ?

গজরাজ এতক্ষণে প্রশ্ন করেন, কী বর প্রার্থনা করেছিলেন খুল্ল-সুভদ্রা ?

অম্লচর অধোবদনে নিরুত্তর থাকে।

গজরাজ সহাস্ত্রে বলেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? মহারানী আমার উপব প্রতিশোধ নেবার বর প্রার্থনা করেছিলেন, এই তো ?

অধোবদনেই অম্লচর প্রত্যুত্তর কবে—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

কনিষ্ঠা মহিষী ভীত সচকিতকণ্ঠে বলেন—ভাগ্যে তিনি জীবিতা নেই। না হলে—

বাধা দিয়ে গজরাজ বলেন—দেবতার আশীর্বাদ তা সর্ব্বোৎকর্ষে ফলবে মহা-সুভদ্রা!

তাঁর মনস্কামনা নিশ্চয় হবে না!

কনিষ্ঠা মহিষী সবিস্ময়ে বলেন—কেমন কবে মহারাজ ?

গজরাজ সে কথাব উত্তর দেন না, যান তাসেন শুধু।

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অচিরেই উপলব্ধি কবলেন কনিষ্ঠা মহিষী। গজরাজের যেন কী হয়েছে—আহার-বিহাব কোন কিছুতেই তার মন নেই। সমস্ত দিন তিনি অগ্নমনে কি যেন চিন্তা করেন। মিথ্যা অভিমানে জোষ্ঠা মহিষী যে তাঁকে অপদস্থ কবে চলে গেছেন, এ-কথা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বোধিসত্ত্ব মহাবাজ। তিনি যেন সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছেন। এ অপমান সহ্য করতে পারছেন না তিনি। যিনি ছুই সহধর্মিণীর প্রতিই সাম্য-দৃষ্টি বাঞ্ছতে পারেন না, তিনি কেমন কবে যাবতীয় প্রজাসাধারণকে সমদৃষ্টিতে দেখবেন ? যেন এই কথাটাই ভাসতে থাকে সকলের মুখে—যেন তারা সমীচবোধে এ-কথাটা উচ্চারণ করে না শুধু তাঁর সম্মুখে।

দিন দিন ক্ষয়িত হতে থাকে মহাগজের বিশাল দেহ। শেষে রাজ্যভার যোগ্যতম গজের হস্তে সমর্পণ করে তিনিও চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে। জোষ্ঠা মহিষীর মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রইল না—ষড়দন্ত-গজরাজের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল।

ক্রমে কনিষ্ঠা মহিষী মহা-মুভক্তাও গত হলেন—একে একে বিদায় নিলেন সংসার থেকে মহারাজের অন্ত্যস্ত বিশ্বস্ত অমুচরের দল। শুধু মহাস্থবির বৃদ্ধ গজরাজের যেন মৃত্যু নেই। সামান্য কয়েকজন অমুচবসমেত তিনি হিমালয়েব এক নিভৃত্তম কন্দবে শেষজীবন যাপন কবতে থাকেন।

একদিন সায়াহ্নকালে সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে মহাগজ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন—মনে মনে বলছেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি প্রভু? মুক্তিব দিন কি আমার আজও আসে নি?

ইঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি প্রচণ্ড শব্দঘাত হল। যন্ত্রণায় কাতব হয়ে গজবাজ পশ্চাৎ ফিরে দেখেন, একজন ধানুকী তীব্র দাঁড়িয়ে তাঁকে শব্দস্বাক্ষর কবছে। বাধা দিলেন না মহাবাজ। মুহূর্মুহু শব্দবাণে তাঁকে বিদ্ধ করল শিকারী। তারপর সে বিশ্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

গজরাজ ওকে ক্রান্ত হতে দেখে বলেন—তুমি কি চাও বন্ধু? এভাবে আমাকে ক্রমাগত শরবিদ্ধ কবছ কেন?

স্তম্ভিত শিকারী এ-কথায় এগিয়ে এসে বলে, আমি আপনাব ঐ প্রকাণ্ড ছুটি দাঁত নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম। আপনাকে যে বিষ-মিশ্রিত বাণে আঘাত কবেছি, তাতে যে-কোন হস্তীব মৃত্যু হওয়াব কথা, অথচ—

গজবাজ হেসে বলেন, আমাকে বধ কববাব মত বাণ তো তোমাব হৃগীবে নেই বন্ধু। তা তুমি আমাব দাঁতগুলি চাও তো নিয়ে যাও না। এস. কাছ এস—উৎপাটন কব আমাব গজদন্ত, আমি কিছু বলব না।

সাহসে ভব কবে শিকারী সদলবলে এগিয়ে আসে। বহু আয়াসেও কিন্তু তাব উৎপাটিত কবতে পাবে না গজবাজের মহাদন্ত।

তখন গজবাজ বলেন—বেশ, তুমি অপেক্ষা কব, আমি স্বয়ং এই ছুটি গজদন্ত উৎপাটিত কবে দিচ্ছি। দন্ত-উৎপাটনমাত্র আমাব মৃত্যু হবে। সেজ্ঞা খেদ নেই, কিন্তু আমাব এ দাঁতগুলি তোমাব কি কাজে লাগবে ভাই?

শিকারী বৃকতে পারে ইনি সামান্য গজ নন। সে তখন যুক্তকবে নিবেদন কবে—মহাশয়, আপনি আমাব উপব কষ্ট হবেন না। আমি আজ্ঞাবহমাত্র। আমি মহামহিম কাশীবাজের যুগয়াধিপতি, আমার নাম সোমুত্তর। আমাদের মহাবানী স্বপ্ন দেখেছেন যে, হিমালয়েব এক নিভৃত্ত কন্দবে এক মহাগজ আছেন—যাঁর ছুটি বিবাটাকার গজদন্ত আছে। মহাবানীব শব্দ, তিনি সেই গজদন্ত-নির্মিত পালঙ্কে শয়ন কববেন। তাই বাজাদেশে শত-সহস্র শিকারী সমস্ত হিমাচলখণ্ডে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। আজ দৈবক্রমে আমি আপনাব সাক্ষাৎ পেয়েই বুঝেছি যে, মহারানী আপনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

গজবাজ সে-কথা শুনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি বললেন, তোমার উপব আমি কষ্ট হই নি যুগয়াধিপতি সোমুত্তর। আমি স্বয়ং আমার ছুটি

গজদন্ত উৎপাটিত করে দিচ্ছি। এ ঘটনা কেন ঘটেছে, তা ধ্যানে উপলব্ধি করেছি আমি। এ দৈবনির্দেশ। আমার এই দাঁত কয়টি তুমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের রাজমহিষীকে দিও, আর তাঁকে বলো—এগুলি তাঁকে উপহার দিয়েছি আমি। আরও বলো, পূর্বজন্মে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মস্তকে শুষ্ক অরণ্যশাখা নিক্ষেপ করি নি।

বসন্তঃ, দন্ত-উৎপাটনমাত্র গজরাজের মৃত্যু হল।

সুবর্ণ পাত্রে ঐ অমূল্য গজদন্তগুলি নিয়ে সোমুত্তর উপনীত হল বারাণসীতে। মহারানীর প্রার্থিত গজদন্ত এসেছে শুনে আনন্দের হিন্দোল বয়ে গেল রাজপুরীতে। বাহকের দল গজদন্তগুলি নিয়ে এল রাজাস্তম্ভপুরে। কিন্তু সেগুলি দর্শনমাত্র শিউরে উঠলেন কাশীরাজ-মহিষী।

পূর্ব জন্ম-স্মৃতি মনে পড়ে গেছে তাঁর। সেই অনিন্দ্যসুন্দর গজদন্তগুলি দর্শনমাত্র কাশীরাজ-মহিষী উপলব্ধি করেছেন যে, পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ঐ গজরাজের প্রধানা মহিষী। মনে পড়ে গেল তাঁর প্রতিশোধ প্রার্থনার কথা! মনে পড়ে গেল ষড়দন্ত-গজরাজের প্রণয় কথা!

মহাগজের অস্তিম ভাষণ শুনে মহারানী মুর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

সে মুর্ছা তাঁর আর ভাঙল না। ক্ষোভে হুঃখে মহারানীও প্রাণত্যাগ করলেন।

এ কাহিনী শুধু দশম গুহাতেই নয়, সপ্তদশ গুহাতেও আছে। দশম গুহাতে এই জাতক-কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্রগাথা ছিল, তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

কেমন করে জানেন? গত দেড়শ-দু'শ বছরে নানান জাতের মানুষ এসেছে অজস্রায় এবং এই চিত্রপটের উপর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজেদের নাম খোদাই করে গেছে। অসংখ্য স্বাক্ষরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে ষড়দন্ত-গজরাজেব এই অপূর্ব চিত্রগুলি! অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে অসংখ্য স্বাক্ষরের ভিতর থেকে মনে হয়, যেন অল্প অল্প চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মহাগজের বিশাল দেহে যেমন সহস্র বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছিল শিকারী, এখানেও যেন তেমনি মহাচিত্রের গায়ে সহস্র বিষাক্ত স্বাক্ষর নিক্ষেপ করেছে অযুতযাত্রী। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু দেবনাগরি, ইংরেজি, উর্দু এবং দাক্ষিণাত্যের দুর্বোধ্য ভাষায় দর্শকদের নাম আর নাম! বিষ-জর্জরিত গজরাজ যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করেছিলেন মাত্র, তাতে তাঁর মৃত্যু হয় নি। সভ্য দুনিয়ার স্বাক্ষরবাজ মানুষের বিষের স্বাক্ষরেও তেমনি বিষ-জর্জরিত হয়েছে মহান শিল্পীর শিল্পকর্ম। কিন্তু তার মৃত্যু নেই! বার্জেস আর গ্রিফিথের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী চিত্রটি অমর হয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারে! ছুপ্রাপ্য সে চিত্র সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। তাঁদের এই গ্রন্থকারের অক্ষম প্রচেষ্টাতেই সম্ভট থাকতে হবে।

এ-চিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল এসেছিল আমার, শুধু একমাত্র সাস্ত্রনা স্বাক্ষরের সে হরিহরছত্র-মেলায় 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'র সন্ধান পাই নি আমি!

চিত্র—৪০ এবং চিত্র—৪১-এর ফ্রেস্কোটি নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। এটি বস্তুতঃ অজস্মার একটি প্রাচীনতম চিত্র। ফলে, এটির বিশ্বাস নিয়ে বিশদভাবে যদি আলোচনা করি, তবে পরবর্তী যুগে শিল্পী কিভাবে কাহিনী-চিত্রের বিশ্বাস করেছেন, তা বুঝতে সুবিধা হবে।

কাহিনীটি আমরা জেনেছি। চিত্রটি বাস্তবে অবলুপ্ত হলেও, প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে আমরা দেখতেও পাচ্ছি। আমি তো এটিকে এইভাবে সাজাতে চাই—

প্রথম দৃশ্য—সর্বদক্ষিণে (প্যানেল—১)। দেখছি, কাশীরাজ-মহিষী অভিমান করেছেন, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি। সম্মুখে কাশীরাজ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—যেমন কবে হোক, স্বপ্নদৃষ্ট গজদন্ত এনে উপহার দেবেন রানীকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য তার বামে (প্যানেল—২)। মহারাজ সিংহাসনে আসীন। তাঁর মাথার উপর রাজছত্র। সম্মুখে যুক্তকবে মুগয়াধিপতি সোমুত্তর ও তার সহকারী। শিকারীদ্বয়কে মহারাজ ষড়দন্ত-হস্তীর সন্ধানে ব্রতী হতে বলছেন। রাজার দক্ষিণে রাজমহিষী উপবিষ্টা।

তৃতীয় দৃশ্য সর্বদক্ষিণে (প্যানেল—৩)। বিশালায়তন দৃশ্যপট। ষড়দন্ত-গজবাজ হিমালয়ে বিচরণ করছেন। তাঁর চতুর্দিকে হস্তিশূখ। সোমুত্তর ধনুকহস্তে গজরাজকে নিরীক্ষণ করছে।

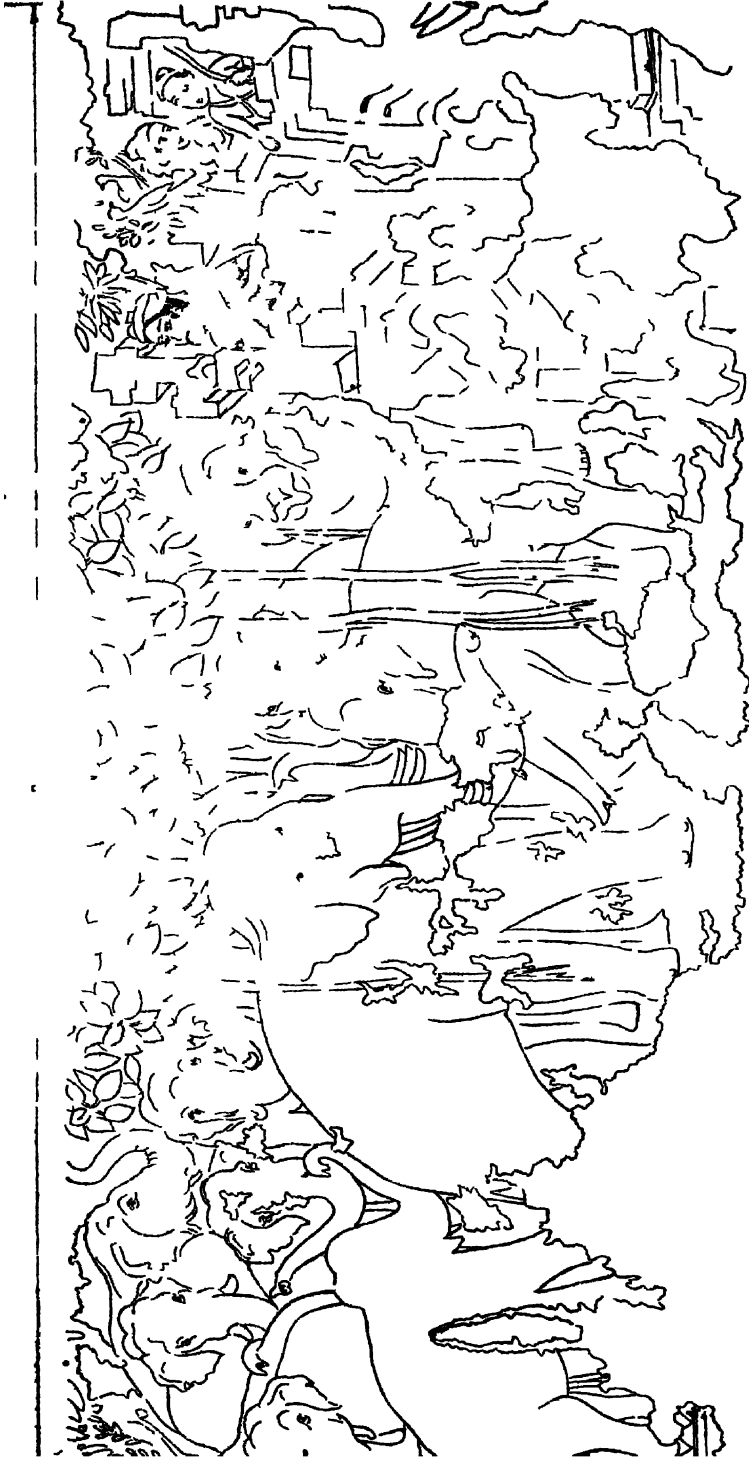
চতুর্থ ও শেষ দৃশ্য কেন্দ্রস্থলে (প্যানেল—৪)। শিকারী বাহনদণ্ডে গজদন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে কাশীরাজের অন্তঃপুরে। মহারানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি মুর্ছাহত। তাঁর পতনোন্মুখ দেহটি ধরতে যাচ্ছেন কাশীরাজ।

এভাবে যদি আমরা কাহিনীটিকে সাজাই, তাহলে বলতে হবে কাশীরাজ-মহিষীর পূর্বজন্মেব ইতিকথা, অর্থাৎ, খুল্ল-সুভদ্রা-মহা-সুভদ্রা-কাহিনী আছে নেপথ্যে। গ্রীক্ষিত বলেছেন, সে অংশটুকুও ছিল। তার অল্প অল্প আভাস তিনি দেখেছিলেন।

এখন স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এভাবে কাহিনী-চিত্রটি সাজানো হল কেন? কালা-মুক্তমিকভাবে সাজালে প্যানেল—৪টি সর্ববামে আসা উচিত ছিল। তাহলেই দর্শকের পক্ষে কাহিনী-চিত্রটি বোঝা সহজ হত। এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পাই, তাহলে হয়তো পরবর্তী যুগের কাহিনী-চিত্রগুলি এইভাবে বিশ্বাসের একটা অর্থ পাওয়া যাবে।

একটা যুক্তি মনে আসছে।

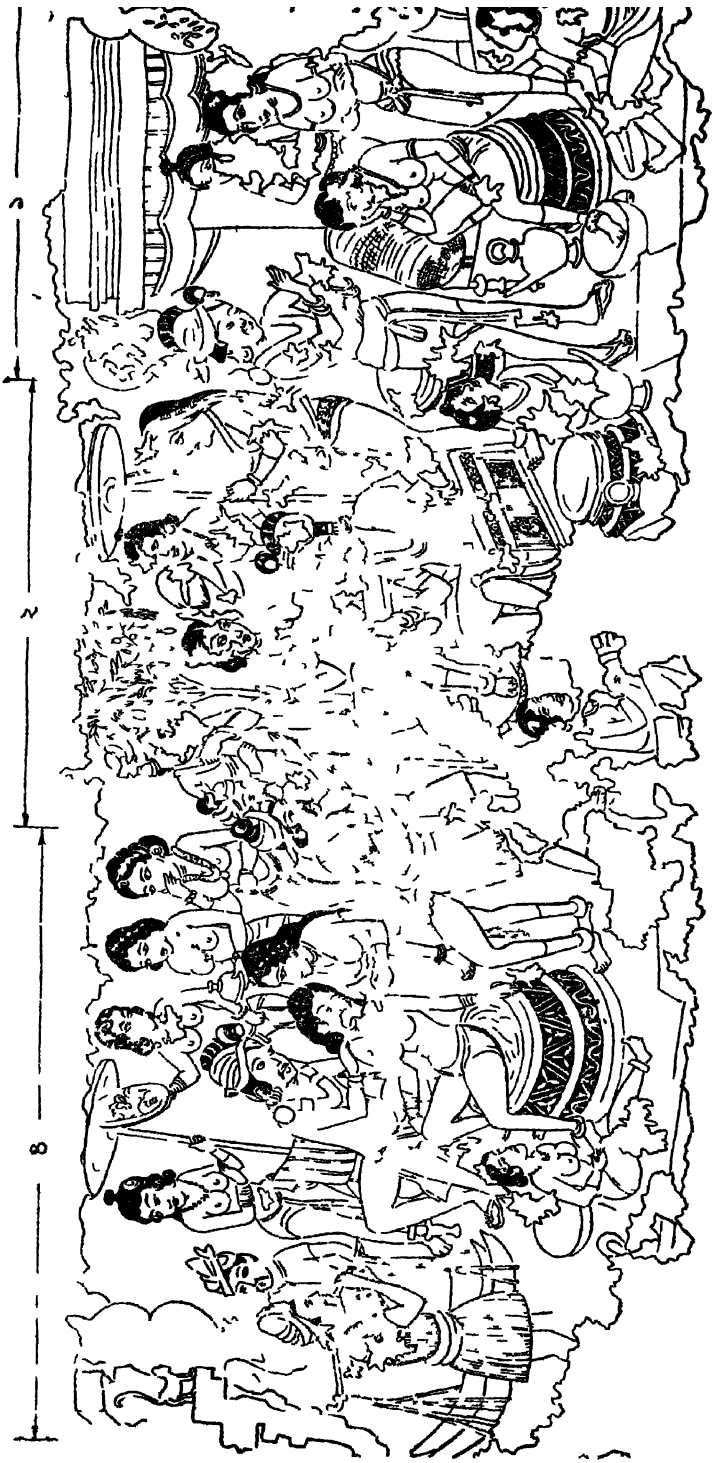
কাব্য বা নাটকে আখ্যানভাগ ক্রমে ক্রমে পাঠক বা দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা যায়। তাই কবিতা বা নাটকের চরম দৃশ্য বা ক্লাইম্যাক্সের স্থান হয় শেষ দৃশ্যে। কারণ, সেটাই রসোপলব্ধির যবনিকা এবং সেই শেষ স্মৃতিটুকু মনে নিয়েই রসপিপাসু ক্ষান্ত দেয়। ফ্রেস্কোতে কিন্তু তা নয়—এখানে সমস্ত দৃশ্যপট একই সঙ্গে একই কালে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করতে বাধ্য হন শিল্পী। ফলে, স্বতঃই এখানেই কেন্দ্রস্থলটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেখানেই ক্লাইম্যাক্সের স্থান। প্রতিসাম্যমূলক চিত্রে যেমনমূল



চিত্র ৬০

ছাত্র জাতক কাহিনী চিত্র [ পৃ. ২৫৩ ]

অবস্থান— ০৬



চিত্র-৪১

হৃদয় জাতক বাহিনী চিত্র [ দশম স্ক্রল ]

মুদ্রণ-১০০



ফিগরটি কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপিত করে তার চারপাশে অস্বাভাবিক ফিগর আঁকা হয়, এখানেও তেমনি শিল্পী মূল দৃশ্যটি কেন্দ্রস্থলে ঐক্যে অস্বাভাবিক দৃশ্যপট দু-পাশে সাজিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বাবাগঙ্গী-রানীই মূল্য এ কাহিনীই চরম দৃশ্য। তাই তাকে কেন্দ্রস্থলে ঐক্যেই শিল্পী।

যুক্তিটা এক্ষেত্রে বেশ খাপ খেয়ে গেল বলে আশ্বাসস্তম্ভ হওয়ার কোন কারণ নেই। কাব্যে এই সূত্রটি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, নন্দের ধর্মান্তর-গ্রহণ চিত্র-কাহিনীতে (ষোড়শ গুহা) কাহিনীই শ্রেষ্ঠ খণ্ডচিত্র তথা ক্লাইমাক্স মরণাহতা রাজকন্য়ার চিত্রটি। কিন্তু সেটি ফ্রেস্কোর কেন্দ্রস্থলে নেই; একেবারে সর্বপ্রথমে অবস্থিত। কেন?

সে যাই হোক, এই চিত্রগুলি থেকে দ্বি-সহস্র বর্ষের পূর্বেকার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক-কিছু ধারণা করতে পারি আমরা। তিনটি ঘড়া ও সিংহাসনের নকশা লক্ষ্য করবার মত। কমণ্ডলু ও গাড়ুর মাঝামাঝি আকারের যে ছটি জলপাত্র আছে, তাও লক্ষণীয়। কাশীবাজারের পায়ে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যে যে চপ্পল জোড়া দেখছি, সে-জাতীয় হাওয়ারই চপ্পল আজও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় দৃশ্যে হস্তিযুগের চিত্র তো অনবদ্য। হস্তীর সঙ্গে কদলীবৃক্ষের কথাটা স্বতঃই মনে আসে; শিল্পী কিন্তু তার পরিবর্তে বুর-নামা বটগাছের চিত্র ঐক্যেছেন। বিশালায়তন বটবৃক্ষের সঙ্গে কি গজরাজের তুলনা করতে চান শিল্পী?

কাশীবাজার, মহিষা ও শিকারী—এদের প্রত্যেককে শিল্পী তিনবার করে ঐক্যেছেন। বিশেষ লক্ষণীয়, তিনবারই প্রত্যেককে একই বেশে একই সাজ-সজ্জায় আঁকা হয়েছে। এ তিনটি চিত্র যে একই মানুষের, তা মুখাকৃতি দেখে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়—অস্বাভাবিক চরিত্রগুলির মতো মোট সাদৃশ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ—প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে পদসেবিকার মুখাকৃতিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেটুকু অমিল দেখছেন, তা গ্রন্থকারের আঁকার দোষে—মূল চিত্রে তা নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, উত্তরসাধকরা বিশ্বাস্তর, মহাজনক, বিপূর বা জুজুকার আলেখ্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে আঁকার সময়েও কেমন কবে ফটোগ্রাফ-স্মলভ নিভুলতায় একই মুখের ছবি ঐক্যেছেন।

এবার এ ফ্রেস্কোর যতি-চিহ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম দৃশ্যে অভিমাত্র-হঁতা মহারানীই কেন্দ্রচিত্র। ফলে, সকলেই তাঁর দিকে ফিরে আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বাজাস্তম্ভপূর্বে নয়, প্রকাশ্যে দরবার। ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ও কাল বদলেছে। অথচ ছটি দৃশ্যের মাঝখানে কোন যতি-চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র মুখ-ফেবানোর ভঙ্গিমায় এই আদিম শিল্পী দৃশ্যান্তরে আসতে পেরেছেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের মাঝখানেও কোন সুস্পষ্ট যতি-চিহ্ন নেই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে যথাক্রমে মহাবাজ ও মহারানী মূল কেন্দ্রচিত্র। তাঁদের দিকে অস্বাভাবিক ফিগর যে ভাবে মুখ ফিরিয়েছে, তাতে আমরা অনায়াসেই বুঝে নিতে পারছি, কোথায় দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হয়েছে এবং চতুর্থ দৃশ্য শুরু হয়েছে। চতুর্থ ও তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে কিন্তু একটি সুস্পষ্ট যতি-চিহ্ন আছে।

উজ্জ্বল-লাজুল হুম্মানটি যে প্রাসাদের কার্নিশে বসে আছে, তার একটি ভাঙা প্রাচীর সেই যতি-চিহ্ন। তৃতীয় দৃশ্যে বটগাছের ঝুরিগুলি যতি-চিহ্ন নয়—তারা হস্তীর বৃহদায়তন শরীরের রেখার একধেরেমি দূর কবছে মাত্র।



কোন একটি মহান শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি ভাঙা জানা থাকার দরকার। দেশ-কালেব কোন অবস্থায় বিচার্য শিল্পবস্তুটি নিমিত্ত হয়েছিল, কী তার পশ্চাৎপট এবং কী তার পবিবেশ তা জানা না থাকলে, শিল্পকর্মটির স্বরূপ ভ্রমদযস্ক্রম কবা যায় না। অজন্তা-গুহাব মুগাাযনের জন্ম তাই গুহা-মন্দিরের কম-বিনতনের একটি আলোচনা এ গ্রন্থে অপবিহার্য হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, অজন্তাব স্থাপত্য এক বিশেষ জাতের স্থাপত্য, যাকে “গুহা-স্থাপত্য” (Cave Architecture) বলা যেতে পারে। পার্বত্যিক গুহায় প্রাচীর খোদাই করে, অথবা শ্রেফ পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহা বানিয়ে তাকে স্প, স্থল, প্ৰসান ইত্যাদি ব্যপায়িত কবাই এ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের ৫-৬শতাব্দী পর্যন্ত প্রথম শুরু হয়। প্রায় সমসময়ে বর্তমান বিহার প্ৰদেশে যে প্ৰকার স্থাপত্য স্থাপন কবা হয়েছিল। সেগুলি -

বরাবর পর্বতে... চাবটি সুদামা, কর্ণকৌপন, লোমশগাঘি ও বিশ্ব গোপাডি।

গয়া থেকে উনিশ মাইল উত্তরে।

নাগার্জুন পর্বতে তিনটি গোপিকা, বহুজিকা ও বর্দলিকা।

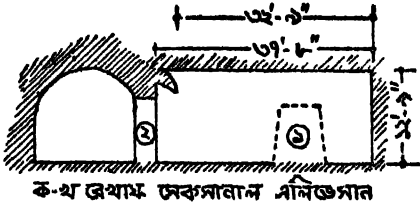
বাবর থেকে আধ মাইল উত্তরে

সীতামাবিতে একটি সীতামারি। গয়া থেকে পঁচিশ মাইল পূর্বে অথবা বাজগীর থেকে তেব মাইল দক্ষিণে।

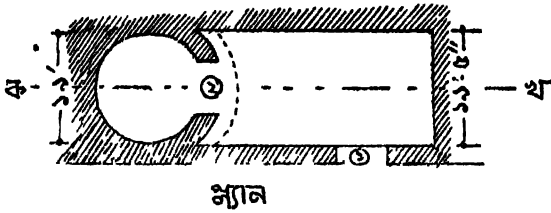
এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে সুদামা। চিত্র—৪২-এ এই আদিমতম গুহা-মন্দিরের স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য কবে দেখুন, গুহাব ভিতরে গর্ভগৃহের ছাদটি কেমন ছায়া (eave) বাব কবে খোদাই কবা হয়েছে। খড়ের বা টিনের চালাঘবে আমবা যে ধরনের ছায়া বা ঈভ বার কবি, ঠিক যেন তেমন দেখতে ওটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মাটকোঠায় আমরা ছায়া বানাই কেন? যাতে ছাদ থেকে বৃষ্টির জলটা দেওয়াল বেয়ে না নামে, সেইজন্মই তো? কিন্তু এক্ষেত্রে দেওয়াল তো পাহাড়ের গা! তাছাড়া,

গর্ভগুহাটি তেঁ আবার গুহার ভিতব । ফলে, বৃষ্টির জলেব তেঁ কোন প্রস্রাই এখানে উঠছে না । তাহলে ?

তাঁব কারণ এই যে, যে সব আদিম কাঁবিগব এই প্রথম গুহা-মন্দিবটি খনন কবেছিল, তাঁরা তখনও পাতল চাল আঁব মাটির দেওয়ালব কথা ভুলতে পাঁবে নি । তাঁদেব হাত কাজ



কবেছে পাঁথনেব উপব, কিন্তু চিহ্নাবাবাব তাঁবা তখনও বয়েছে না তাঁর মগে । ফলে, গুহাব ভিতব পাঁথরেব দেওয়ালেও তাঁবা ছাঁ বাঁনিবে যাঁছে না তাঁদেব কাঁলেব অভ্যাসনে ।



চিত্র—৪১

পাণ্ডিত্যে তাঁদেব ব্রহ্মি গুহা, শশাক-নির্ভ

গুহা-পদব ব, , মণ পদমিঁব প্রবেশে ।

প্রথম যুগেব এই গাটটি গুহা মন্দিবনে মবেবে বেনমান লৌশকাঁযি প্রবেশ-পাথেও তেঁ কিছুটা বাঁককাঁর্ষ—অগ্নাগুহালি এবেবাবে অলঙ্গন বর্জি । বিদ্ব তাঁবকাঁর্ষ না থাকলে কি হবে, গুহা-মন্দিবগুলিব অভ্যন্তরভাগ ঠিক মণোক মস্তেব মত ত বখাম্ব বকমে মসুণ ।

প্রথম যুগেব এই গাটটি ব্রহ্মি গুহাকে গুহকর দেও হাজে বস্ত্রত মিনটি কাঁবে । প্রথমত, এগুলি আঁদিনতন ব্রহ্মি গুহা, মণাক পদবো মণেব তন দ মশ-মাপতা ও গুহা-ভাস্কর্ষেব—ভাজা, নামিক, খজম্বা এলাবা, ঠি তাঁটে ও ঠি আঁদি-ডনক । দ্বিতীয়তঃ, কাঁঠি ও খডেব যুগেব পাঁথরে মণে ভাবতাঁয স্তাণে-শিামেব বেবনেই প্রথম পদমেপ । তৃতীয়তঃ, সম্রাট অশোকো ব্যক্তগত চিহ্নসব একা দিক এবা এদ্যাটিত কবে দিছে—সম্রাটেব আদেশে ও মণা নিমিত্ত এ গুহা-মন্দিবগুলি, অজ্ঞাাঁক মণেখন জৈন ( বৌদ্ধ নয ) সম্রাসীদেব সাবন-স্থল হিমাবেকি পনন কবা মেযজিল । বৌদ্ধ ধমেব ধাবক প্রিয়দর্শী অশোকেব উদাবতাব সাক্ষী এবা ।

নাগার্জন পর্বতে গোপিকা-গুহাটি অবশ্য সম্রাট অশোকেব আমলে নির্মিত নয । অশোক-পৌত্র সম্রাট দশবথের আদেশে সেটি খোঁদিত । আকাঁবে, সেটি অপেক্ষাকৃত বড --৪৪.ফুট লম্বা, প্রস্থে কিন্তু সেই ১১ ফুট ।

এব পরই দেখতে পাচ্ছি, নাসিককে কেন্দ্র করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় একদল বৌদ্ধ শ্রমণ পাহাড়েব বৃকে গুহা-মন্দির খনন শুরু করেছেন একাধিক স্তানে। সেগুলির আকাব, আয়তন, রচনাশৈলী প্রায় একই বকমের। এগুলি সবই উপাসনা-গৃহ বা চৈত্য।

সম্ভবতঃ, এখন থেকে আমবা 'গুহা-মন্দির' শব্দটির পবিবর্তে গুহা-চৈত্য ও গুহা-বিহার শব্দ দুটি ব্যবহার কবব। কাবণ, এই সময় থেকে গুহা-মন্দির খননেব কাজ ঐ দুটি নির্দিষ্ট ধারণা বহিঃী শুরু কবে। সমবেত উপাসনাব জন্য খোদিত হত চৈত্য এবং বৌদ্ধ শ্রমণদেব আবাস সিংগাবে তৈরি কব তত বিহার। বিহাবেব কথা পবে বলছি। প্রথমে গুহা-চৈত্যেব কথা বণ।

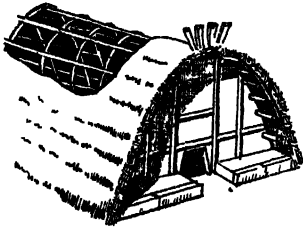
নাসিককে কেন্দ্র করে 'বিন-গাবণ' নগরবে ভিতবে যে চৈত্যগুলি খোদিত হয়েছিল.

সেখানেবে কাণাণ্ডন মিক ভাবে দুটি ভাগে ভাগ কবতে পারি।

১। চৈত্য  
 ঐপূব দ্বিতীয় শতকেব ভাগে ভাজা, কনডেন, পিঠালকোবা এবং অজন্তাবে দশম গুহা। খ্রীষ্টপূব পঞ্চম শতকে বেদশ্য, অজন্তাবে নবম গুহা, নাসিক ও কার্ণে। এছাড়াও, আবণ্ড শতখানেক বছাবে ভিতবে তৈরি হয়েছিল জুলাবে দুটি এবং কাংহুবিতে একটি চৈত্য। এদেব মশো প বাবে বৃহত্তম হজে কার্ণে এবং ক্ষুদ্রতম হজে নাসিকেব পাণ্ডলেনা চৈত্য। চৈত্যগুলিবে আকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। সবগুলিই অজন্তাবে দশম চৈত্যেব (চিত্র-৩৮) মত। লম্বাটে একটা হলু-কামবা, তাতে ছুদিকে এই সারি স্তম্ভ এবং শেষপ্রান্ত পাহাড়েব গায়ে অর্ধ-গোলাকৃতি কবে খোদাই-কবা। সেই 'পছন্দদিকেব গোলাকৃতি অংশবে কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হত স্তম্ভটিকে। 'বসানো হত' বজাটা অবশ্য ঠিক বাকবণসঙ্গত হলে না। কাণ, স্তম্ভটিকে বাইবে থেকে এনে বসানো হয় নি আদপেই, গোঁধে তোনাও হয় নি। পাহাড় খনন কববার সময়ে ঐ অংশটা বাদ দিয়ে খনন কবা হয়েছে এবং পবে সেই অংশটিকে হেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোদাই কবে স্তম্ভেব আকাব দেওয়া হয়েছে। ঠিক এইভাবেই এসেছে স্তম্ভগুলি।

এই দশটি উদাহরণেব মবে একমাত্র অজন্তাবে নবম গুহাবে শেষপ্রান্তটি চৌকোণা, গম্ভাণ্ড সবগুলি গুহাবে শেষপ্রান্ত গর্ধ-গানার্কান এই আদিম গুহা-চৈত্যগুলিবে আবণ্ড কয়েকটি বেশিষ্টা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, গুহা ছাদে কাঠেব কড়ি-ববগাবে আকাবে পাথর খোদাই কবা হয়েছে। ছাদেব ভানবতনেব কাজে এ-জাতীয় বীম-ববগাবে কোনও প্রয়োজন ছিল না, ও শুধু অলঙ্করণ। এছাড়া, শিল্পীবে বোধ কবি পূর্ব-যুগেব অভ্যাসটা তখনও ত্যাগ কবতে পাবেব নি। চিত্র-৪৩ থেকে চিত্র-৪৮-এ আমবা গুহা-চৈত্যেব সম্মুখ-দৃশ্য কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা দেখাবেব প্রয়াস পেয়েছি। চিত্র-৪৩-এ টোতা-কুটিরবে ছাদেব খড় কিছুটা সবিয়ে আমবা ভিতবে কাঠেব কাজটা দেখাবেব সুযোগ কবে দিয়েছি। সব কয়টি গুহা-চৈত্যেই ঐ জাতীয় কৃত্রিম বীম-ববগা বা বাফটার-পার্গিন খোদাই কবা আছে। চিত্র-৭৬-এ উনবিংশ গুহা-চৈত্যেব অভ্যন্তরভাগ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এছাড়া, চিত্র-৪৩ থেকে চিত্র-৭৭-এ সব কয়টি গুহা-চৈত্যেব প্রবেশ-পথেই ববগা বা পার্গিনেব

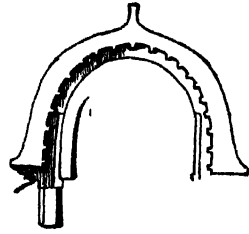
প্রাপ্তদেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে শুষ্কগুলি জমি থেকে ঠিক খাড়াভাবে ওঠে নি। কাঠের খুটি যেমন বাঁকা করে ঠেঁ শেওয়া হয় ( পার্শ্বগ প বা side thrust-এর প্রতিবিধান করতে ), সেইভাবে বাঁকা করে বসানো। লোমশখাষি প্রবেশপথে ( চিত্র—৪৪ ) এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ-পথের উপরে একটি গবাক্ষ তৈরি করা হত, যাকে বলে “মূষ-গবাক্ষ”।



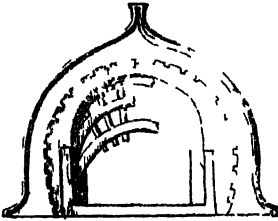
চিত্র - ৪৩



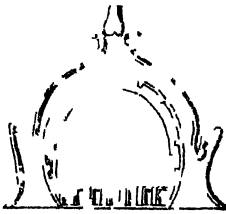
চিত্র—৪৪



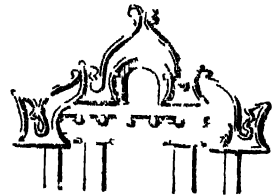
চিত্র—৪৫



চিত্র ৪৬



চিত্র—৪৭



চিত্র ৪৮

গুহা-চত্বর কণা এই পদস্থ পোষক বস্তু হইয়া বিহাবের কথা। চত্বর মত বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস-স্থল এই বিহাবগুলির একটা সাবাদিসম্মত কণা আছে। অজস্রায় ত্রিংশতি, অষ্টান, দ্বাদশ ও একদশ বিহাব হচ্ছে প্রাচীনতম। এগুলি গুহাপুত্র কালের এবং হীনযান বৌদ্ধ যুগের। এগুলিতে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন স্তম্ভ নেই। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রস্থলে সঙ্গম বয়েকটি ছোট ছোট খুপরি বা গর্ভগুহা আছে। এই গর্ভগুহাগুলির উপরে মূষ-গবাক্ষের মতকণে কয়েকটি জানালার প্রতীক। এগুলি কিন্তু সত্যিকারের গবাক্ষ নয়- আলো-স্রাবণা যাওয়ার পথ নয়, এ শুধু অলঙ্কার। চতুর্থতঃ, এই প্রাচীনতম বিহাবে কোন স্তম্ভ নেই। বুদ্ধমূর্তি থাকার প্রমাণও ওঠে না, যেহেতু এগুলি হীনযান যুগের। পঞ্চমতঃ, বিহাবের ভিত্তির পাথরের খোদাই-করা শয়নের উপযুক্ত আসন বা বেদী আছে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা হীনযানী বৌদ্ধ শ্রমণদের জীবনযাত্রাব কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রথমতঃ, তাঁরা চৈত্যা-গুহাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন—তাই আদিম গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে নানাবকম অলঙ্করণেব প্রচেষ্টা করা সন্দেহও নিজেদের আবাস-স্থল বিহারগুলির প্রবেশ-পথে কোনবকম অলঙ্করণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, হীনযানী শ্রমণেব দল মূর্তিপূজা অথবা প্রতীক পূজাবে চেয়ে ‘শীল’ ও ‘বিনয়’-এব উপবেই বেশ জোব দিতেন। তাঁ বিহারে ভূপের কোন অস্তিত্ব নেই। তৃতীয়তঃ, অনুমান করতে পারি, সাধারণ শ্রমণবা মাঝেব হলু-কামবায় নৈশ বিশ্রাম করতেন এব অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শ্রেণীব অর্হতেবা ঐ ছোট ছোট খুপরিগুলিতে বাস কবতেন। চতুর্থতঃ হীনযানী যুগেব প্রস্তুব-শয়্যা পববর্তী যুগেব বিহাবে দেখতে না পাওয়াব কাবণ হিসাবে অনুমান কবছি, পববর্তী যুগে কাঠেব তৈবী চৌকি ব্যবহাবে কবা হত।

মহাযান যুগেই অজন্তাবে অধিকাংশ বিহার নির্মিত। কালানুক্রমিকভাবে আমরা তাদের চাবটি ভাগে ভাগ কবতে পারি :

প্রথম পর্ব : ৪০০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ গুহা নং ৬, ৭, ১৫, ১৬ ও ১৭

দ্বিতীয় পর্ব : ৫০০—৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ১৮, (১৯) ও ২০

তৃতীয় পর্ব : ৫৫০—৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ২১, ২২ ও ২৩

চতুর্থ পর্ব : ৬০০—৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ গুহা নং ১—৫, ১৪, ২৪, ২৫ (২৬), ২৭, ২৮, (২৯)

বন্ধনীব ভিতবে উল্লিখিত অর্থাৎ গুহা নং ১৯, ২৬ ও ২৯ অবশ্য বিহাবে নহ, চৈত্যা

সময়-কাল বোঝাবাবে জ্ঞান এগুলি উল্লেখ কবেছি।

এগুলি গুপ্ত ও চালুক্য বাজবংশেব শাসনকালে নির্মিত। বেশ বোঝা যায়, আদিম পবিকল্পনাকাবেব স্থান-নিবাচন এতই সাফল্যমণ্ডিত হযেছিল যে, ধীবে ধীবে অজন্তাতেই অধিকসংখ্যক শ্রমণ এসে বসবাস কবতে শুরু কবেন। ফলে, অজন্তাবে দশম চৈত্যেব সমসময়ে অথবা পূববর্তী কালে অশ্রুত যেসব গুহা-চৈত্যা নির্মিত হযেছিল—যথা ভাজা, কার্লে, নাসিক প্রভৃতি—সেগুলিতে সম্প্রসারণেব প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয নি, যতট হযেছিল অজন্তাবে। তাই ক্রমাগত একটিব পব একটি বিহাবে অজন্তাবে বানাতে হযেছে নবীন আগন্তুকদেব স্থান দিতে। আবাবে যখন দেখা গেল, নবীন আগন্তুকদেব আব পূর্বেকার উপাসনা-চৈত্যা স্থান হছে না, তখন নূতন চৈত্যাও তৈরি কবতে হযেছে। এভাবেই আদিম শিল্পীর দশম চৈত্যা-স্নাত অজন্তা ছদিকে ছু-বাছ প্রসারিত করে মহিমময়-রূপে ক্রমে সম্পূর্ণ পাহাড়টাকেই আলিঙ্গনবদ্ধ কবেছে।

হীনযান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা<sup>১</sup> ছিলেন বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গী। তাঁরা ধ্যান করতেন, তপস্বী কবতেন, চারিত্রিক শীলতার দিকে ছিল তাঁদের প্রখর দৃষ্টি। বোধ করি, প্রাতে ও সন্ধ্যাবে তাঁরা সমবেত হতেন চৈত্যা-গুহাবে। সমবেতকর্তে প্রার্থনা করতেন এবং তাবপব নিজ নিজ বিহাবেবাসে ফিবে এসে ধ্যানে বসতেন। কিন্তু মহাযানী ভিক্ষুরা ক্রমে হযে

(১) পরিশিষ্ট ত্রুটাবে

পড়লেন ভক্তি-মার্গের পথিক। তাঁরা ধর্মাচরণের সময় বুদ্ধমূর্তির পূজা করতে ইচ্ছুক। তাই বারে বারে, দিনের মধ্যে অনেক বার তাঁদের যেতে হত চৈত্যে—সুপমূলে পূজা, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য দান করতে। কলে, সমস্ত দিবারাত্রই চৈত্যে লেগে থাকত ভীড়। এই অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ‘জম্মই বোধ করি বিহারেও সুপ তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিহারেই যদি পূজার ব্যবস্থা করা অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহলে সুপ কেন, একেবারে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরি করলেই হয়। তাতে তো আর বাধা নেই এখন। তাই দেখছি, মহাশয়ানী যুগে বিহারের দূরতম প্রান্তে একটি গর্ভমন্দির তৈরি করে তাতে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিপূজা অনুমোদনযোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ চিন্তাধারায় নানান দেব-দেবীর অনুপ্রবেশও ঘটল। তৈরি হল জম্মলের মূর্তি, হারিতীর মূর্তি—দেওয়ালে চিত্রিত হল শক্র, ব্রহ্মা প্রভৃতির আলোখা।

শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থানে চৈত্য-সুপের গায়েও বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছিল—যেমন দেখতে পাই কাহ্নুরিতে। কিন্তু এর কনভার্স ধিয়োরেমটা অনুমোদিত হল না। অর্থাৎ, মহাশয়ানী যুগে চৈত্যে সুপের গায়ে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হল বটে, কিন্তু বিহারে বুদ্ধমূর্তির বদলে সুপ তৈরি হল না। প্রসঙ্গত, বালি, এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই নাগিকের তিন নং গুহায়। এটিকে বলা হয় ‘গৌতমীপুত্র বিহার’। এটি একেবারে হীনযান যুগের, কিন্তু এই বিহারে একটি সুপ খোদাই করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমটির পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। ঐ গৌতমীপুত্র বিহারে বাস করতেন ভিক্ষুণীরা। মহিলাদের পক্ষে বারে বারে বাসস্থান ত্যাগ করে চৈত্যে যাওয়া অসুবিধাজনক হতে পারে মনে করেই প্রধান অর্থাৎ গৌতমীপুত্র বিহারে একটি সুপ নির্মাণের বিশেষ অনুমতি দিবেছিলেন।

চিত্র—৪৪ থেকে চিত্র—৪৮-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে কি ভাবে ক্রমশঃ অলঙ্করণের বাহুলা এসেছে। অজন্তার বিভিন্ন যুগে খোদাই-করা স্তম্ভগুলিকে লক্ষ্য করলেও আমরা দেখব, প্রথম যুগের সরল অনাড়ম্বর স্তম্ভ কেমনভাবে ক্রমশঃ নানা

স্তম্ভ

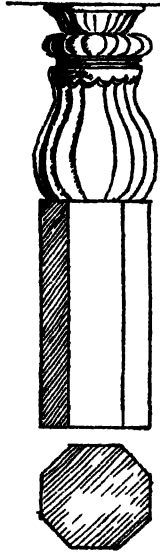
অলঙ্করণে বিভূষিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, অজন্তার কোন স্তম্ভই ভারবাহী নয়। ছাদের অথবা কোনও বীমের ওজন তারা বহন করছেন না। স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেললেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। অজন্তায় প্রাচীনতম স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি নবম ও দশম গুহায়। এগুলি আট-কোণা এবং জম্মি থেকে অল্প বাঁকা হয়ে উঠেছে (চিত্র—৪৯)। পরবর্তী যুগের একটি স্তম্ভের চিত্র সপ্তম গুহা থেকে সংকলিত হয়েছে চিত্র—৫০-এ। এখানে দেখছি, অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট নিম্নাংশের উপর সুন্দর একটি ‘ঘট-পল্লব’ এবং তার উপর একটি ‘আমলক’ বসানো আছে। আমলকটি যেন পল-তোলা একটি আমলকী ফল। অজন্তায় এ-জাতীয় অলঙ্করণ এসেছে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে। ষোড়শ গুহাতে ছ-তিন রকমের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি, সপ্তদশ গুহাতেও তাই। আদিম আট-কোণা স্তম্ভও আছে, আবার নানান জাতের অলঙ্করণ-সম্বলিত স্তম্ভও

আছে। চিত্র—৫১-এ ষোড়শ বিহারের একটি বিশেষ জাতের স্তম্ভের সেক্সানাল প্র্যাক্স, এলিভেশনে ও স্কেচ সংযোজন করা গেল। তাতে পরিষ্কার চারটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠ। (ii) তার উপরে আট-কোণা দ্বিতীয় অংশ, সেখানে অমরাবতীর অনুকরণে আলিম্পন-নকশা। (iii) তার উপরে ষোল-কোণা-বিশিষ্ট স্তম্ভের মধ্যদেশ, যার উপরে আবার ঐ অমরাবতী-নকশা। (iv) সবার উপরে চতুষ্কোণ এ্যাবাকাস, অলঙ্করণ বর্জিত।



চিত্র—৪৯

অজ্ঞতার প্রাচীনতম স্তম্ভ  
(নবম ও দশম শতাব্দী)



চিত্র—৫০

সপ্তম গুহার প্রবেশ-পথের স্তম্ভ  
(দ্বিতীয় যুগ)



চিত্র—৫১

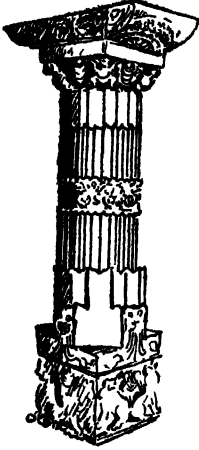
ষোড়শ-বিহারের অভ্যন্তরীণ স্তম্ভ  
(তৃতীয় যুগ)

সপ্তদশ বিহারটিও প্রায় ঐ একই সময়ে নির্মিত। সেখানকার একটি বিশেষ জাতের চিত্র এখানে দেওয়া গেল। এটিকে আমরা উপরি-বর্ণিত স্তম্ভের পরিবর্তন বলতে পারি (চিত্র—৫২)। এখানে দেখছি, পর্বেকার উদাহরণের চারটি অংশকে বাড়িয়ে সবসময়ে ছটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠটি এবার মোটেই অলঙ্করণ-বর্জিত নয়। (ii) তার উপরের অংশে কিছুটা চতুষ্কোণ এবং কিছুটা আট-কোণা। তাতে আবার রাক্ষসের মুখের নকশা। (iii) মধ্যদেশের ষোল-কোণা-বিশিষ্ট অংশের মাঝামাঝি আছে একটি বাজুবন্ধ ধরনের নকশা। এতে লম্বাটে মধ্যদেশের একঘেরেমি দূর হয়েছে। (iv) তার উপরে আবার একটি আট-কোণা অংশ। (v) শীর্ষদেশের এ্যাবাকাস, সেখানে ক্ষুদ্রকায়-বোমনখতি। (vi) সর্বোচ্চ ত্র্যাকোটাটো নূতন ধরনের।

সপ্তদশ গুহার নদানু জাতের স্তম্ভ আছে। তার ভিতর একটিমাত্র এখানে আলোচিত হল। পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র—৫৩) গ্রহণ করা হয়েছে উনিবিংশতি

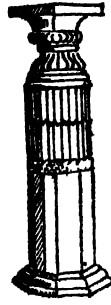


চৈত্যের প্রবেশ-পথ থেকে। চিত্র—৭৬-এ এই সম্পূর্ণ কাশাদটিকে দেখানো হয়েছে। সেখানে প্রবেশ-মুখের ছটিকে এই স্তম্ভ ছটিকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। এবার দেখছি, বৈচিত্র্য-সন্ধানী অজন্তা-শিল্পী আর চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডে পাদপীঠ তৈরি করতে রাজী নন। পাদপীঠটি এবার আট কোণা এবং তাতে তিন-সারি ধাপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ সঙ্কীর্ণ, উপরের দিকে ঘট-পল্লবের আধখানামাত্র খোদাই করা হয়েছে। আমলকটিকেও খাবার আমদানি করা হয়েছে।



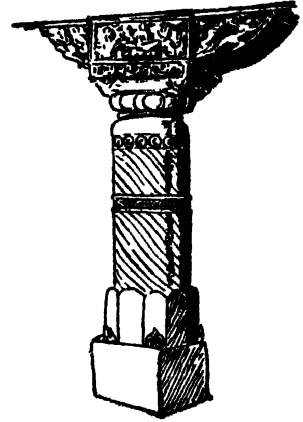
চিত্র—৫২

সপ্তদশ বিধাবে অভ্যন্তরে  
( তৃতীয় যুগ )



চিত্র—৫৩

ঊনবিংশতি চৈত্যের কাশাদে  
অবস্থিত স্তম্ভ ( চতুর্থ যুগ )



চিত্র—৫৪

প্রথম বিধারের অলিন্দে অবস্থিত  
( শেষ যুগ )

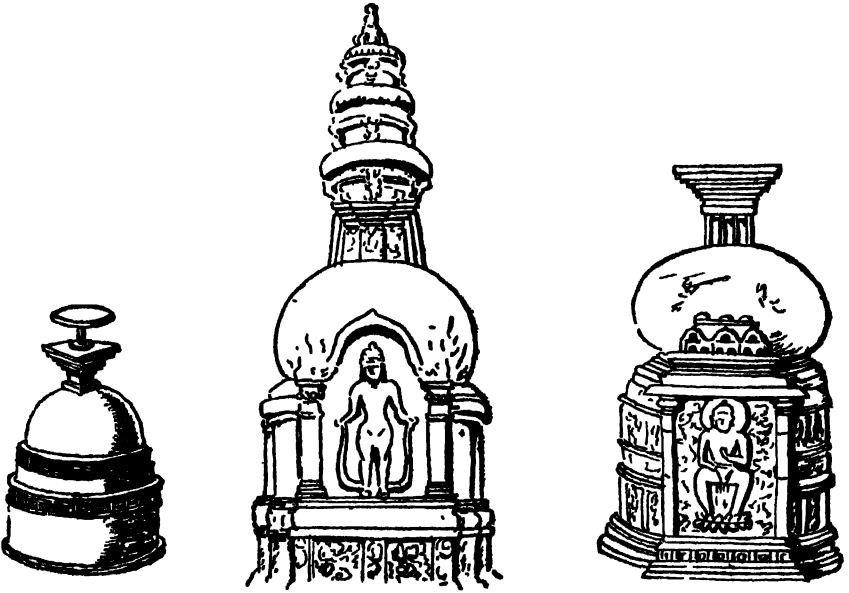
শেষ উদাহরণটি প্রথম গুহা-মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দা থেকে নেওয়া ( চিত্র—৫৪ )।

স্তম্ভের বিষয়ে আলোচনা ঐ পর্যন্ত। এবার আমরা স্তম্ভের বিষয়ে আলোচনা করব। অজন্তায় স্তম্ভ আছে চারটি। সেগুলি আছে এখানকার চারটি চৈত্যের প্রত্যক্ষদেশে ;—নবম, দশম, ঊনবিংশতিতম ও ষড়বিংশতিতম চৈত্যে। নবম ও দশম চৈত্যের স্তম্ভ হীনযানী-যুগের অলঙ্করণ-বর্জিত। নাসিক, ভাজা, কার্লে প্রভৃতি চৈত্যের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য পকট। দশম গুহার স্তম্ভের একটি ভাটিকাল সেক্ষান চিত্র—৩৮-এ আমরা দেখেছি। এখানে চিত্র—৫৫-তে কার্লে-চৈত্যের একটি নকশা সংযোজিত হইল হুলনা করলেই বোঝা যাবে, ছটির সৌসাদৃশ্য কতখানি।

ঊনবিংশতিতম চৈত্যের স্তম্ভটি অনেক পরে তৈরী—মহাযান যুগে। এখানে দেখছি ( চিত্র—৫৬ ), সেই আদিম সরল স্তম্ভ আর নেই। নানান রকম অলঙ্করণে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। পাদপীঠে নানারকম পল-তোলা নকশা খোদাই করা হয়েছে। মধ্যভাগে ছটি ছোট স্তম্ভও খোদাই করা হয়েছে। মাঝখানে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। অণ্ডটি গোলাকৃতি; তার সম্মুখভাগে অজন্তার বিশেষ জাতের খিলানের নিচে যেন একটি কুলুঙ্গি—

তাতে আছে একটি বুদ্ধমূর্তি। কার্লে স্তূপে অণ্ডের উপর কর্বেলিঙ-করা যে অংশটা আছে, তাকে বলে হর্মিকা ; বর্তমান উদাহরণেও সেই কর্বেলিঙ-করা হর্মিকার আদিম রূপটি আছে অবিকৃত। তার উপর রচিত হয়েছে তিনটি ছত্র, যাকে বলে ছত্রাবলী। আরও লক্ষণীয়, ছত্রাবলীর উপরে আছে একটি অংশ, ক্ষুদ্রায়তন একটি আমলক, যা নাকি ইতিপূর্বে কোথাও দেখি নি।

ষড়বিংশতিতম চৈত্যে স্তূপটির সঙ্গে (চিত্র—৫৭) পূর্বোক্ত স্তূপের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্যও কম নয়। এবারে দেখছি, পাদপীঠ বা মেধির আপেক্ষিক উচ্চতা অনেকটা কম। পূর্বোক্ত স্তূপে জমি থেকে খাড়া হয়ে উপরে-ওঠা রেখার প্রাবল্য ছিল। এবারে দেখছি, জমির সমান্তরাল সরলরেখার সংখ্যাও কম নয়। তার কারণ, ঊনবিংশতিতম



চিত্র—৫৫

চিত্র—৫৬

চিত্র—৫৭

কার্লে চৈত্যের স্তূপ খ্রী: পূ: ১ম শতাব্দী ঊনবিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ ষড়বিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ স্তূপের গঠনটি এমন, যেন উচ্চতার দিকেই আমাদের নজরটা টানে। তাই অধিকাংশ রেখাই মাটি থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেছে (চিত্র—৫৬)। অপরূপক্ষে, ষড়বিংশতিতম চৈত্যে স্তূপটির আকার এমন, যেন সেটি উচ্চতা ও প্রস্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়; তাই সেখানে জমি থেকে খাড়া ও জমির সমান্তরাল রেখাগুলি ভারসাম্য রক্ষা করে রচিত। তাই বুদ্ধমূর্তির উপর এবার আর খিলান নেই, জমির সমান্তরাল লিন্টেল খোদাই করা হয়েছে। এই লিন্টেলের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি তিনটি অজস্তা-খিলান—সেই ত্রিবিকার প্রতীক। অণ্ডটিও অনেকটা চাপা। কিন্তু হর্মিকার সেই খাঁজ-বার-করা কর্বেলিঙ, সেই নিচের থাকের চেয়ে উপরের থাকের বেশি ঝুঁকে

ধাকার প্রাচীন কায়দাটা আছে অব্যাহত। সেই আদিম কালের অঙ্ককরণ। এখানে বুদ্ধমূর্তিটি দেখছি ধর্মচক্রমুজায়।

লক্ষ্য করে দেখুন, ঊনবিংশতম শতাব্দীর স্তূপটির সামগ্রিক কপটা হচ্ছে মোচার মত (কনিকাল)। তলার দিকে মোটা, উপরদিকে ক্রমশঃ সূচালো। পাদপীঠের তুলনায় স্তূপের সামগ্রিক উচ্চতাটা বেশি। তাই অজস্তার ভাস্কর এখানে বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি গোদাই করেছেন। তাই তাঁর দুই হাত থেকে মালার আকারে দুটি বস্ত্রখণ্ড নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দেখুন, বুদ্ধমূর্তিটি স্তূপের সামগ্রিক আকৃতির সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা।

এবার দেখুন, ঊর্ধ্ববিংশত শতাব্দীর স্তূপটিকে (চিত্র—৫৭)। এখানে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট। কলে, মূর্তির প্রস্থ ও উচ্চতা স্তূপের সামগ্রিক কপের সঙ্গে আবার এক সুরে বাঁধা হয়েছে। কারণ, এ স্তূপটি প্রস্থের তুলনায় সূচালো নয়। বুদ্ধমূর্তির তিনটি ভাগ—তলায় পাপাড়ি-ভরা পদ্ম, মাঝখানে তথাগতের দেহাবয়ব, উপরে গোলাকৃতি জ্যোতিঃপ্রভা বা ছটা। সমগ্র স্তূপটিরও তলায় পল-তোলা পাদপীঠ বা মেদিকা, মাঝখানে লিটেল পর্যন্ত মধ্যাংশ এবং উপরে গোলাকৃতি অণ্ড। যেন দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পী বলতে চাইছেন—হে তীর্থযাত্রী, অনুধাবন কর, স্তূপ ও বুদ্ধদেব অভিন্ন।

অজস্তা প্রদক্ষিণ-পথে দশম শতাব্দী থেকে পথ হারিয়ে আমরা এতক্ষণ ভারতীয় স্থপতির ইতিহাস-রাজ্যে বিচরণ করছিলাম। এতক্ষণে আবার আমরা অজস্তা-শতাব্দীরাজ্যে ফিরে এসে বাদবাকি শিল্প-নিদর্শনগুলি দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

দশমের পরে একাদশ শতাব্দী। এটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাসি ব্রাউনের মতে, এটিও যথেষ্ট প্রাচীন—হীনযান যুগের শেষ পর্যায়ে অথবা মহাযান যুগের উষা মুহূর্তে এটির নির্মাণ শুরু হয়। তিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে এর খনন-কার্য আরম্ভ করা হয়। অথচ অজ্ঞান্য গ্রন্থে দেখছি এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত।

বিহারটি ৩৭ ফুট লম্বা, ২৮ ফুট চওড়া এবং উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। সম্মুখস্থ অলিন্দের স্তম্ভগুলিতে দেখছি চতুষ্কোণ পাদপীঠ, আট-কোণা মধ্যাংশ এবং চওড়া শীর্ষপীঠ। বিহারের ছাদে নানান জাতের জ্যামিতিক নকশা আর ফুল-লতা-পাতা আঁকা। অলিন্দের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে বুদ্ধদেবের একটি চিত্র—তার দু-পাশে দুটি বোধিসত্ত্ব। অলিন্দ থেকে বিহারে প্রবেশের জন্তু নির্মিত দ্বারের বামদিকে, ভিতরের দিকে সুন্দর একটি বোধিসত্ত্বের আলেক্য। তাঁর হাতে সেই লীলাপদ্ম—তিনি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি রমণী অর্ঘ্য দান করছে—তার ভিতর একটি নারীচিত্র নিখুঁতভাবে আঁকা।

একাদশ বিহারেও দেখলুম সেই চার হরিণের একমাথার শিল্প-চাতুর্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলুম এই যে, দূরতম প্রান্তে বুদ্ধমূর্তির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ আছে—যা নাকি অজ্ঞ কোন বিহারে নেই।

আগেই বলেছি, এ গুহাটির কাল-নির্ণয় নিয়ে মতানৈক্য ঘটেছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। পার্সি ব্রাউন সাহেবের গ্রন্থটি পূর্বে প্রকাশিত। ফলে, অনুমান করছি, পরবর্তী গ্রন্থকাবরা পরবর্তী গবেষণার ফলাফলপাই এটিকে পঞ্চম শতাব্দীতে চিহ্নিত করেছেন। আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টে এ-সব গবেষণার ফলাফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, সহজলভ্য রিপোর্ট থেকে আমি তা বুঝতে পারি নি। সংস্কার দর্শক হিসাবে আমার তো মনে হয়েছে পার্সি ব্রাউন সাহেবের যুক্তি একেবারে উর্ডায়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এই একাদশ গুহাতেও দেখছি নাসিকের সম্মুখভাগে সেই প্রস্তর-শয্যা—যা নাসিক 'ব্রহ্মশক্তি, অষ্টম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিহারের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত পঞ্চদশ, ষোড়শ বা সপ্তদশে তো তা নেই। তাই আমার মনে হয়েছে, এ গুহা-বিহারটি মহাযান যুগের উষাকালেই প্রথম খনন করা শুরু হয়েছিল—যদিও গর্ভমন্দিরস্থ প্রদক্ষিণ-পথসম্মেত বুদ্ধমূর্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অনেক পরের যুগের যোজনা। অবশ্য বিশেষজ্ঞের নির্দেশে আমার এ নিছক আন্দাজ সম্মত বলে প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহার কথা আমরা আগেই বলেছি। পঞ্চদশ গুহার বৈশিষ্ট্য  
 দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহার কথা আমরা আগেই বলেছি। পঞ্চদশ গুহার বৈশিষ্ট্য  
 হল এই যে এটি তিনতলীয় যুগের না হওয়া সত্ত্বেও এতে কোনও  
 চিত্রাঙ্কন বিহীন মূর্তি

এর সব আমরা ফ্রেস্কো-সমৃদ্ধ ষোড়শ বিহারে পদার্পণ করতে পারি।

এই ষোড়শ বিহারের প্রবেশ-পথে দুটি অপর ভাস্কর্যের নিদর্শন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হল নাগরাজা ও নাগবানী দ্বিতীয়টি হল বিশালাযতন দুটি নতজানু হস্তিমূর্তি। প্রবেশ-পথে বলা অবশ্য ঠিক হল না। যে সমতল পথে বাগোডা নদীর চক্রাবর্তনেব সমান্তরালে অজন্ম-গুহাগুলিকে সংযুক্ত কবেছে, সেই পথ থেকে ষোড়শ বিহারে প্রবেশ করতে হলে আবার কতকগুলি সোপান অতিক্রম কবে আসতে হয়। সেই সোপান-শ্রেণীর প্রথম ধাপের কাছে আছে যুগল হস্তী, মধ্যপথে বা ল্যাণ্ডিং আছে নাগরাজা ও রানীর মূর্তি।

নাগ-দম্পতির মূর্তি একটি কুলঙ্গির মধ্যে খোদিত। বসে আছেন দুজনে একটি প্রস্তরাসনে। রাজার বামপদ প্রলম্বিত, বামহস্তে দেহভার সংরক্ষিত। দক্ষিণহস্তটি ভেঙে গেছে। নাগরানীর মুখটি ঈষৎ কেমনো, তিনি যেন সোপানবাহী যাত্রীদের দেখছেন। রাজার দক্ষিণে একজন চামরধারিণী। রাজার মাথায় বিরাটাকার নাগের কণা। কুলঙ্গির উপাংশে দুটি স্তম্ভ -গোলাকৃতি, কোন পাদপীঠ নেই, কিন্তু শীর্ষপীঠে মঞ্জলকলস ও আমলক আছে।

দ্বিতীয় মূর্তি অর্থাৎ নতজানু যুগল হস্তিমূর্তির বিষয়ে মহম্মদ ইসমাইল সাহেব আমাদের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে মহম্মদ মীর্জা ইসমাইলের পরিচয়টা আপনাদের জানাতে হয়।

(১) 'বক্রেশ্বর একানে বড়ো' নামে একটি ভ্রম কাহিনী বেশ পরিষ্কার একবার লিখেছিলাম। তাতে এ ভাণ্ডার একটি কল্পিত নাম ব্যবহার করার আমাকে পরে বিব্রত হতে হয়েছিল 'বক্র-শব্দ' ত বর্ণিত করেকটি চরিত্র সম্বন্ধেও আমায় কাছে বহু প্রশ্নের গ্রন্থটিণ তাই সবিস্ময় বলে রাখতে চাই—এ নামটি কল্পিত বাস্তবে গীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ঠাকুর বাতে সনাক্ত করা না যাবে তাই তার নাম কপে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটাইনি।

অজন্তায় পৌছে গুহা-মন্দিরগুলির অবস্থান দেখাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি সাইট-প্ল্যান আঁকবার চেষ্টা করি। আমার সে প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এ গ্রন্থের চিত্র -১। গাইড বইতে অজন্তার ম্যাপ নেই।

অজন্তার বিষয়ে একটি চিত্র-বহুল মোটা বই<sup>১</sup> সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্তর টাকা দাম। তাতে অজন্তার কোন ম্যাপ নেই। ইয়াজদানী সাহেবের চার খণ্ডে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থে ম্যাপ আছে, কিন্তু উত্তর-নির্দেশক রেখাটি নেই। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে লেডি হেরিংহাম-সঙ্কলিত যে গ্রন্থটি আছে, তাতেও অজন্তার প্ল্যান পাই নি। সে প্রাচীন গ্রন্থে প্রথম দশটি পৃষ্ঠাই নেই। আমার সঙ্গে এছাড়া ছিল ভারতীয় স্থাপত্যের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু মুশাকল এই খে, সে বইতে প্র্যানে খে উত্তর-নির্দেশক রেখা আছে, আমার কম্পাস বলছে সেটা দক্ষিণ দিক<sup>২</sup>। সূর্য তখন মধ্যর উপর। উত্তর দিকটা সনাক্ত করতে পারছি না। ফলে, রীতিমত মুশাকলে পড়াম সূর্য-গবাক্ষের অবস্থানের সঙ্গে উত্তর নির্দেশক রেখাটির নির্বিড় সম্পর্ক—ওটা না হলে চলবে না। জরীপের কাজে বড়বার বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ এভাবে নস্যাৎ করে নি কখনও আমার দীর্ঘদিনের সহচর এই ছোট কম্পাসটি।

শেষ পর্যন্ত কম্পাসটি হাতে নিয়ে হাজির হলাম আ'ক'ওলজিকাল বিভাগের অফিসে অর্থাৎ টিকিট-ঘরে। অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—মাপ করবেন, আপনাদের এখানে উত্তর দিক কোনটা ?

ভদ্রলোক হেসে বলেন—এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনি নি। আপনার হাতে কম্পাস, আর আপনি উত্তর দিক খুঁজতে এই অফিসের ভিতরে এসেছেন ?

আমি বলি, কিন্তু মুশাকল কি জানেন, কম্পাস ছাড়াও আমার হাতে রয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যের উপরে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বইটি মেলে ধরি ওঁর সামনে।

ভদ্রলোক অবাক হলেন। অফিসের আলমারি থেকে ওঁর নিজস্ব বইটি বার করে দেখে বলেন—আশ্চর্য, এটা তো এতদিন নজরে পড়ে নি।

এই সূত্রে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে বলেন—আচ্ছা, আপনার একটা সুবখা করে দিই। ডা. ইয়াজদানীর একজন রক্ত ছাত্র এখনও এখানে আছেন। নিজাম সরকারে পুরাতত্ত্ব-বিভাগে চাকরি করতেন, ডা. ইয়াজদানীর শিষ্য হিসাবে দীর্ঘদিন এই গুহা-মন্দিরে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। অবসর নেবার পরও অজন্তা ছেড়ে যেতে পারেন নি। তিনকূলে তাঁর কেউ নেই। এই গুহার আকর্ষণে ডনি এখানেই পড়ে আছেন, এখন গাইডের জীবিকায় গ্রাসাচ্ছাদন করেন।

(১) Ajanta & Ellora—By Gupte & Mahajan, Taraporevala, Bombay

(২) Indian Architecture (Buddhist & Hindu Period)—By Percy Brown, Taraporevala Publication, 2nd Enlarged Edition, Page 28.

উনি খবর পাঠালেন। ভদ্রলোকের আসতে যেটুকু দেবী হল তার মাঝে আমাকে সাবধান করে দিলেন—শুণীলোক, বুঝেছেন, কিন্তু ভারী খামখেয়ালী। জাতকের কাহিনীগুলি ঠাঁর কণ্ঠস্থ—চোখ বুজে প্রতিটি চিত্রের অবস্থান বলে যেতে পারেন।

তাবপর টিকিটবাবুর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একটু ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অহুচস্বরে বলেন—আর একটা গোপন কথা! এই গুহা-চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ একটু সুদরীকে নাকি উনি ভালবাসতেন, আর তাই এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারেন না। দারোয়ানদের অনেকেই বলেছে—যা গ্রী না থাকলে উনি সেই নারীচিত্রটির সামনে নাকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

প্রচণ্ড কৌতূহল হল, বলি—কোন চিত্রটি বসুন তো ?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব শুনবার আগেই দ্বারপ্রান্তে পদধ্বনি শুনেতে পেলুম। এসে উপস্থিত হলেন ভদ্রলোক। মহম্মদ মীর্জা ইম্মাইল। শীর্ণকায় বৃদ্ধ, মাথায একমাথা সাদা চুল—গাঁফ-দাড়ি কামানো। গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাকলার, পরিধানে পায়জামা। বশুন্ধ ইংরেজি বলতে পারেন। আমি অজ্ঞতার বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশে ইচ্ছুক শুনে সাগ্রহে আমাকে নিয়ে বার হলেন।

অস্থিত শুণীলোক। জাতক-কাহিনীগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ, এমন দরদ দিয়ে চিত্রগুলির মর্মকথা বর্ণনা করতে থাকেন যে, মুগ্ধ হয়ে শুনেতে হয়। কিন্তু নবম গুহা পর্যন্ত এসে লক্ষ্য করলুম, ভদ্রলোকের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্রমাগত কাশছেন। প্রশ্ন করে জানি, গতরাত্রি থেকে তাঁর সর্দিকাশ হয়েছে। বলি, আমি এখানে কদিন থাকব, কাল না হয় বাকিটা দেখা যাবে।

ভদ্রলোককে তাঁর পারিষদিক দেবার উত্তোগ করতেই তিনি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন—মাপ করবেন। আপনার কাছে কিছু নিতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বলি—সে কি, কেন ?

—ডাক্তারে কি ডাক্তারের কাছে কি নেয় ?

—তার মানে ?

—আপনি অজ্ঞতা দেখতে আসেন নি, দেখাতে এসেছেন। আপনি টুরিস্ট নন, আপনি গাইড। আমি ও আপনি স্বগোত্র।

অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন কিছু হল না তখন বলি—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি বিদেশী যাত্রী যোগাড় করুন। আমি যখন গাইড তখন আপনার সাকরেদিত করব। আপনাকে কথা বলতে হবে না—শুধু সঙ্গে থাকবেন। আমি কোথাও কিছু ভুল বললে শুধরে দেবেন শুধ।

—তাতে কার কি লাভ ?

—আপনার লাভ আর্থিক, আর আমার লাভ এভাবে ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরে নেব। বারে বারে দেখে ও বলে ছবিগুলি মনে গাঁথা হয়ে যাবে।

বাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। ইসমাইল সাহেবের সাক্ষেপিত কবে আমিও কম লাভবান হই নি।

যাক সে কথা। যে কথা বলছিলাম। ষোড়শ গুহা-মন্দিরের প্রবেশপথে এই যুগল নতজান্ন হস্তিমূর্তি দেখিয়ে উনি বলেন, - হিউ এন-ৎসাও কখনও অজস্রায় আসেন নি, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণদের মুখে শুনে তিনি দাক্ষিণাত্যের একসারি অপূর্ব গুহা-মন্দিরের উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। বলেছেন, সেখানে দেব-নব-নাগ-গন্ধবেবা তো বটেই, এমনকি ঐবাবততুল্যা যুগলহস্তী নতজান্ন হয়ে সেখানে তথাগত বুদ্ধদেবকে শাস্তকাল ধরে প্রণাম করছে।

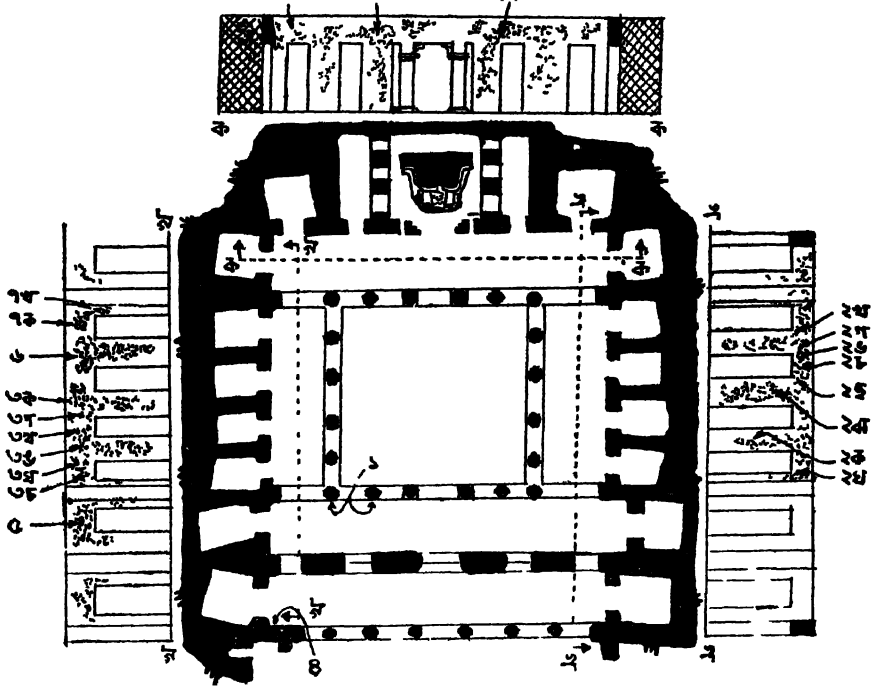
ষোড়শ গুহা-বিহারের প্ল্যান ও শিল্প-নিদর্শনগুলির অবস্থান চিত্র ৫৮-এ দেওয়া গেল। প্রথমেই একটি প্রশস্ত অলিন্দ, প্রায় ৬৫ ফুট দীর্ঘ এবং ১১ ফুট প্রস্থ। সম্মুখে ছটি আট-কোণা স্তম্ভ এবং দুটি অধস্তম্ভ। স্তম্ভ-গুলির বর্ণনা উপরেই করা হয়েছে (চিত্র ৫১)। অলিন্দের বামপ্রান্তে পাহাডের গায়ে শিলালিপি থেকে জানতে পারি, বার্বারিক বাজবংশের বাজা হাবেষের আমলে (৭৭৫-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিহাৰটি নির্মিত হয়।

অলিন্দের পূর্ব মণ্ড বিহাৰের পায়-চতুষ্কোণ হল-কামরা। দৈর্ঘ্যে ৬৬ ৩, প্রস্থে ৬৭ ৩, উচ্চতা ১৫ ৩। অলিন্দ পার হয়ে উপরে তাকালেই নজরে পড়বে ক্ষুদ্রকায় নামনের দল বীম বা কডিগুলিকে পিঠ দিয়ে বসে বসেছে। উপরের চাপে যেন তাদের প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে (১৬১)।

গুহাটির পূর্ব প্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের আদিপর্বের কয়েকটি ঘটনা বিচিত্রিত। সেগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো নয়। চিত্রের অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনা না করে বরং বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাচক্র অনুসারে এ বর্ণনা করা যাক। পূর্ব অধায়ে বর্ণিত যতি-চিহ্ন অনুসরণে এবং চিত্র ৫৮-এ লিখিত ইন্দ্রদেশ অনুসারে পাঠকের পক্ষে চিত্রগুলি সনাক্তকরণ কঠিন হবে না।

পূর্ব পর্বেছেদে ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম, বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে অজস্রা-শিল্পের সম্পর্ক আছে। সেই মহাপুরুষের জীবনী তখন আমরা আলোচনা করি নি। এবার তা কববার সময় হয়েছে। আর তাই জীবনের ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে বর্ণনা করার সময় অজস্রায় তার কোন আলোচনা থাকলে এখানে আমরা তাই উল্লেখ করে যাব।

গৌতমবুদ্ধের জন্ম-সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবৈধ আছে। কেউ বলেন, তিনি খ্রীষ্টাব্দ ৫৬৬-তে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেন আবও তিন বছর আগে, অর্থাৎ ৫৬৬-তে। নেপালী শাস্ত্রকারদের মতে, আবও ষাট বছর আগে অর্থাৎ ৬-৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। গৌতমবুদ্ধ বা শাক্য সিদ্ধার্থকে জন্মগ্রহণের পূর্বে তিনি নানান কপ নিয়ে এ ধর্মধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নানান বকম লীলাখেলা করে যান। এক এক জীবনে তাঁর এক



চিত্র ৫৮

ষোড়শ গুপ্তা-মন্দিরের প্ল্যান

- |   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ১ | সুস্তমীর্ষে বামেন মূর্তি        | গ  | বপিলাবস্ততে বুদ্ধদেব        |
| ২ | বুদ্ধদেবের জীবনীর প্রথমংশ       | ঘ  | নন্দের কেশকর্তন             |
| ক | মহর্ষি অসিত কঠক নবজাতক দর্শন    | ঙ  | নন্দের মনোবেদনা             |
| খ | চতুর্পাঠিতে শিক্ষা              | চ  | মরণাহতা রাজকন্যা, চিত্র—৫২  |
| গ | স্কন্ধোদনের সমস্তা              | ৪  | হস্তিজাতক                   |
| ঘ | গৃহত্যাগ                        | ৫  | চিত্র সনাক্ত করা যায় নি    |
| ঙ | উরুবিষে উপনীত                   | ৬  | কতিপয় মাল্লবী বৃদ্ধ        |
| চ | স্বজাতার পায়সায় রন্ধন         | ৭  | ক যুগনয়ন                   |
| ছ | ত্রপুত্র ও ভল্লিক               | খ  | মীননয়না                    |
| জ | বিষিসারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান | ৮  | বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার       |
| ৩ | নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ         | ৯  | অজাতশত্রুর বুদ্ধদর্শনে আগমন |
| ৪ | কালোদারীর ঘোষণা                 | ১০ | বুদ্ধদেবের আলেখ্য           |
| ৫ | স্বঘোষাভ্যানে বুদ্ধদেব          |    |                             |



এক লীলা। কখনও বাজপুত্র হয়ে, কখনও নাগ, বানব, ষড়দন্ত হস্তীৰূপ পবিগ্রহ কবেছিলেন। তাঁদের বুদ্ধরূপে চিহ্নিত কৰা হয় না - তাঁরা সবাই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধদেবের অংশ-অবতাব।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বেও ছয়জন (কাবও মতে, চূষান্তব জন) বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব নন পূর্ণ বুদ্ধরূপেই এ ধ্বাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেকেব মতে, এঁদের সংখ্যা বস্তুতঃ চব্বিশ জন। ললিতা-বিস্তাব ও মহাবাস্ত্রমতে, গৌতম বুদ্ধ-দীপঙ্করের অধীনে বুদ্ধত্বলাভ কবতে মনস্থ কবেন। বহু জন্মচক্রপথ অতিক্রম কবে অবশেষে তিনি তৃষিত-স্বর্গে এসে অবতীর্ণ হলেন। সেখানেই শেষবাবের মতো দেহধাবণেব জন্ম গোঁতমবুদ্ধের অপেক্ষা কবে বইলেন। তৃষিত-স্বর্গে বসে তিনি চিন্তা কবতে থাকেন জীবনলেখ্য অচপব কোন ভ-ভাগে তিনি অবতীর্ণ হবেন। বুদ্ধদেবের জীবনীৰ এই অংশটুকু অবলম্বন কবে অঙ্কিত কতকগুলি প্রাচীৰ-চিত্র আমবা দ্বিতীয় বিস্তাবে ইতিপূর্বেই দেখেছি (চিত্র ২।১-ক-চ)। এখানে, এই ষোড়শ বিস্তাবে প্রথম চিত্রটিতে (১৬।১-ক) দেখাছি, সত্তোজাত সিদ্ধার্থকে ফ্রাডে তুলে নিয়ে মহর্ষি অসিত তাকে নিবাক্ষণ কবছেন। ভবিষ্যদ্বাণী কবছেন, জাতক সংসাবে আবদ্ধ থাকলে হবেন ত্রিভুবনজয়ী বাজচক্রবর্তী, আব যদি কোনদিন মুণ্ডিত হয় তাব মস্তক, অঙ্গে ণ্টে পীত অর্জুন, তাতলে তিনি হবেন জগৎপ্রাভা যুগাবতাব। শূদ্র-সমম্মিত অসিতের মূর্তিটি অনবজ। তাব সে মুখে জানন্দ ও বিষাদেব অপূৰ সংমিশ্রণ। কিন্তু বিষাদ কেন? তাব জবাব পাচ্ছি ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশযেব সঙ্গলিত বুদ্ধদেবের জীবনীতে। ঘোষ-মশাহ লিখেছেন, এঐ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ কবাব পব মহর্ষি অসিতের শীর্ণ গণ্ড বেয়ে অশ্রুবাবা গাড়িয়ে পড়ে। বিস্মিত মহাবাজ শুদ্ধোদন প্রশ্ন কবেন মহর্ষি, আপনি বোদন কবছেন কেন?

উত্তবে মহর্ষি বলোছিলেন, মহাবাজ, এই সত্তোজাত শিশু যখন পবম সত্তোব সন্ধান পাবেন, তখন আমি এ ধ্বাধামে থাকব না, তাব পূর্বেই আমি দেহবক্ষা কবব। এব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবাব সৌভাগ্য থেকে আমি বাঞ্ছিত হয়েছি। এজন্মই বোদন কবছি শাক্য-অধিপতি।

এই কথা বলে সেই সত্তোজাত শিশুৰ সম্মুখে মহর্ষি অসিত ভমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কবলেন। তখন দেবলাদি অগ্নাত্ত ঋষিবাও শিশুকে প্রাণিপাত কবলেন। তাই দেখে বিশ্বযাহত মহাবাজ শুদ্ধোদন প্রণাম কবলেন নিজ পুত্রকে।

সিদ্ধার্থেব জন্মেব সপ্তম দিবসে তাব গভধাবণী জননী মাযাদেবী স্বর্গাবোহণ কবেন। শিশু সিদ্ধার্থকে মানুষ কবে তোলেন মাযাদেবীৰ ভগ্নী ও শুদ্ধোদনেব অপবা মহিষী মহাগৌতমী বা মহাপ্রজাপতি। এই মহাগৌতমাব একটি পুত্র ছিল। তাব নাম নন্দ। সিদ্ধার্থ অগ্নাত্ত বাজপুত্রদের সঙ্গে একত্রে বড় হয়ে ওঠেন। যথাসময়ে তাদের হাতখড়ি ও চূড়াকরণ হ'ল। শিক্ষাগুরু আচার্য বিশ্বামিত্রেব চতুস্পাঠীতে তাঁদের বিদ্যাভ্যাসের চিত্রটিতে

(১) বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, মহাবাজ শুদ্ধোদন চারবাব ঋত পূত্র গৌতমকে প্রণাম কবতেছিলেন। চারটি ঘটনাই কোতুকাবত সম্বন্ধমতো তা বলা যাবে। এটি-ই প্রথমবাব।

(১৬১২-খ) এবাব আমবা মনোনিবেশ কৰতে পাৰি। দেখাছি শিশু সিদ্ধার্থেৰ এ-পাশে মন্ত্যধাৰ, হাতে লেখনী, সম্মুখে ভূৰ্জপত্ৰ এ-পাশে আবও কয়েকজন সহাধ্যায়ী। তাঁবা সকলেই শাকা বাজপৰিবাবেৰ শিশু-বাজপুত্ৰ, মহাগৌতমীপুত্ৰ নন্দ, আনন্দ, মহানাম, দেবদত্ত এব, অন্তৰুদ্ধ। পাঠশালাৰ চাব-চালা ঘৰটি লক্ষণীয়। একেবাবে বাংলা দেশেৰ চাব-চালা। শিল্পী এ চিত্ৰে আবও ছুটি জিনিস একেছেন, যা খুটিয়ে দেখাৰ অপেক্ষা বাখে। একটি পিঞ্জৰাবদ্ধ পক্ষী ও একটি বীণায়ন্ত্ৰ। পাঠশালাৰ ঘৰোয়া পৰিবেশে এ ছুটি খুবই স্বাভাৱিক, কিন্তু মনে হয়, শিল্পী এ ছুটিকে পতীৰ হিনাবে ব্যবহাৰ কৰবাৰ উদ্দেশ্যেই একেছেন। পাঠশালাৰ এ আবেষ্টনীতে মুক্তিকামা সিদ্ধার্থেৰ অবস্থা কি পিতৃ বদ্ধ ঐ পক্ষিশাবকেৰ মতো নহ? মহাজ্ঞানৰ মুক্ত নোলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমেব-মা • ভেসে বড়াবাৰ তথা নান জন্ম। পাঠশালাৰ এ শিষ্টাব ব্যাকৰণ আব নানান পাঠ্যপুৰিৰ শৃঙ্খল কি তাকে ৰোধ নাখন নি হুমকমশাই? আব পাঠশালাৰ এ পাঠ্যৰ দৈ বীণায়ন্ত্ৰটি হা, ওটি এ চিত্ৰেৰ আৰাধ্যক অক্ষ নীৰব বাণায়ন্ত্ৰত তৰীৰ মাত্ৰ। ঐ শিশুৰ গম্ভীৰ-চাৰীণকাৰেৰ অক্ষলিম্পাশ বদ্ধ হ হাৰে উঠবাৰ জন্ম পূৰ্বৰ পৰাচ

। হু বাজাৰ ছোপেৰে হো গুৰ বিন্ধ্যাশাস কৰলেই চলবে না। তাকে শিনাও হৰে অশ্বাবোহত্ৰণ, যুদ্ধাবতা। ঐই ঠিক পৰেৰ চিত্ৰটি ওঠি দনছি শিশু সিদ্ধার্থ •াব-ধনুৰ দিয শবসন্ধান অশ্বাস কৰাছেন।

ওঁদিকে কপিলানন্তৰ বাজাশুপুৰে কিন্তু বাজাৰ মনে গাশ্ব নেৰ। কিছুতেই ওঁদৈ ভুলতে গাবছেন না সভানাগুত ও মহৰি অসিত্তেৰ ভবিষ্যদ্বাণী। পাণ্ডুৱা কৰাছন মনে মনে, এ জোল যেন বোান দন প •বসনধাবা না হয়, ওৰ ঐ কুৰি • কশদাম যেন বোানদিন মস্তকচূত না হয়, এ বাবস্থা তাকে কৰাতই হাব। সিদ্ধার্থ বাজপদ'দৰ মনো বয়জ্যোষ্ৰ। সেই যববাজ। বাজাশাসনেৰ ভাব তাৰ উপযুক্ত হস্তে সমপণ কৰা • পৰাণ ওবেই তাৰ মুক্তি। তাহ'লেই তিনি বানপ্ৰস্তু নিয়ে ধমাচৰণ কৰতে পাৰেবন।

পাৰ্শ্ববতী প্যানেলটিতে দেখাছি একটি বৃত্তাকাৰ মণ্ডপ। মণ্ডপ বাজা শুদ্ধোদন ও সিদ্ধার্থেৰ বিমাণ মহাগৌতমী পবামশ কৰছেন কিভানে সিদ্ধার্থেৰ সসাৰে আবদ্ধ কৰা যায়। সভামণ্ডপে আবও ছব-সাতটি নবনাবীৰ আলেখ্য (১৬১২-গ)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কৰে দেখুন, বৃত্তাকাৰ মণ্ডপটিতে পৰিপ্ৰেক্ষিত ০ তিনমাত্ৰাব প্ৰকাশ কী নিখুঁতভাবে আঁকা হযেছে।

ঠিক তাৰ পাশেৰ প্যানেলটিতে দেখাছি, একটি কিশোৰীৰ সঙ্গ বাজাশুপুৰে সিদ্ধার্থ আলাপনবত। কে এই কিশোৰী? ও, বোঝা গেছে। ইতিমধ্যে কিশোৰ সিদ্ধার্থেৰ বিবাহ হযেছে। মাত্ৰ ষোড়শ বৰ্ষ বয়সে। ঐ কিশোৰী মেঘটি স্প্ৰবুদ্ধতনশ যশোধবা, সিদ্ধার্থেৰ সন্তোবিবাহিতা সহধৰ্মিণী।

মুহু হযে দেখতে থাকি চিত্ৰটিকে। তৰুণ সিদ্ধার্থ ও কিশোৰী যশোধবাৰ এই চিত্ৰটিতে শিল্পী গৌতমবুদ্ধেৰ দাম্পত্য জীবনেৰ মধুৰ বসেৰ একটিমাত্ৰ বিন্দু পৰিবেশন

কবেছেন। যশোধবাব বহু চিত্র বহু স্থানে দেখেছি—কিন্তু যতদূর মনে পড়েছে, সেই মন্দভাগিনীৰ আলোখা দেখেছি মাত্র ছুটি পৰিবেশে। হয় তিনি নিজাভিভূতা বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকালে, নয় তিনি ভিক্ষা দান কৰেছেন বুদ্ধদেবকে। সহস্রাব্দী কাল ধৰে অজস্ৰাব শিল্পীবা, তাৰ শুধু অজস্ৰ-শিল্পীদেব দোষ দিয়ে কি হবে, সমগ্র বৌদ্ধ জগতেব শিল্পীবা মন্দভাগিনী যশোধবাব অন্ত কোন কপাচস্তা কৰতে পাবেন নি। সেই নিষ্ঠুর আঘাটী পূৰ্ণিমাৰাত্ৰিৰ কালঘমই যেন তাৰ জীবনেব একমাত্র পৰিচয়, যেন সেই উদাসীন সন্ন্যাসীৰ সন্মুখে প্ৰগাখাতা হওযাই তাৰ একমাত্র নিযতি। যেন এ ছুটি ঘটনা ছাড়া অন্ত পৰিবেশ আসে নি তাৰ জীবনে তিনি হাসেন নি, কাঁদেন নি, ভালবাসেন নি।

তাঁই শিল্পীৰ এ চিত্ৰটি দেখে তাৰি ভ্ৰাপ্ত পেলাম। ছনিযাব কাছে, ইতিহাসেব কাছে গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বৰেব অবতাব হ'তে পাবেন, কিন্তু কপিলাবস্তৰ একটি কিশোৰী বালিকাৰ চোখে তিনি যে গন্ত কাপে, গন্ত মাধুৰ্গে ধৰা দিয়েছিলেন এটা শিল্পী ভোলেন নি। প্ৰবন গুহায় দেখা মহাজনক-পত্নী সাবলাৰ কপাই বাব বাব মনে পড়ে যাছিল থামান, এ কিশোৰ-কিশোৰীৰ নিভুল আলাপন দৃশ্যটি দেখে।

কপিলাবস্ত্ৰে সে-যুগে মহা-গাভৰুবে হলকৰ্ষণ উৎসব হ'ত। পৰবেৰ চিত্ৰ দেখাছে, তৰুণ সিদ্ধাৰ্থকে সেখানে নিয়ে গাসা হযেছে উৎসব-মগ্ন নবনাবীৰ মিছিল, তাৰ মাঝখানে কুঞ্জপৃষ্ঠ বলদেব ক্ৰেশেৰ কথা চিন্তা কৰে দেখছি বিমৰ্ষ হয়ে পড়েছেন বাজপুত্ৰ।

পসঙ্কত বঁটা, এখানে একটি অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হয়ে মহাবাজ শুদ্ধোদন দ্বিতীয়বাব প্ৰণাম কৰেন গৌতমকে। মহাবাজ লক্ষ্য কৰেন, উৎসবেৰ আসব থেকে সবে গিয়ে বালক সিদ্ধাৰ্থ বসে আছেন একটি বৃক্ষচ্ছায়াৰ ধানমগ্ন হয়ে, আৰণ বিশ্বযেব কথা, সমস্ত দিনে বৃক্ষেৰ ছায়া একটুও সবলো না। ব্যান'ষ্ট্ৰিম গৌতমকে গাতপতাপ থেকে বক্ষ্য কৰতে বৃক্ষ তাৰ ছাযাকে সমস্ত দিন অপসৰিও হ'তে দিল না। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিশ্বযাৰিষ্ট শুদ্ধোদন পুত্ৰকে সাষ্টাঙ্গে প্ৰণাম কৰোছলেন, জীবনে দ্বিতীয়বাব।

বুদ্ধদেবেব জীবনীতে এব পৰবেৰ ঘটনা হ'ছে, নগৰ-ভ্ৰমণে বেবিযে ব্যাধি-জবা-মৃত্যু এ সন্ন্যাসী দৰ্শন। তখনই তিনি উপলব্ধি কৰলেন, সন্ন্যাসেব পথেই শাস্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি মনস্থিৰ কৰেন, অচিবেই সন্ন্যাসগ্ৰহণ কৰতে হবে তাঁকে।

আকৈশোব জাগতিক দুঃখ-কষ্টেব হাত থেকে পৰিত্ৰাণেব কথা ভাবেছেন তিনি— এখন তিনি উনত্রিশ বর্ষেব পূৰ্ণ যুবাৰুৰু। যোবনেব সেই অত্যুচ্চ শিখবচড়াব বাজভোগ থেকে অববোহণ কৰে সন্ন্যাস নেবেন স্থিৰ কৰলেন। প্ৰাসাদে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে সংবাদ পেলেন বাজবৰু যশোধবা একটি পুত্ৰসন্তান লাভ কৰেছেন। প্ৰাসাদে সেদিন আনন্দেব প্ৰাবন। বাজপুত্ৰকে দলে দলে পুৰবাসীবা অভিনন্দন জানাতে থাকে, কিন্তু সিদ্ধাৰ্থেব মনে তখন অন্ত চিন্তা। তিনি ভাবেছেন, পুত্ৰ হয়েছ তাৰ, সংসাবেৰ বন্ধন বাডছে। আৰ বিলম্ব কৰা উচিত নয়। স্থিৰ কৰলেন, সেই বাত্ৰেই গোপনে গৃহত্যাগ কৰবেন।

উত্তরাধিকা নক্ষত্রে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি সেটি। গভীর বাত্রে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বাব হয়ে এলেন তরুণ সিদ্ধার্থ। দেখেন উৎসব-ক্লাস্ত নর্তকীর দল যে যেখানে স্থান পেয়েছে—নিদ্রামগ্ন। মহাবাজেব মহলে নেমে এসেছে সুপ্তিব অঙ্ককাব ঘন মেঘজালে পূর্ণচন্দ্র অবলুপ্ত। ধীবপদে সিদ্ধার্থ এগিয়ে এলেন যশোধবাব স্মৃতিকাগৃহে। পুত্র বাছলকে একবাব চোখেব দেখা দেখে যাবেন। দ্বাবী নিদ্রাভিভূত—গৃহমধ্যে প্রবেশ কবলেন সিদ্ধার্থ। দেখলেন যুঁই জাব পদ্মফুলে আকীর্ণ পালকে ক্লাস্তিতে নিদ্রামগ্ন যশোধবাকে। ঘবে জ্বলছে নির্বাণোন্মথ একটি বহুদ্বীপ। তাবই ক্ষীণ জ্বালায় দেখলেন যশোধবাব পদ্মকোকবতুলা একটি হাত সত্ৰোজাত শিশুব মস্তকে পড়ে আছে। পুত্রকে কোলে তুলে নেওযাব ছবস্ত প্রলোভনকে দমন কবলেন সিদ্ধার্থ—তাতে নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পাবে বাজববব। নিঃশব্দচরণে ঘব ছেড়ে বেবিযে এলেন বাজপুত্র। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে পঠে একবাব।

এই অনবদ্য নিষয়-বস্তুটিকে উপেক্ষা কবেন নি শিল্পী। পবেব প্যানলে ( ১৬১২-খ ) সেটিকে কপায়িত কবেছিলেন তিনি। ছুর্ভাগা আমাদেব, কালেব কবলে এ চিত্রটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। এ চিত্রটিব কথা পবেই আলোচনা কবেছি গ্রিফিথ সাহেবেব মল গ্রন্থ অবলম্বনে। বলেছি, পালক্ষেব নীচে নিবাপিত দীপ, দীপাধাব এব ছিন্ন-তাব শীঘায়নটি আঁকতে শিল্পী কী জাতীয় সমস্তাব সম্মুখান হয়েছিলেন, এবে কেমনভাবে পারিপ্ৰেক্ষিতবে মানদণ্ড পালটিযে সে সমস্তাব সমাধানও কবেছিলেন

প্রসঙ্গতঃ বলি, ইযাজদানীব মতে, এই অবলুপ্তপ্রায় চিত্রটি বুদ্ধদেবেব জন্মেব দৃশ্য। পালকে শায়িতা নাবীমূর্তিটি মহামাযাব, সত্ৰোজাত সম্মানটি স্বয়ং বুদ্ধদেব। আমাব মনে হয়েছে, তা কখনও হ'তেই পাবে না। প্রথমতঃ, কাহিনীব পাবম্পষ বক্ষাব দিক থেকে এটি তাব গৃহত্যাগেব দৃশ্যই হওয়া উচিত। পূবদৃশ্যে সত্ৰোবিবাহিত সিদ্ধার্থ ও যশোধবাকে দেখেছি আমবা, তাবপব হঠাৎ বুদ্ধদেবেব জন্মচিত্র আসবে কেন? কিন্তু এটা কোন প্রমাণ নয়, কাবণ, অজস্রতে অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রগুলিকে কাহিনীব বালানুক্ৰমিকভাবে সাজানো হয় নি। তাই দ্বিতীয় কাবণটাব উপবেই জেব দেব বেশি কবে—বুদ্ধদেবেব জন্ম লুম্বিনী কাননে, সেখানে মাযাদেবীব ভাগে কোন পালক জোটে নি। শালভঞ্জিকা মূর্তিতে দণ্ডায়মান শবস্থায় তিনি পুত্রলাভ কবেছিলেন। তৃতীয় যুক্তিটি এই—নির্বাণিত প্রদীপ বুদ্ধদেবেব জন্মেব চিত্রে কোন শিল্পীই কল্পনা কববেন না। সুতবাং আমি নিঃসন্দেহ—গ্রিফিথ-ই ঠিক বলেছেন—এটি সিদ্ধার্থেব গৃহত্যাগেব চিত্র।

পববর্তী কাহিনীব দৃশ্য উকবিষ গ্রামে। কিন্তু অন্তবর্তী কালেব ইতিহাসটুকু আলোচনা কবে নিয়ে সে দৃশ্যে উপনীত হব আমবা।

সেই নিষ্ঠুর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সত্ৰোজাত শিশুপুত্র ও তাব মন্দভাগিনী জননীকে ত্যাগ কবে সিদ্ধার্থ বেবিযে এলেন প্রাসাদ থেকে। পদব্রজে নয়—সাবথী চন্ন তাঁকে তাঁর প্রিয় বধে কবেই পৌঁছে দিল বাজাসীমাস্তে। আমনা নদীব তীবে এসে তিনি বথ ধামাতে

বললেন। বিশ্বস্ত অশুচর সাবধী চন্ন এতক্ষণ কোন প্রশ্ন করে নি, এখনও কোন প্রশ্ন করলো না। গতিবেগ সম্বরণ করলো রথের। নেমে এলেন রাজপুত্র—চন্নকে কাছে ডেকে এনে বললেন তাঁর মনোবাসনার কথা। এইখানে এই মুহূর্তে, নগরপ্রান্তে এই বিজন বনে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। 'সম্ভূত হয়ে গেল চন্ন। একে একে রাজ-পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন সিদ্ধার্থ; মণিময় মুকুট, কণ্ঠহার, মণিবলয় কেয়ূব। তুলে দিলেন চন্নের হাতে। তরবারি নিষ্কাশিত করে স্বহস্তে কর্তিত করলেন বাজপুত্রের দীর্ঘ ঘনকুঙ্কিত কেশদাম। পীতবসনে আবৃত করলেন দেবদুর্লভ কাশ্মি।

চোখের জলে ভেসে গেল চন্ন। বললে—ভগবন, কাল প্রাতে মহাবাজ যখন বলবেন, কেন তুমি তাকে যেতে দিলে ?

সিদ্ধার্থ বললেন বলবে, তুমি আজ্ঞাবহমাত্র, তোমাকে আমি আদেশ করেছিলাম এই বিজন অরণ্যে আমাকে পরিত্যাগ কবে নগবে প্রত্যাবর্তন কবতে।

ছুটি শাত জোড় কবে চন্ন বলে—আর কি কোনদিন দেখা হবে না প্রভু ?

সিদ্ধার্থ বললেন—তোমাব সঙ্গে হবে চন্ন, কণ্ঠকেব সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

কণ্ঠক রাজপুত্রের প্রিয় অশ্ব। আবাল্যেব সহচর। বাজপুত্রের এ কথা শুনে কণ্ঠক আবে স্থির থাকতে পাবল না, সেখানেই শয্যা নিল এবং প্রভূব বিবশে দুঃখে মনোভঙ্গে তখনই শেষনিশ্বাস ত্যাগ কবলো।

একাকী প্রত্যাবর্তন কবলো চন্ন সরোদনে। একলা চলল দুর্গম পথে যাত্রা করলেন তরুণ পথিক! আষাঢ়ী পূর্ণিমােব সে বিচিত্র রাত্রে সে দুর্গম পথে কখনও আলো, কখনও অন্ধকার।

ওদিকে বাজপ্রাসাদে মণিময় পালঙ্গে নিদ্রাভিভূতা যশোধরা একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন। পুত্রজন্মের পর তখনও রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। যশোধরা স্বপ্ন দেখছেন, রাত্রি প্রভাতে যুববাজ পুত্রদর্শনে এসেছেন সেই স্মৃতিকাগৃহে। বৈতালিকেব দল যুবরাজেব বন্দনাগান ধবেছে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবদুর্লভকাশ্মি যুবাপুকষ, সর্বিস্ময়ে ছুটি পদ্মপলাশলোচন বিক্ষারিত করে দেখছেন অতি-ক্ষুদ্র একটি মানব-শিশুকে। এ শিশু যশোধরার, এ শিশু সিদ্ধার্থেব। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমােব সার্থক হয়েছে যশোধরার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা; মহাজনক-জায়ী সীবলীর তপস্বা।

সহসা বজ্রপাত হ'ল কোথাও অদূবে। স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল যশোধরার। চমকে উঠে বসেন তিনি শয্যােয়; দেখেন নিবাপিত হয়েছে কখন রত্নদীপ। আষাঢ়-বাত্রির ঘনান্ধকােবে ঢেকে গেছে স্মৃতিকাগৃহ।

কপিলাবস্ত্র থেকে সত্যসন্ধানী ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন মগধে—রাজগৃহে। এখানে সন্ন্যাসী আড়ার কালাম-এর আশ্রমে গেলেন প্রথমে। কালাম সিদ্ধার্থকে ধ্যান ও তপস্বাব পাঠ দিলেন; কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। রাজ-গৃহের অপর একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী উদক ( ব্রহ্মক ) রামপুত্রের কাছেও তিনি সত্যের সন্ধানে

গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ অনুধাবন কবলেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভের জগৎ তাঁকে একক সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। বাজগৃহ ত্যাগ করে তিনি চললেন দক্ষিণাভিমুখে। কদ্রক ও কালাম-এর গয়ত শিষ্যদলের ভিতর পাঁচজন এই তরুণ তাপসের সত্যানুসন্ধানের নিষ্ঠা দেখে তাঁর অন্তর্গমন করলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, এই তরুণ সিদ্ধার্থই প্রকৃত জ্ঞান বুদ্ধদেব অধিকাৰী হ'তে পাববেন, আব তাহ'লে সে প্রসাদ-কর্ণিকা থেকে তাঁবাও বাঞ্ছিত হবেন না। এই পাঁচজন শিষ্যের নাম অন্ন-কোদন্ন, ভাঙ্গা, মহানাম, ভদ্র আব অশুপী।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তাঁবা কোন এক অখ্যাত গ্রাম উর্কবিল্বে উপনীত হলেন অপরশেষে। এই শাস্ত্র নিজন স্থানটি ভালো লাগলো তাব, স্থির কবলেন এখানেই সাধন শুরু কববেন।

চিত্রে দেখছি ( ১৬১-৬ ), চাবজন অনুচবসহ ( পাঁচজন নয় কেন ) সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ এসে দাড়িয়েছেন উর্কবিল্ব ( বর্তমান বুদ্ধগয়াব দক্ষিণে উবইল ) গ্রামপ্রান্তে। এবানেই কাঠিন্য তপস্শা শুরু হ'ল তাব।

এব পববে দীর্ঘ ছটি বছব আসন্নুদ্র-হমাচলে কত মহাজনপদেব কত ক্ষমতাদর্শী বাজা-মহাবাজা কত প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ কবেছিলেন, কত অযুত মিনাব-সৌব-নাতিশুল্ক নিমাণ কবিযোছিলেন, ভাবতববেব ইতিহাস তা অমানবদনে ভুলে বসে আছে। অমব হয়ে আছে অখ্যাত উর্কবিল্ব গ্রামে অশ্বখবৃক্ষমূলে এক অজ্ঞাত ওকণ সন্ন্যাসীবা ওপস্শাব ফলপ্রাপ্তি। কিন্তু সেদিন কে লক্ষ্য কবেছিল সেই একক তাপসেব নিবলস সাবনাকে।

না, খুল বললাম। একজন লক্ষ্য কবোড়ল। সে বে উববিব গানেব সনানি-গোপতনয়া স্ত্রজাতা। কিশোৰী বয়স থেকে মেয়েটি লক্ষ্য কবছে এই তরুণ তাপসেব জটুত তপশ্চযাকে। সে দেখেছে সন্ন্যাসী তিল তিল কবে আহার্য-পানীয় ত্যাগ কবছেন শীঘ্র হয়ে পড়েছেন গুণি, ছুবল হয়ে পড়েছেন। সে অন্তঃকবনে অনাহাবকিঞ্চ তাপস অর্নবার্থ যত্নবা দিকে আগয়ে চলেছেন। দীঘ ছ' বছবে কিশোৰী হয়েছে যবতী সে বুঝতে পেবেছে, একে বক্ষা কবতে হ'লে তাকে আহায এনে দিতে হবে। শাস্ত্রকাব বলেন নি, কিন্তু আমবা কি অনুমান কবতে পাৰি না, যবতী স্ত্রজাতাব মনে সকাৰিত হযোড়ল সেই কামনাটি যা নিয়ে অপেক্ষা কবেছিলেন মাতঙ্গের আশ্রমে শববা, শ্রীবামচন্দ্রেব প্রতীক্ষায তাব ফল-ফলেব খালাখানি সাজিয়ে।

অনাহাবকিষ্ট সন্ন্যাসী অবশেষে একদিন অনুধাবন কবলেন শবীরকে অহেতুক পীডন কবলে কোন লাভ হয় না। মাত্ৰাতিবিক্ত আহাবে বা নিদ্রায় যেমন ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে যায়, মাত্ৰাতিবিক্ত নিপীডনেও তেমনি ছুবল এবং অশক্ত হয়ে যায় শবাব। জাগতিক কামনা-বাসনাব হাত থেকে মনকে মুক্ত কবতে হ'লে এ ছুটি চবম পথ পবিত্যাগ কবে পবিমিত্তিব পথে অভ্যস্ত কবতে হবে দেহকে। তিনি স্থির কবলেন দেহ-পীডনেব তপস্শা ত্যাগ কববেন এবাব। কিন্তু হায, এ সিদ্ধান্ত যখন নিলেন সিদ্ধার্থ, ততদিনে তাঁব দেহ এতদূর অশক্ত হয়ে পড়েছে যে, আসন ত্যাগ করে আহাৰ্বেব কাছে পর্যন্ত তিনি এগিয়ে

যেতে পাবেন না। সিদ্ধার্থ অন্তত্ব কবেন, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাঁর ললাট-লিখন নয়। মৃত্যুকে চক্ষের সম্মুখে দেখলেন তিনি। লুটিয়ে পড়ল তাঁর অনাহারক্লিষ্ট দেহ ভূমিশয়ায়।

ভাবতবর্ষেব ইতিহাস, সংস্কৃতি, তাব ধম, তাব মমবাণী একটি অখ্যাত গোপবালাব কাছে একান্তভাবে খণী, সে ঐ সূজাতা। সে লক্ষ্য কবে, তকণ তাপসেব অনাহার-মৃত্যুর উপক্রম। সূজাতা ছুটে চলে যায় নিজ কুটিবে। প্রণয়ন কবে গোশালাব শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ধেম্বুব দুকে প্রস্তুত পাযসায়। পায়স তো নয়, অমৃত! সে অমৃতেব অমিত প্রভাবেই পৃথিবী একদিন শুনতে পেয়েছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী : অহিংসা পবমোধর্মঃ।

চিত্রে দেখছি (১৬১২-৮), নিভৃত গৃহকোণে মৃৎপাত্রে পায়সায় প্রস্তুত কবছে গোপকন্যা সূজাতা। বাঁহিব-দ্বাবে বিশ্রামবত তাব চাবটি বেদু।

শবৎচন্দ্র বহুবাব বলেছেন, নিজেব হাতে দুটি বেঁধে সামনে বসিয়ে পুরুষমানুষকে খাওয়াবাব সুযোগ পেলে ভাবতীব মেয়েবা আব কিছু চায় না। আনাব মনে হয়, তাব কাবণ ঐ সূজাতা আব শববীব রক্ত তাদেব ধমনাতে প্রবাহিত হব বলেই।

পবেব প্যানেলটিে দেখাছি, সন্ন্যাসীব পদপ্রান্তে সূজাতা<sup>১</sup> পাযসানেব ভাণ্ডটি নামিয়ে রাখছে। ছুই হাতে অর্ঘ্যদানেব ভঙ্গিতে সে ধবেছে অমৃতভাণ্ড, নতজাগ্র ভঙ্গি তাব।

পায়সায় আহাব কবে সুস্থবোধ কবলেন সিদ্ধার্থ। সম্পূর্ণ নূতন পথে সাধনা শুক কবলেন এবাব। দেহকে নিপীডন কবা বন্ধ কবলেন, ও বিষয়ে পবিমিত আহাব-নিদাকে তিনি ববণ কবলেন অতঃপব। এই সময়েই সিদ্ধার্থেব পাঁচজন অন্তচব তাঁকে ত্যাগ কবে ঋষিপতন<sup>২</sup> অভিযুগে প্রস্থান কবেন। সিদ্ধার্থকে কঠোর উপশ্চমাব পথ ত্যাগ কবতে দেখে তাবা ভেবেছিলেন, তিনি এতদিনে হলেন ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত।

তাতে ক্রক্ষেপও কবলেন না সিদ্ধার্থ। ধ্যানেব জগতে তিনি অভিবৃত্ত হযে বইলেন চবম সতোব সন্ধানে। বুদ্ধিলাভ কবাব পথে যখন অল্প পথ মাত্র বার্কি, তখন এলেন সঠৈসন্ধ্য মার। সর্বপ্রথম আবিবৃত্ত হলেন ছদ্মবেশে। কপিলাবস্তুর এক বাজদূতেব কপ ধবে উপনীত হলেন সিদ্ধার্থেব সম্মুখে। সিদ্ধার্থেব ধ্যান ভঙ্গ কবে মাব সবেদনে বলতে থাকেন —বাজপুত্র আপনি এখানে। আমি ভূতাবত আপনাব অগ্ৰেষণে বৃথাই যুবে মবেছি। আপনাব অমুজ দেবদন্ত মহাবাজ গুছোদনকে হত্যা কবে আজ কপিলাবস্তব সিংহাসনে উপবিষ্ট। মহাগোতমীকে সে কাবাকন্ধ কবে বেখেছে, আর লক্ষ্মীস্বকাপিণী মা যশোধবাব ধর্মনাশ কববাব জন্ম সে বন্ধপবিবব। যুববাজ, আপনি ক্ষত্রিয়সন্তান, এই মূহূর্তে ঐ আসন ত্যাগ কবে উঠে আনুন, আমাকে অন্তসবণ ককন। ক্ষাত্রভেজে অধিকাব ককন নিজ সিংহাসন, উদ্ধাব ককন ভননী ও জাযাকে।

(১) সন্দেহবনেব এত মাননে এটি সূজাতাব আলোখা নয় পূর্ণালক্ষ্যার চিত্র কারণ “৩৭শাখা পূর্ণিমায অবগাহনান্ত পূর্ণালক্ষ্যী দাসীব হস্ত সূজাতা কর্তৃক স্বর্ণপাত্রে প্রেরিত পায়সায় ভক্ষণ”।

(২) বর্তমান কাশার নিকট।

সিদ্ধার্থ সমস্ত শুনে বললেন : তোমার কুটকৌশল বার্থ হয়েছে, হে ছদ্মবেশী গিরি-মেখল-বাহন ।<sup>১</sup> আমি তোমাকে চিনেছি !

অধোবদনে মাঝ ফিরে গেল । কিন্তু নিবস্ত হল না সে,—তখনই সে প্রবেশ করে তাব ভবনমোহিনী তিন বন্ধাকে—ভৃগু, আবতি আব বাগকে । তপস্শ্রাবত সিদ্ধার্থকে সঙ্কল্পচ্যুত কবতে । বিফল হয়ে ফিবল তাবা । শেষে মাঝ পাঠাল তার বীভৎস অন্তচবদেব -সন্ন্যাসীকে ভয় দেখাতে, কিন্তু ফল হল একই । মাঝ স্বয়ং এল এবাব স্বকপে, কিন্তু পবাস্ত হল সে-ও । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে জয় কবেছেন ততদিনে সিদ্ধার্থ, হয়েছেন ভিত্তেশ্বর, স্থিতপ্রজ্ঞ । এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে সাবনাথ মূল-গন্ধেশ্বরকুটিতে একটি বৃহদায়তন ফ্রেস্কো আছে, অজ্ঞাত্য প্রথম গুহায় এ চিত্রটি ( ১।১০ ) আমবা ত্রিতপূবেই দেখেছি ।

পবাস্ত্র নাব নিকপায়ভাবে বলে ওঠে—এ পৃথিবী আমার সাম্রাজ্য ষর্চাবপু-পয় দস্ত আমাব এ পৃথিবীতে তোমাব কোন স্থান নেই ।

সিদ্ধার্থ নাববে দক্ষিণহস্ত দিয়ে স্পর্শ কবলেন মাতা ধবিত্রীকে । যেন নীববে সাক্ষী মানলেন পৃথিবীকেই । অমানি ভূকম্পন শুরু হল প্রচণ্ডভাবে সসৈন্য মাঝ ভূতলশায়ী হল সে অলোড়নে, কপ্ত অটল বইল সিদ্ধার্থেব সাধনপীঠ । সিদ্ধার্থেব এই ভূমিস্পর্শ মতিটি অজস্তুব অনেক গুহাতেই দেখতে পাবেন । একেই বলা হয় 'ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা' ।

সেই বাত্রেই সিদ্ধার্থ পবমজ্ঞান লাভ কবলেন । সিদ্ধার্থ এতদিনে হলেন পবমবুদ্ধ । সেটিও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমাঝ বাত্রি—শুক পূর্ণিমা । বুদ্ধগ লাভ কবে শাক্যসি হ অন্তভব কবলেন চাব প্রকাব স্বায়সত্য এবং দশন কবলেন পবমপ্রাপ্তিব অষ্টমুখা পথ । তিনি অন্তভব কবলেন অজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ কবে কামনা, কামনা থেকে দেহজ ছুঃখ-কষ্ট জন্ম-যন্ত্রণা-জবা-মৃত্যু, তিনি প্রাণবান কবলেন জাগতিক যত ছুঃখ-ছুঃদশাব মল হল অজ্ঞতা এব কামনা । যদি এই মূল ছুটিকে উৎপাতন কবা যায়, তবেই হতে পাবে পবমমুক্তি - নিবাণ ।

সিদ্ধার্থ এই পবমজ্ঞান লাভ কবায়, বুদ্ধ হওয়ায়, গাবাব ফিবে এল মাঝ । বললে—ভূমি তো মহাপবিনিবাণেব পথেব সন্ধান পেখেছ, তবে আব আহেতুক বিলম্ব কবছ কেন মুক্ত হও এ জাগতিক বন্ধন থেকে ।

হেসে বুদ্ধদেব বললেন—তোমাব অসৎ উদ্দেশ্য বৃথতে পেবেছি আমি, কিন্তু তোমাব ইচ্ছা পুরণ হবে না । যতদিন না এ সন্ধমেব নিশ্চিত প্রচাবেব সুবন্দোবস্ত করতে পাবছি, যতদিন না এ মবজগতে মুক্তিব বাণী প্রচাবেব আযোজন হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তিগত মুক্তিব সন্ধানে আমি নিবাণ লাভ কবব না ।

শেষ প্রয়াসে বিফল হয়ে গেল মাঝ ।

পবমপ্রাপ্তিব পবে বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল সেই বোধিবৃক্ষেব তলাতেই অবস্থান কবলেন— দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি বিশ্রাম নিলেন পার্শ্ববর্তী একটি গুহোথ বৃক্ষতলে । তৃতীয়

(১) মারেন বাহন একটি খেতওর্গী, নাম গিরি-মেখল ।



সপ্তাহে যখন মুচলিন্দ বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান কবছেন, তখনও তাঁর দেহ দুর্বল, তখন আকাশ জুড়ে নামল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তখন নাগবাজ মুচলিন্দ আপন ফণা বিস্তার কবে রক্ষা কবলেন বৃক্ষদেবকে<sup>১</sup>। ছুজন উৎকলী বণিক এই সময় সেখান দিয়ে তাঁদের বাণিজ্য-সম্ভাব নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দৈববাণী শুনলেন, পথপার্শ্বে একজন মহামানব অনশনে আছেন। তাঁরা ছুজনে অল্প-কিছু অধেষণ কবেই দেখতে পেলেন ধ্যানস্থ বৃক্ষদেবকে। পবম শ্রদ্ধাভবে মধুক ৫ পবমান্নের অর্ঘ্যদান কবলেন তাঁরা ঐ মহাসন্ন্যাসীকে। এই উৎকলী বণিকদ্বয় হলেন ব্রহ্মসু ৫ ভল্লিক।

পবের প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু নিয়েই আঁকা ( ১৬১২-ছ )।

বৃক্ষদেব তখন চিন্তা কবতে থাকেন -কোথায় গিয়ে, কাব কাছে উপস্থিত হযে সন্ধামের প্রথম প্রচাব কববেন তিনি। প্রথমেই তাঁর মনে উদয় হল, বাজগৃহবাসী সন্ন্যাসী আলারা কালাম ও টুঙ্ককব কথা, কিন্তু বানযোগে তিনি উপসর্গ কবেন ইতিমধ্যেই তাঁরা ছুজন দেহবক্ষা কবেছেন। ফলে, বৃক্ষদেব শিব কবলেন, বাজগৃহের পাববতে তিনি যাবেন কাশীতে—যেখানে ছিলেন তাব সেই পাঁচজন দলতারা অন্তর্চব। বৃক্ষদেব অতঃপব অগ্রসব হলেন কাশী গভিগথে। তাঁর সেই পাঁচজন অন্তর্চব তাকে দেখতে পেবে বললেন বন্ধুবব গৌতম, আমবা জানি কদিন তপশ্চযা কবেও তুমি পবমসত্তাব সন্ধান পাও নি—শেষ শযফু তুমি ঙাগ কবেছিলে দেহ-নিপীডনের পথ। এখন তুমি কা উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছ।

বৃক্ষদেব প্রত্যুত্তবে বললেন—আমি পবমপ্রাপ্ত লাভ কবোছ, আমি আজ তথ্যগত বুদ্ধ। তোমবা আমাকে আব 'বন্ধু গৌতম' বলে সম্বোধন কবো না, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমবাঠ অধঃপতিত হবে। আমি যে সত্তা অন্তর্নাবন কবোছ ও তোমাদেব কাছে বিব্রত কবতেই এসেছি, অবধান কব এব এই ঙগৎ-প্রপঞ্চের যাব গ্রীয ছুখ-ছুদশাব হাত থেকে মার্জিতপথের সন্ধান জেনে নাও।

তিনি সেই সাবনাথ মুগদানেই প্রথম উচ্চারণ কবলেন তাঁব সন্ধামের মূল বাণী। আবর্তিত হল সবপ্রথম সেই মহাধমচক্র। তিনি বললেন—

: ছুটি চবম পথই পবিত্যাজ। কাই সেই চবম পথ ? প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়জ স্মখ-সন্ধান, দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-নিপীডন। তোমাদেব অবলম্বন কবতে হবে মগা-পথ। কাই সেই মগাপথ ? সে হল জ্ঞানের পথ। অষ্টাঙ্গিক সতামার্গ। কাই সেই অষ্টমুখী সতামার্গ ? সম্মা-দিটঠ ( সতা-দৃষ্টি ), সম্মা-সঙ্কল্পো ( সতা-সঙ্কল্প ), সম্মা-বাচা ( সতা-বাক্য ), সম্মা-কস্মন্তো ( সৎ-কর্ম ), সম্মা-আজীবো ( সৎ-জীবিকা ), সম্মা-বাযামো ( সৎ-উত্তোগ ), সম্মা-সতি ( সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি ) এবং সম্মা-সমাধি ( সৎ-ধ্যান )।

(১) কাঁচির পশ্চিম তোরণে এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে একটি সন্দর ভাস্করের নিধনন আছে।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, বন্ধন-ছুঃখ কী? অবধান কব,—জন্ম-ব্যাধি-জবা-মৃত্যুই বন্ধন, অপ্রিয়ের সঙ্গে মিলন ছুঃখেব, প্রিয়-বিবহ প্রকৃত ছুঃখেব, পবমসতা-লাভে বঞ্চিত হওয়া চবম ছুঃখেব।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-ছুঃখের মূল কাবণ কী? অবধান কব, কামনা-বাসনাই এ ছুঃখেব মূল, এ বন্ধনেব বনিয়াদ। ইন্দ্রিয়জ সুখেব কামনা, আশ্ব-তৃাপ্তিব বাসনা, অহং-বোধ-সম্ভূত যশেব অভীপ্সাই এই বন্ধন-ছুঃখেব মূল।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-ছুঃখেব মলোৎপাটনেব উপায় কী? অবধান কব।  
—কামনা-বাসনাকে নিঃশেষ পবিত্যাগ কবাঠি এ মলোচ্ছেদেব উপায়।  
পুবোক্ত অষ্টমুখী সং-মার্গে এ মলোচ্ছেদ সম্ভব।

এই হল তথাগত বুদ্ধেব প্রথম বাণী। সাবনাথ মৃগদাবে এই ধমোপদেশই ধমচক্র আবর্ভনব সূচনা কবল। শ্রবণমাত্র ভিক্ষু কোদন্ন বুদ্ধদেবেব চবণে প্রণিপাত কবে বললেন—প্রভু, আমি উপলব্ধি কবোঙ, আপনিই প্রকৃত বুদ্ধ। গামাকে প্রব্রজ্যা দান ককন, প্রভু।

তিনিই হলেন বুদ্ধদেবেব প্রথম শিষ্য। অল্প পবে অপব চাবজনও তাঁব শিষ্যত গ্রহণ কবেন। সাবনাথে আবও কয়েকজন ঐ সময়ে তাঁব শিষ্যত গ্রহণ কবেন। তাতেব মধ্যে কাশীব বণিকশ্রেষ্ঠ যশদেবেব নাম উল্লেখযোগ্য। যশেব জননী এব, স্বীও এই সদ্ধম গ্রহণ কবেন। কাশী থেকে বুদ্ধদেব পুনবায উকবিশ্ব গ্রামে ফিবে আসেন। সেখানে উর্কাবন্ধ-কাশ্মপ<sup>১</sup> এবং গযাকাশ্মপকে<sup>২</sup> দীক্ষা দেন। এতদিনে বুদ্ধদেবেব পাঁচশত্বেব উপব শিষ্য হয়েছে। এবাব তিনি সশিষ্য বাজগৃহে আসেন।

সংবাদ পেযে বজ্জা বিহিসাব নগবপ্রান্ত্রে এসে সশিষ্য বুদ্ধদেবেকে অভ্যর্থনা কবেন। বাজ্জা তাঁকে সপাযদ বাজপুবাঠে অবস্থানেব উচ্চ আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু অসম্মত হলেন বুদ্ধদেব, বললেন তিনি ভিক্ষু, উমুক্ত আকাশেলেই তাব স্থান। তখন মহাবাজ বিহিসাব বাজগৃহ-প্রবেশপথে একটি মনোবম উদ্যানে তাঁব বিশ্রামেব আযোজন কবেন। বেহুবন নামে এ উদ্যানটি বাচনীবে আজও দেখতে পাওয়া যায়।

ষোডশ গুহায় যে চিত্রাবলী আমবা দেখছি, তাব পববতী প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত। পূর্ব-চিত্রেব নীচেব প্যানেলে দেখছি প্রস্বাসনে বুদ্ধদেব আসীন (চিত্রটি প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে)। সম্মুখে জোডহস্তে মহাবাজ বিহিসাব—তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বুদ্ধদেবেকে, প্রাসাদে অতিথি হওয়াব উচ্চ। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্মত হলেন না।

(১) বুদ্ধদেব, যে একুইট মহাজ্ঞানী একা কাশ্মণবশীল ছই সাতা অস্বীকার কয়ার বুদ্ধদেব ত'র অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন কবোঙ বাধ কন। তিনি নৈঃশ্রুনা নদীর জলেব উপর দিবে পাযে ছেটে নদী পায হন। সীচিত পূর্বে তে'রনে এই ঘটনাটি অবলম্বনে একটি অপরূপ চিত্রসংগ্রহ বনুনা। সাহে।

(২) '৩ পসাদ' পর নামই বুদ্ধদেবেব নামেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে উল্লেখ গ্রামকে করেছে 'বুদ্ধ-গয়া'।

তাই দেখছি ( ১৬১-খ ) বুদ্ধদেব তোবণদ্বার অতিক্রম করে ভিক্ষায় বেব হচ্ছেন । পাশেই বাঁধা রয়েছে বাজা বিহিসাবেবর শ্বেতবর্ণেব অশ্বটি ।

এদিকেব প্রাচীরে চিত্র-কাহিনীৰ এখানেই শেষ । মণ্ডপেব অপব প্রান্তে নন্দেব দীক্ষা ও মবণাহতা রাজকুমারীৰ অপূৰ্ব চিত্রাবলী । কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসাব আগে আমবা বুদ্ধদেবেব জীবনীৰ পথ ধরে আব ও কিছুটা এগিয়ে যাব

বুদ্ধদেবেব বেগবনে অবস্থানকালে বাজগৃহ সন্ন্যাসী সঙ্ঘেব দুই শিষ্য এসে বুদ্ধদেবেব শরণ নিলেন । তাঁবা হচ্ছেন সাবিপুত্র ও মৌংগল্লায়ন । এঁবা দুজনেই আবাবা বন্ধু এব হবিহবায়া । পববতী কালে এব দুজন বুদ্ধদেবেব প্রধান ম শিষ্য বলে স্বীকৃত হন এব এঁদেব পূতাস্তিই আবিষ্কৃত হয়েছে সাঁচব তিন ন মপব তিবন থেকে ।

বাজগৃহে তথাগত প্রায় দুই মাসকাল অবস্থান করেন । কপিলাবস্তব বাজা শুদ্ধোদনেব কাছে এই সময় সংবাদ পৌঁছাল যে, তাব গৃহত্যাগী পুত্র বুদ্ধে লাভ কবেছেন এবং বাজগৃহে অবস্থান কবেছেন । পুত্রদর্শনে ইচ্ছুক বাজা শুদ্ধোদন একজন অমাত্যকে পাঠালেন পুত্রকে আমন্ত্রণ জানাবে, কিন্তু সেই অমাত্য বাজগৃহে এসে বুদ্ধদেবেব দর্শনমাত্র তাঁব কণ্ঠবা বিস্মৃত হলেন এবং বেদে মৌংগ দীক্ষা নিয়ে সেখানেই বাস কবতে থাকেন । শুদ্ধোদন এব পণ ক্রমাধয়ে নয়জন অমাত্যকে পব পব প্রেবণ কবেন এব সকলেই বাজগৃহে এসে বাজকায় বিস্মৃত হবে বৌদ্ধ হবে যান । শেষ পর্যন্ত তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত বাজানুচব কালুদাযীকে প্রেবণ কবলেন যে একই উদ্দেশ্যে । এবাব সংবাদ পেলেন বুদ্ধদেব । আমন্ত্রণ গ্রহণ কবলেন তিনি । সপাঞ্চ বুদ্ধদেব অগ্রসব হতে থাকেন কপিলাবস্তব উদ্দেশ্যে । বিশ্বস্ত শাস্তা-গমাত্য কালুদাযী প্রতগতি অশ্বে পুনেই সে সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন কপিলাবস্তবত সুসজ্জিত কবা হল কপিলাবস্তব বাজপ্রাসাদ-সন্নিকটস্থ গ্রোগ্রোধাবাম বিহাব । মহাপুৰুষেব আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বাজা শুদ্ধোদন শাক্য-অমাত্যদেব সঙ্গে নিয়ে অগ্রসব হলেন গ্রোগ্রোধাবাম বিহাবেব অভিমুখে । কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগল তাঁব মনে । সন্ন্যাসী-দর্শনে যাচ্ছেন তিনি । ভাবতীয় সমাজ-বাবস্থায় সন্ন্যাসীৰ স্থান নূপতিব উশ্বে । বাজাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম কবে থাকেন-প্রথা এই বলে । সামাজিক অল্পশাসনেব তাই নির্দেশ । কিন্তু এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী যে তাঁব প্রাণাপেক্ষ প্রিয় পুত্র—সেই সিদ্ধার্থ, সেই গৌতম যাকে ববে-পঠে কবে মানুষ কবেছেন তিনি । একথা বাজা শুদ্ধোদন কেমন করে ভুলে যাবেন ? তাহলে ? দীঘ অদর্শনেব পর পুত্র পিতাকে প্রণাম কববে, না নূপতি প্রণাম জানাবেন মহাসন্ন্যাসীকে ?

উৎকণ্ঠিত মহাবাজ প্রশ্নটি নিবেদন কবলেন মহামন্ত্রীকে, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মহামন্ত্রী-ও এ সমস্তাব কোন সম্ভাষণক উত্তব খুঁজে পেলেন না । একটি অলৌকিক ঘটনায় এ সমস্তাব সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই । শুদ্ধোদন লক্ষ্য কবে দেখেন, তাঁব সঙ্গে মিলিত হবাব উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব অগ্রসব হয়ে আসছেন ছুঁমি স্পর্শ না করেই ।

বায়ু-তাড়িত মেঘের মত শূণ্ণে ভেসে আসছেন তিনি। স্তম্ভিত মহারাজ লুটিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসীর চরণমূলে।<sup>১</sup>

সপ্তদিবসকাল বুদ্ধদেব অবস্থান করেছিলেন ঞ্চত্রোধারামে। তার প্রতিদিনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে। সে একটি অপূর্ব নাটক!

মহাবাজ শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে সন্ন্যাস নিয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতি। অশ্রুজলে সাস্তুনার ব্যবস্থা তাঁর জন্ম নয়। তাই এই শোকাবহ ছুর্ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়োছিলেন তিনি। এতদিনে শাস্ত্র করতে পেরেছেন হৃদয়কে। স্থির করেছিলেন, সিদ্ধার্থের অন্তর্জ মহাগৌতমী-তনয় কুমার নন্দকে কপিলাবস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন রাজাভাব আব তিনি বইতে পারছেন না—এবাব অবসর নেবেন। পঞ্চাশোৎসব বয়স হয়েছে তাব—এবাব বানপ্রস্থ গ্রহণ করবেন। এ-সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে পরামর্শও কনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ-সব পার্থিব প্রসঙ্গে মহামানব বুদ্ধদেব কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। শুদ্ধোদন তখন ঘোষণা করলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রের কপিলাবস্ত্র-অবস্থানকালের মধ্যেই তিনি নন্দকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করবেন। বাজা জানতেন কপিলাবস্ত্র জনপদেব সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ‘জনপদ-কল্যাণী’ব সঙ্গে কুমার নন্দের গোপন প্রণয়ের কথা। তাই তিনি আনন্ড ঘোষণা কবলেন—অভিষেকের শুভদিনেই এই ছুটি মিলন-ভূষিত তকণ-তকণীকে পর্নণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে দেবেন।

ক্রতগামী ঘোষকের মাধ্যমে এ আনন্দবাতা বর্ষাগমে মৌসুমী মেঘের মত হড়িয়ে পড়ল সমস্ত বাজ্যে। দলে দলে প্রজাবৃন্দ আসতে থাকে কপিলাবস্ত্র অভিমুখে। বাজাদেশে নগরীকে সাজানো হল উৎসব-সাজে। গৃহে গৃহে উড়ল নিশান, পথে পথে নিমিত্ত হল পুষ্প-তোবণ, দীপাবলীতে সজ্জিত হল জনপদ। দূর গ্রামপ্রান্তেব উৎসব-বিলাসা প্রজাব ভীড়ে জনাকীর্ণ হয়ে গেল রাজধানী। রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে অন্ত্রবোধ করলেন, এ কয়দিন তিনি রাজপ্রাসাদেই অধিষ্ঠিত হন। সম্মত হলেন না বুদ্ধদেব। বললেন—তিনি সন্ন্যাসী, প্রাসাদে তাঁর স্থান হবে না। তবে জানালেন, পরদিন ভিক্ষার্থে তিনি নগর-ভ্রমণে যাবেন এবং বাজপ্রাসাদেও গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন। পিতাব আগ্রহাতিশয়ো তিনি সেখানে মধ্যাহ্ন-আহারেও স্বীকৃত হলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলছেন, রাজপ্রাসাদে ফিবে এসে শুদ্ধোদন যখন সানন্দে এ-কথা ঘোষণা করলেন, তখন একজন পুরকামিনী আব স্থির থাকতে পারেন নি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—রাজপুত্র সামান্য ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইবেন—এ দৃশ্য অসহ! তাঁর সে প্রতিবাদের কথা বুদ্ধদেবকে জানানোও হয়েছিল; কিন্তু

(১) সীচিব ভক্তর ত্রোরণের পশ্চিম দিবস শুভের সর্বনির ভাস্কর ব্রহ্মবা। এই কাহিনীটি দেখানে মিলিৎ-কাজে খোদাই করা আছে। এই শিগ্রে তিনবার শুদ্ধোদন প্রণাম করলেন বুদ্ধদেবকে।

(২) জনপদ-কল্যাণী—পালি ভাষায় এই নামের অন্তত: চারজন রবণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমত: যশোধরার নামান্তর, ষিঠীরত: নন্দের পশ্চিমী, তৃতীয়ত: আনন্দের জননী অর্থাৎ সিদ্ধার্থের পিতৃব্য-ভ্রাতা এবং একজন বারবরিত্তা (ভৈলপাত্র-ভাতক)। সম্ভবত: জনপদ-কল্যাণী কোন নাম নয়, রূপবর্ণনাত্মক উপাধিহীন।

মহাভিক্ষু নির্বিকারভাবে বলেছিলেন—আমি ভিক্ষু, পূবাশ্রমে কী ছিলাম সে প্রশ্ন অবাস্তব, ভিক্ষালব্ধ অর্থে ক্ষুন্নবৃত্তিই আমার ধর্ম !

সে-কথা শুনে রাজাস্তঃপুরে সেই রমণীর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, শাস্ত্রকার তা আর জানান নি। বোধ করি সেই মহিলার অপরিসীম অভিমান, মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালার সন্ধানই পান নি শাস্ত্রকার। তিনি শুধু জানিয়েছেন সেই ক্ষুদ্রা মহিলাটির পরিচয়—তিনি স্বামী-ত্যাগী সূপ্রবুদ্ধতনয়া 'যশোধরা' ( =গোপা, ভদ্রা, বিদ্যা )। না, নামটি পর্যন্ত জানান নি, শুধুমাত্র বলেছেন—'রাহুল-মাতা'।

পরদিন রাজপথে সত্যই দেখা গেল এক দেবতুর্লভকাস্তি মহাভিক্ষুকে। পুরবাসী ভিক্ষা দেবে কি, লজ্জায়, অমুশোচনায় তারা রুদ্ধ করে দেয় বাতায়ন - প্রাক্তন রাজপুত্রকে ভিক্ষা দেবার মত তুর্জয় সাহস কার আছে? শূণ্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ধীরপদে এগিয়ে এলেন মহাভিক্ষু রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। দ্বারপাল শিচরিত হয়ে মুখ লুকাল লজ্জায়! মুণ্ডিতমস্তক গীতবসনধারী সন্ন্যাসী অবশেষে এসে উপনীত হলেন অতি-পরিচিত একটি কক্ষের সম্মুখে। তাঁর সঙ্গে আজ তাঁর দুই প্রধান শিষ্য মহাভিক্ষু সানিপুত্র ও মহামৌদ্-গল্ল্যায়ন। দীর্ঘদিন পূর্বে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এ গৃহ থেকে তিনি শেষবার বেরিয়ে এসেছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলতে ভুলেছেন, সূপ্রবুদ্ধতনয়া সেই শূণ্য ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ কবে দেবার উদ্দেশ্যে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন কি না। মহান অর্ধতথ্যকে নিয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন যখন ব্যস্ত, তখন সেই প্রাসাদের অপর প্রান্তে নিভৃত ভূমিশযায় কেউ অশ্রু বগায় ভেসে গিয়েছিলেন কি না, শাস্ত্রকার সে-কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন।

কিন্তু ভোলেন নি অজস্রার শিল্পী! সপ্তদশ গুহায় তিনি রঙে ও বেথায় সেই খণ্ড মুহূর্তটিকে মহাকালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শাস্বত করে রেখে গেছেন। সে-কথা যথাস্থানে।

বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদে সেদিন মধ্যাহ্ন আহার করেছিলেন। আহারান্তে শুদ্ধোদন তাঁর কাছে রাজবধু যশোধরার কৃষ্ণ-সাধনেব প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।<sup>১</sup> উত্তরে মহাভিক্ষু বললেন—শুধু সেই জন্মেই নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি এইরূপ একান্তপ্রণয়ী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, তিনি পূর্বজন্মের চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা পুরবাসীদের স্মরণিয়েছিলেন। বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কী ভাবে চন্দ্রা-কিন্নরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করে, তারপর কী ভাবে সত্চোবিধবার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করে প্রত্য্যাখ্যাত হয়, এবং কী ভাবে

(১) "সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধরা পতিব্রতা রমণীর ছায় প্রোষিত-ভক্টুক। ধর্ম পালন করেন। তিনি যখন এমিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক স্পৃশন করিয়াছেন, তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন, যখন স্মরিলেন সিদ্ধার্থ চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও ভৎকৃষ্ট বসন পরিহৃত্যগ করিয়া চাঁবধারিণী হইলেন। সিদ্ধার্থের স্তায় তিনিও একাধারী, ভূষণ্যাশারিনী হইয়াছিলেন। মুৎপাত্ত জিন্ন তিনি অজ্ঞ কোন পাত্রে আহাষ গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজহুমার উহার পার্ণিপ্ৰার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ জিন্ন অজ্ঞ পুরুষের কথা তিনি কখনও শ্রবণে স্থান দেন নাই। বৌদ্ধরা বলেন, অতীত জন্মেও তিনি বরার বোধিসত্ত্বের সত্চর্ষিণী ছিলেন এবং এইরূপে সতীত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।" —ঈশানচন্দ্র ঘোষ

শব্দের আশীর্বাদে স্বামী পুনর্জীবিত হলে চন্দ্রা বলে, চলুন প্রভু, এই ঈর্ষ্যা ও কামের বশবর্তী মনুষ্য-সমাজকে ত্যাগ করে আমরা সেই চন্দ্রপর্বতেই ফিরে যাই, বলে :

কমলকুমুদে হ্রসোভিত কত বহে শ্রো ঠাণ্ডা সেট গরিববে  
 একরাজি ছলি মলয় হিমোলে জুড়ায় শ্রবণ হুমধুব হবে, —  
 চল দুহুজনে বিহাবি নেখানে, মাচ্চ'ব পথ কাবয়া বর্জন,  
 যার্মিব জীবন স্মখে অচক্ষণ কবি পবম্পর প্রিয় সস্তাধণ ।

বাজপুত্র নন্দ গিয়েছিলেন কপিলাবস্তুব অপব প্রাস্তে একটি নিভৃত নিকেতনে জনপদ-কল্যাণীর গৃহে। তাকে আসন্ন উৎসবেব সংবাদ দিতে। মিলনকামী ছুটি তরুণ-তরুণীবে সে'দনটি স্বর্ণাক্ষবে লিখে রাখবাব মত।

দিবসান্তে নন্দ ফিরে এলেন আশ্রোধানাম বিহাবে। প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল তাব। প্রশ্ন করে বসলেন অগ্রজকে—এই বাজেশ্ববেব বিনিময়ে, যশোধবাব মতো স্ত্রী, শাহুলেব মতো পুত্রবে বিনিময়ে কী সম্পদ আপনি পেয়েছেন ?

বুদ্ধদেব বললেন—শুনেতে চাও তা ৭ বস তাহালে ওখানে।

বৃতপ্রদীপ-জ্বালা সেই নিজন সন্ধ্যায় কন্ধদাব বক্ষে ছুই ভাইবে কা কথোপকথন হ'বেছিল, তা তৃতীয় ব্যক্তির কণগোচব হয় নি।

গভীর বাত্রে দ্বাব খুলে বেবিযে এলেন বুদ্ধদেব। সাবিপুত্রকে ডেকে বললেন—নন্দকে প্রব্রজ্যা দান কব। সে সন্ন্যাস নেবে।

পবদিন সংবাদ পেয়ে ছুট এলেন শুদ্ধোদন, এলেন মহাগৌতমী। কিন্তু সবনাশ যা হবাব পূব বাত্রেই হয়ে গেছে। বাজকুমাব নন্দেব মস্তক যুক্তিত—তাব দক্ষিণ কবে ভিক্ষাপাত্র, অঙ্গে পীত অর্জিন। মুছিনা হয়ে পড়লেন মহাগৌতমী। আব বজ্রাহত পবত-শিখবেব মত এ ১১ম আঘাত অবিচলচিত্তে গ্রহণ কবলেন মহাবাজ শুদ্ধোদন। তিনি ক্ষত্রিয়, অশ্রব সান্ধ্যনা তাব জন্ম নয়—তা'ব চেয়ে এক ফোটা জগ নেই।

ফিরে এলেন নতমস্তকে বাজপ্রাসাদে। হাতাকাব উঠল সমস্ত বাজ্যে। নিবিযে দেওয়া হল উৎসব-দীপাবলী, ভেঙে ফেলা হল পুষ্পতোবণ। দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুদ্ধোদনেব—অচিবে অবসবগ্রহণ তা'ব ললাট-লিখন নয়। যতদিন না বালক বাহুল উপযুক্ত হয়, ততদিন তা'ব মুক্তি নেই। এ মমানুষিক ছুঃস বাদে নীববে নতমস্তকে ফিরে গেল প্রজাবন্দ যে যাব গ্রামে।

নাটকেব ৮১ম মুহুর্তে কিন্তু এখনও আসে নি।

কপিলাবস্তুব অপব প্রাস্তে নিভৃত নিকেতনে প্রসাধনদক্ষা জনপদ-কল্যাণীকে সাজিয়ে তুলছিল বধুবেশে। আজ তা'ব বিবাহ এবং আজই তিনি হবেন এ বাজ্যেব বানী। আকৈশোবেব স্বপ্ন আজ সফল হতে বসেছে কল্যাণীবে। সেই উৎসবমুখব নিভৃত কুঞ্জে এসে দাঁড়াল একজন ভগ্নদত, নন্দেব গনুচব। তা'ব হস্তে নন্দেব প্রত্যাখ্যাত রাজমুকুট। হতভাগ্য সংবাদ বহন কবে এনেছে—বাজকুমার নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন !

এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না জনপদ-কল্যাণীর! মূর্ছাতুরা মন্দভাগিনী লুটিয়ে পড়ল ভূমিশযায়। সে মূর্ছা আর তার ভাঙে নি।

জীবিতাবস্থায় যে মর্ষাদা তাকে দেয় নি রাজপুত্র নন্দ, তার শতগুণ মর্ষাদা তাকে দান করেছেন অজ্ঞতার অজ্ঞাত শিল্পী—বিশ্বের অশ্রুতম শ্রেষ্ঠ চিত্রের সে আজ বিষয়-বস্তু! অজ্ঞতার ষোড়শ গুণাব মরণাহতা রাজকন্যার আলোখে শাস্বত হয়ে আছে হতভাগিনী। সেই বিখ্যাত—The Dying Princess.

এ-ঘটনার পব সপ্তদিবস অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে প্রচণ্ড অমৃতজ্বালায়, চরম অভিমানে দগ্ধ হচ্ছিলেন রাজল-জননী যশোধরা। আজ সেই 'সপ্তম দিবসেব চিহ্নিত মূর্ত্ত'। আজ তথাগত বুদ্ধ তাগ করে যাবেন ঞ্চপ্রোধারাম বিহার। আজ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যশোধরা। স্থিব করলেন, আজই তিনি হানবেন চরম আর্ঘাত। যে মানুষ্যটা তাঁর জীবন, তাঁর যৌবন, এ রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মমভাবে দলিত, মধিত করেছে, তাব উপব প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। বিধস্ত বাজামুচর কালুদায়ীকে ডেকে আদেশ করলেন, পুত্র রাজলকে একবার ঞ্চপ্রোধারাম বিহারে নিয়ে যেতে। সপ্তম-বর্ষীয় বালককে শিখিয়ে দিলেন, সে যেন ঐ নিষ্ঠুর উদাসীন মানুষ্যটার কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করে। পুত্রকে জন্মদান করেই পিতার কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে লালন-পালন করাও পিতার কর্তব্য। এই নিষ্করণ সংসারধামে সাবলয়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুত্রকে পথ-চলার পাথেয় পিতাকেই যোগাতে হয়। অভিমানক্ষুকা রাজবধু দেখতে চান সেই নিষ্ঠুর সর্বভাগী সন্নাসী কী পিতৃধন দিয়ে পুত্রের প্রতি পিতার এই প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদন করেন!

অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন যশোধরা। আজ তাঁর বাব বার মনে পড়ে যাচ্ছে সচশ্রুত চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা। আশ্চর্য, সে-জীবনের কথা আজ তাঁর কিছুই মনে নাই; কিন্তু ঐ অদ্ভুত মানুষ্যটি নাকি তপস্শ্রাবলে পূর্বনিবাসজ্ঞান<sup>১</sup> লাভ করেছেন। যশোধরা ভুলে গেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব ভোলেন নি চন্দ্রা-কিন্নরীর সেই আকুল আবেদন:

কমলহৃদয়ে স্মৃশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে  
তরু-রাজ ছিল মলয় হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ হৃদয় স্বরে,—  
চল হুইজনে বিহারি সেখানে, মাছুষের পথ করিয়া বর্জন,  
যাপিব জীবন হুখে অল্পক্ষণ করি পরম্পর প্রিয় সঙ্ঘাবন ॥

অথচ কী আশ্চর্য, সব কথা ভুলেও আজ যশোধরার হৃদয়ে সেই বাণী ঝঙ্কত হয়ে উঠছে; আর সব কথা না ভুলেও এ আহ্বানে বুদ্ধদেবের মনে কোন সাড়া জাগছে না!

(১) বৌদ্ধ পান্থমতে, বুদ্ধজন্ম কীর সময় বুদ্ধদেব পূর্বনিবাসজ্ঞানও (জাতিস্মরণ) লাভ করেছিলেন। পূর্ব পুত্র জন্মে তিনি বোধিসত্ত্বরূপে যে সব লীলা করেছেন, তা তাঁর স্মরণে আসে। বহুবার কথা-প্রসঙ্গে পিতৃদেব তিনি সেই সব জাতক-কথা বলে গেছেন।

(২) কোম্বোল-সম্পাদিত "জাতকার্ণবর্ননা" নামক মূল পালি ভাষার লিখিত গ্রন্থ থেকে শ্রীকৃষ্ণানচন্দ্র যোষ মহাশয় কর্তৃক হুন্দে অহুবাণ।

কেন এমন হয়? অথচ সেদিন কী দরদভরেই তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, 'চল ছুইজনে বিহারি সেখানে, মাস্তুলের পথ করিয়া বর্জন, যাপিব জীবন সুখে অক্ষুণ্ণ করি পরম্পর প্রিয় সম্ভাষণ!'

কিন্তু এত বিলম্ব হচ্ছে কেন বাছলের প্রত্যাবর্তনে? ক্রমে দিনান্তের ক্লাস্ত সূচ অস্তাচলগামী হলেন—ঘনায়মান হল সান্না অন্ধকার। আজ বুঝি অমাবস্তা? বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখেন বাহিরে ঘনান্দকার। বাজোছানে জোনাকির আলোয়। চিন্তাব উর্গনাভ বনে চলেন যশোধরা। তবে কি পুত্রের মুখ দেখে মন টলেছে সেই উদাসীন সন্ন্যাসীর? তাকে কি বৃকে টেনে নিয়ে আদর কবছেন তিনি? তাকে কি পাশে বসিয়ে জাতকেব কাহিনী শোনাচ্ছেন? তিনি কি পুত্রের কচি-কিশলয়তুলা নবম হাতটি ধবে স্বয়ং তাকে পৌঁছে দিতে আসবেন এই কক্ষে? ঐ কি তাঁদের পদধ্বনি!

পদশব্দে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে আসেন যশোধরা। দ্বাব উন্মোচন করতে গিয়েও হাত ওঠে না। যদি দ্বাব খুলে দেখেন, ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবতুলভকাঙ্ক্ষি মহাপুরুষটি!

না, পিতাপুত্র নয়—দ্বাব খুলে যশোধরা দেখলেন, ফিবে এসেছেন সেই বিন্মস্তু কালুদায়ী। কিন্তু এ কি? তিনি একা কেন? বাছল কোথায়?

-রাছল কোথায়? আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন রাছল-জননী।

-ঐগ্রোধারাম বিহাবে। আপনাব শিক্ষামত সেই অপাপাবদ্ধ বালক মহা-সন্ন্যাসীর কাছে পিতৃধন প্রার্থনা কবেছিল। মহাভিক্ষু তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান কবেছেন তাকে।

- কী সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ?

-প্রব্রজ্যা! বালক রাছল আজ সন্ন্যাসী!

বজ্রাহতার মত মুহূর্তে ভূমিশয়ায় লুটিয়ে পড়েছিলেন মুর্ছাহতা রাজবধু যশোধরা-- মন্দভাগিনী রাছল-জননী!

না! এ নাটকের চরম মুহূর্ত কিন্তু এখনও আসে নি! এ তো কোন পাখিব নাট্যকারের নাটক নয়—এ যে মহাকালের স্বহস্ত-লিখিত মহা-নাটক!

সহের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হল, ক্ষাত্র রূপতি শুদ্ধোদনের! এ সংবাদে তিনি বিক্ষোবকের মত জ্বলে উঠলেন। উন্মাদেব মত ছুটে গেলেন ঐগ্রোধারাম বিহারে। দেখলেন, পাশাপাশি বসে আছেন তিনজন ভিক্ষু পূর্বাশ্রমে যাদেব পরিচয় ছিল সিদ্ধার্থ, নন্দ ও রাছল--ওঁব জবাগ্রস্ত বক্ষের তিনটি পঞ্জর!

দেবশিশুব মত ঐ সপ্তমবর্ষীয় বালকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহাবাজ। কচি-কিশলয়ের উপর বালার্কসূর্যেব রক্তমাভাব মত দেখতে পেলেন সেই বালকের আননে এক স্বগীয় জ্যোতির আভাস। ক্ষাত্র ধর্মের অনুশাসন আর মনে রইল না শুদ্ধোদনের— ছুটি নয়নের বাঁধ ভেঙে অন্তরের নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় ভেসে যেতে ইচ্ছা হল তাঁর।



কিন্তু না! কাঁদবেন না তিনি। তিনি শাস্তি দিতে এসেছেন তাঁর দুৰ্বিনীত পুত্র সিদ্ধার্থকে। কঠিন কঠে প্রশ্ন কবেন—ঐ বালককে কোন অধিকাৰে প্ৰত্ৰজ্যা দান কৰেছ তুমি ?

নিৰ্বিকাব বৃদ্ধদেব ঝললেন—সে পিতৃধন প্ৰাৰ্থনা কৰতে এসেছিল। আমি ভিক্ষু, এই একটিমাত্ৰ সম্পদই ছিল আমাৰ কাছে। তাই দান কৰেছি ওকে।

: তুমি তো উদাসীন সন্ন্যাসী। পিতাপুত্ৰেৰ সম্পক কি স্বীকাৰ কৰ তুমি ?

: এ জগতে যিনি আমাকে এনেছেন, তাঁকে অস্বীকাৰ কৰি কি কৰে মহাবাজ ?

: কিন্তু পুত্ৰ কি পিতৃধন গ্ৰহণে বাধা ?

: বাধা বইকি মহাবাজ। পিতৃধন তো কেউ প্ৰত্যাখান কৰতে পাবে না।

ক্ষাত্ৰ তেজে অলাতখণ্ডেৰ মত জ্বলে উঠে মহাবাজেৰ দুটি আয়ত চক্ষু। বজ্ৰকণ্ঠে বললেন—তাঁই যদি হবে, তবে শোন সন্ন্যাসী, আমি কপিলাবস্ত্ৰৰ শাক্য ন্নপতি মহাবাজ শুদ্ধোদন। আমি জ্ঞৈক শাব্য সিদ্ধাৰ্ণেৰ জনক। হে উদাসীন নিষ্ঠুৰ সন্ন্যাসী, এবাৰ আমাৰ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দাও: আমাৰ সেই পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্ণ কি আজ প্ৰস্তুত আছে তাৰ পিতাৰ হাত থেকে বিনা বিচাৰে পিতৃধন গ্ৰহণে ?

শিহবিত হয়ে ওঠেন সাবিপুত্ৰ, উৎকৰ্ণিত হয়ে পড়েন মহামোদগল্লায়ন। এ কী কথা।

আসন ত্যাগ কৰে যুক্তকৰে উঠে দাঁডান বৃদ্ধদেব। অবিচলিতচিত্তে বলেন: আছে বই কি মহাবাজ।

এ উত্তৰেৰ জগা বোধকৰি প্ৰস্তুত ছিলেন না শুদ্ধোদন। জগদত্ৰাতা ভগবান বৃদ্ধদেব আজ তাঁৰ সন্মুখে যুক্তকৰে দণ্ডায়মান। পিতৃধন শোধ কৰতে উদ্যত তিনি নিঃসৰ্ভে গ্ৰহণ কৰতে চান পিতৃধন। শুদ্ধোদনেৰ মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন পূৰ্বকাৰ কথা। শিশু গৌতমেৰ কথা, বালক সিদ্ধাৰ্থেৰ কথা। অপবাধী পুত্ৰকে তিনি কতবাব কত শাস্তি দিয়েছেন। আজ আবার তাকে সেই শাস্তি দিতে হবে। হা, কঠোৰতম শাস্তি। সেই সিদ্ধাৰ্থ আজ আবার অন্তায় কৰেছে। অত্যন্ত গগ্ৰায়। সে কেডে নিয়েছে জৰা-গ্ৰস্ত বৃদ্ধেৰ শেষ যষ্টি। মনে পড়ে গেল, মন্দভাগিনী জনপদ-কল্যাণীৰ কথা। এই উদাসীন সন্ন্যাসীৰ নিষ্ঠুৰ আঘাতেই হতভাগিনী ভগ্নহৃদয়ে প্ৰাণত্যাগ কৰেছে। মনে পড়ল, সেই হতভাগিনী মহাগৌতমীৰ কথা—সিদ্ধাৰ্থকে তিনি মানুষ কৰেছিলেন, নন্দকে গৰ্ভে ধাৰণ কৰেছিলেন—আজ তিনি ভগ্নহৃদয়ে বোগশয্যায় লীনা। মনে পড়ল, সৰাৰ উপৰে তাঁৰ কল্যাণময়ী চিবভুগ্ৰিনী পুত্ৰবধুৰ কথা। তাৰ মুৰ্ছা এখনও ভাঙে নি। এদেব সকলেৰ হয়ে প্ৰতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। কী শাস্তি দেবেন তিনি ? কী আদেশ কৰবেন ? বলবেন কি—ফিৰিয়ে দাও বাস্তলকে ? বলবেন কি গাৰ্হস্থ্যাশ্ৰমে ফিৰে আসতে হবে তোমাকে ?

গ্ৰহণেৰ মুত্ৰায় দুটি বাছ মহাবাজেৰ সন্মুখে প্ৰসাৰিত কৰে জগদত্ৰাতা বৃদ্ধদেব বললেন—আপনি আমাকে পিতৃধন দান কৰুন পিতা।

সারিপুত্র কি একটা কথা বলতে গেলেন, কিন্তু বাকাস্কৃতি হল না তাঁর।

সংবিৎ ফিরে পান শুদ্ধোদন। কিন্তু নিজের কথা তখন আর তাঁর মনে পড়ল না। বললেন: হাঁ, গ্রহণ কর এই পিতৃধন, এ আমার অল্পরোধ নয়, আদেশ! প্রতিজ্ঞা কব, পিতামাতাব সম্মতি-বাতিরেকে কোন নাবালককে আর কখনও প্রব্রজ্যা দান কববে না তুমি!

: এ আদেশ শিরোধার্য কবলাম পিতৃদেব!

বুদ্ধমলাভ করার পর এই প্রথম এবং শেষবার বিশ্বত্রাতা মহামানব গৌতমবুদ্ধ কোন মরমাল্লুষের আদেশ বিনাবিচাবে নতমস্তকে শিরোধার্য কবেছিলেন।

নন্দের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণেব চিত্র-নাটকের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে শক জনপদ-নায়ক কালুদায়ী অস্বারোহণে কপিলাবস্ত্রতে আসছেন বুদ্ধদেবের আগমনবার্তা ঘোষণা করতে ( ১৬৩-ক )। কপিলাবস্ত্র নগর-তোরণ অতিক্রম করছেন তিনি। তোবগদ্বাবেব পরেই দেখছি একটা অশ্ব উঁঞ্চ মুখে হ্রেষাধ্বনি করছে। তাব পিঠে কোনও সওয়ার নেই। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সওয়ার যখন ঘোড়াকে ছেড়ে দেয়, তখন সে ঠিক এভাবে আরামেব হ্রেষাধ্বনি করে না কি? পাশেই স্তম্ভময় একটা মণ্ডপেব নীচে বুদ্ধদেব, সম্ভবতঃ, তিনি স্ত্রোগ্রোধারাম বিহারে দণ্ডায়মান ( ১৬৩-খ )।

পরে, একটু নীচে দেখছি, বুদ্ধদেব পুনরায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বামহস্তে ভিক্ষা-পাত্র, দক্ষিণহস্তে তিনি আশীর্বাদ কবছেন একটা নাবী ও একটা শিশুকে। একটু সম্মুখে পুনরায় সেই মহাভিক্ষুব গালেখা ( ১৬৩-গ )। এবাব লক্ষণীয়, তাঁব নন্দের ধর্মান্তবগ্রহণ সম্মুখে ও পশ্চাতে একই শিশুর চিত্র ছবাব আঁকা হয়েছে। যেন আনন্দের আতিশয্যে কপিলাবস্ত্র পথে ভিক্ষারত বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ কবে নৃত্য কবছে একটা শিশু! সম্মুখে আরও সাত-আটজন পুববাসী। তাবদেব মুখাকৃতি দক্ষিণ ভারতীয়। সর্বনিম্নে দেখছি দণ্ডায়মান বুদ্ধদেবের পদপ্রান্তে প্রণামরত বাজকুমার নন্দ বলছেন—আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন!

এর নীচে কিছু পলেস্তারা খসে পড়ছে। তারও নীচের দৃশ্যটিতে ( ১৬৩-ঘ ) স্ত্রোগ্রোধারামের বিহারে নন্দের মস্তক মুণ্ডন করা হচ্ছে। সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট তথাগত বুদ্ধ, তাঁর পাশে অপর একজন ভিক্ষু—সম্ভবতঃ সারিপুত্র। প্রামাণিকের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে। পরের প্যানেলে মুণ্ডিতমস্তক নন্দ কবলয়কপোলে উপবিষ্ট—অত্যন্ত চিন্তাক্রিষ্ট মর্মাহত মূর্তি তাঁব ( ১৬৩-ঙ )। অদূরে ছজন ভিক্ষু কি যেন জল্পনা করছেন—অজুলি-সঙ্ঘেতে নন্দকে নির্দেশ করছেন। তাব পরের প্যানেলে দেখছি, শূণ্যপথে বুদ্ধদেব ও নন্দ আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছেন।

কাহিনীর এ অংশটুকু বলা হয় নি, তাই চিত্রগুলি ছর্বোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সে-টুকু বলে নিই এবাব।

জনপদ-কল্যাণীর মৃত্যু-সংবাদে একেবারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন নন্দ। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে প্রশ্ন করেন—কল্যাণীর বিরহে তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? ধর্মাচরণে তোমার মন নেই কেন?

নন্দ বলেন—এমন নারীর ত্রিভুবনে আর নেই, আর হবে না!

বুদ্ধদেব বলেন—ভ্রান্ত ধারণা তোমার; এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাব। সেখানে স্বর্গের অঙ্গরাদেবের দেখলে বুঝতে পারবে, ত্রিভুবন সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা, এ বিশ্বত্রফাণ্ড তার চেয়েও বড়।

বিশ্বাস হয় না নন্দের। বুদ্ধদেব তখন অমুজকে নিয়ে যান স্বর্গে। নন্দ মুগ্ধ হয়ে যান সুরললনাদের দেখে! নারীর দেহে যে এত রূপ থাকতে পারে, এ তাঁর কল্পনাই ছিল না। মর্ত্যে ফিরে এলেন ওঁরা। নন্দ বলেন—আপনি যে সব অমুশাসনের কথা কলছেন, তা ঠিক ঠিক মেনে চললে আমি অস্থিরে ঐ রকম একটি নারীর ত্রিভুবন পাব?

বুদ্ধদেব মুগ্ধ হেসে সংক্ষেপে বললেন—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

মুগ্ধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ব দল। ওরা বাঙ্গ-বিক্রম করে। এমন কি ওদের একজন বলে—বাজকুমার নন্দ উদ্ভাদ হতে পারেন, কিন্তু প্রভু কি করে ঐ রকম প্রতিশ্রুতি দিলেন?

শুনে জ্ঞানবুদ্ধ সারিপুত্র তাকে ধিক্কাব দিয়ে বলেন—তোমরা কি প্রভুরও বিচার করতে চাও?

লজ্জিত হয় সেই বৌদ্ধ শ্রমণ; প্রায়শ্চিত্ত করতে বসে সে।

পুনরায় যেদিন নন্দ একই প্রশ্ন করলেন তাঁকে, তখন তিনি বললেন—নন্দ, এতদিন তুমি জনপদ-কল্যাণীর রূপে অন্ধ ছিলে। আজ স্বর্গের অঙ্গরাদেবের দেখে তাকে ভুলেছ! সত্য কি না?

নন্দ লজ্জিত হয়ে স্বীকার করেন সে-কথা।

বুদ্ধদেব বলেন—কিন্তু এ-ও তোমার ভ্রান্তি নন্দ; এব চেয়েও মহৎ সম্পদের সন্ধান যখন পাবে, তখন দেখবে স্বর্গের অঙ্গরাদেবের কথাও ভুলে গেছ তুমি!

মর্মান্বিত লজ্জিত হলেন নন্দ। এর পর থেকে কায়মনোবাক্যে ধর্মাচরণে মন দিলেন তিনি। বস্তুতঃ, সেইদিনই তিনি হলেন প্রকৃত অর্হৎ!

আকাশপথে উড্ডীয়মান ঐ মূর্তি ছুটি এবং বিমর্ষ নন্দের দিকে নির্দেশবত বৌদ্ধ ভিক্ষু, এ-ছুটি এই কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত।

এর পরে বলতে হয় মরণহতা রাজকন্যাব চিত্রকথা ( ১৬৩-৮ ):

অজস্কার এই অমৃতম শ্রেষ্ঠ চিত্রটি দেখে গ্রীষ্মিক বলেছিলেন—“The Florentines could have put better drawing, and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it.....”

চিত্রে ( চিত্র—৫৯ ) সর্ববামে দেখাছ ছুটি পুরুষচিত্র। একজনের হাতে নন্দের রাজ-মুকুট, অপরজন জনপদ-কল্যাণীকে কিছু বলতে চায়। কল্যাণী একটি শয্যায় অর্ধ-শায়িতা—

মূর্ছাতুরা মর্তি তাব। রাজমুকুটের দিকে বেচারী তাকাতে পারছে না। পতনোন্মুখ কলাগীকে পিছনে থেকে একজন ধরে আছে। সম্মুখে আর একজন সেবিকা তার নাড়ির গতি লক্ষ্য করছে। তৃতীয় দণ্ডায়মানা একজন ব্যক্তিনীকে মবণাহতা রাজকন্ডা তাকে বাতাস দিচ্ছে। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া। স্তম্ভের যতি-চিহ্নেব ওপাশে আব একটি খণ্ডদৃশ্য। মণ্ডপের বাহিরে একজন কিস্কবী ( সম্ভবতঃ নিঃশ্রা ) একজন মহিলা চিকিৎসকেব নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। চিকিৎসকেব বামহস্তে ঔষধ-ভঙ্গাব, দক্ষিণহস্তেব কবাস্কুলি দুই-সংখ্যাকে সৃচিত করেছে। তিনি হয় বলছেন - আব দুই দণ্ডেব ভিত্তব রোগিনীব যন্ত্রণাব চির উপশম হবে; অথবা বলছেন ঔষধ দুইবাব সেবা।



চিত্র—৫২

মবণাহতা রাজকন্ডা ( জনপদ-কলাগী )

অবস্থান—১৬৩-৮

চিত্রটির বর্ণনাশেষে গ্রীকিথ বলেছেন—“For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art.”

বোধ করি এ-চিত্রের সমালোচনায় এটিই শেষ কথা !

সম্মুখেব প্রাচীরে হস্তি-জাতকেব একটি কাহিনী ছিল ( ১৬৪ ) ; বর্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। পাশের প্রাচীরে আর একটি জাতক-কাহিনী ( ১৬৫ )। চিত্রগুলি

অক্ষত ; কিন্তু এটিকে সনাক্ত করা যায় নি। দেখছি, একজন অস্বাভাবিক...একটি বালক চারজন লোককে কি বলছে...নীচে ছুটি লোক এক শিশুকে ধরে আছে। একজন ধরেছে, দুটি হাত, অপরজন দুটি পা।...তৃতীয় জন তরবারি উত্তোলন করেছে শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে। গাইড হয়তো বলবে—এ সেই কাজীর বিচারের গল্প। সেই ছুটি নারী একটি শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে এবং কাজী এই বিবাদে মীমাংসা করতে চান শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে। অস্তুতঃ আমাকে গাইড তাই বলেছিল। কিন্তু কাহিনীটি তা নয়—যে দুজন শিশুটিকে ধরে আছে তাব একজন রমণী, অপরজন পুরুষ !

নন্দের কাহিনীর পবে কয়েকটি মানুষী-বুদ্ধের চিত্র ( ১৬৬ )। তারপর প্রাচীরের প্রান্তে দুটি ছোট্ট চৌখুপিতে দুটি অপূর্ণ শিল্প-নিদর্শন। একটি পুরুষ ( ১৬৭-ক ) ও অপরটি নারীচিত্র ( ১৬৭-খ )। মীর্জা ইস্‌মাইল বলেন, তিনি এদের নামকরণ করেছেন যুগনয়ন ও মীননয়না।

ও-পাশে বুদ্ধদেবের পমপ্রচারের একটি চিত্র ( ১৬৮ ) নষ্ট হয়ে গেছে। তাব পাশে, গ্রীকিথ সাহেব বলছেন, তাব আমলে ছিল একটি হস্তি-শোভাযাত্রার দৃশ্য। অজাতশত্রু হস্তিপৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের দর্শনমানসে চলেছেন ( ১৬৯ )। বর্তমানে কিছুই নেই। অপব প্রান্তে বুদ্ধদেবের আর একটি চিত্রও কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত ( ১৬১০ )।

বেরিয়ে এলাম ষোড়শ গুহা-মন্দির থেকে। পথে নেমে ইস্‌মাইল-সাহেবকে প্রশ্ন কবি -আপনি তো কলা-রসিক। বলুন তো অজস্রায় কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে সুন্দর ?

উনি আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলেন—নন্দের উপাখ্যানটা মন দিয়ে শোনেন নি দেখছি।

অবাক হয়ে বলি—কেন ? এ-কথা কেন বলছেন ?

—শুনলেন না, মানুষের সৌন্দর্যবোধ আপেক্ষিক। স্বর্গের অঙ্গরা না দেখা পর্যন্ত নন্দ মনে করতেন, জনপদ-কল্যাণীই ত্রিভুবনে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা!

আমি বলি -কিন্তু আপনি তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আছেন এখানে। অজস্রার-ত্রিভুবনে দেখতে তো আর কিছু বাকি নেই আপনার। আপনার বাক্তিগত মতে কোন নারীচিত্রটি সবচেয়ে সৌন্দর্যের স্রোতক ?

এক টুকরো হাসি খেলে গেল ইস্‌মাইলের বলিরেখাঙ্কিত মুখে। বলেন—শুনতে চান আমার অভিমত ? বেশ বলছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রতিশ্রুতির জবাব দেবেন ?

বুঝতে পারি ওঁর প্রতিশ্রুতিটা কি। উনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আমার চোখে কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমি কোন্টিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলব। মনে মনে উপযুক্ত উত্তরটি প্রস্তুত করছিলাম, কিন্তু ওঁর প্রশ্ন শুনে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বলেন—আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেছেন ওঁদের কথায় ?

অবাক হয়ে বলি--কাদের কথা ?

—ঐ দারোয়ান, গেট-কীপার, কিংবা টিকিটবাবুর কথা ?

আমতা আমতা করে বলি— কি কথা বলুন তো ?

—যে বড়ো মীর্জা ইসমাইল একটি ছবির প্রেমে পাগলা মেহেরালি হয়ে গেছে ?  
লজ্জায় মাথাটা আর তুলতে পারি না ।

উর্ন হেসে বলেন—আপনি লজ্জা পেয়েছেন বাবুজি । কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওরা বোকার মত ভুল বলে । ইয়া স্বীকাব করছি, এখানকার একটি বিশেষ চিত্রকে আমার বিশেষভাবে ভালো লাগে । মাঝে মাঝে একেবারে একা হয়ে পড়লে, ওখানে গিয়ে আমি দাঁড়াই । কিন্তু কেন জানেন ? তার কারণ, এ অজন্তা গুহায় ঐ একটিমাত্র চিত্র আমি আজও ভালো করে দেখি নি ! দেখবার সুযোগ পাই নি । ওর সামনে দিয়ে যখনই যাই, দেখি দারোয়ানগুলো আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে, গা টেপা-টেপি করছে, হাসছে ! ওদের উৎপাতে, বিশ্বাস ককন, আজ ছয় মাসেব মধ্যে সেই চিত্রটির দিকে একবারও মুখ তুলে তাকাই নি !

মরমে মরে গেলুম আমি !

কিন্তু এর পরের প্রশ্নটিতে আবার সন্দেহ হল—ভদ্রলোক কি সম্পূর্ণ স্মৃষ্ণ-মস্তিষ্ক ?  
হঠাৎ দাঁড়িয়ে গড়ে উর্ন বলেন—আপনি আপনার স্বীকে ভালবাসেন ?

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক ।

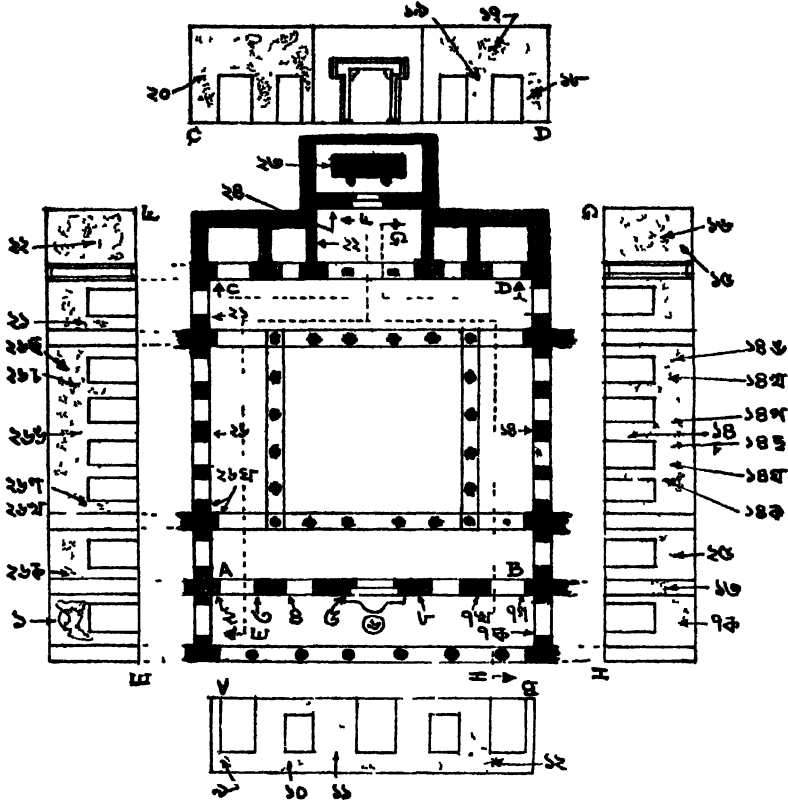
কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না কবেই উর্ন বলতে থাকেন—কিন্তু কেন ? তার কারণ, তাঁর সঙ্গে আপনার জীবন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ । তাঁকে আপনি নিতা দেখেন, তাঁর সঙ্গে আপনার অন্তরের ভাব-বিনিময় হয় । এই চিত্রগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তাই । এখানে যখন প্রথম আসি, তখন আমার বয়স বাইশ-তেইশ । সংসারে আমার কেউ নেই, চিত্রগুলিই আমার খেলার সাথী ! দীর্ঘদিন ওদের মাঝে থাকতে থাকতে ওদের ভালবেসে ফেলা কি আমার অপরাধ, না সেটা অসম্ভব কিছু ?

আমি বলি—আমি তো তা বলি নি ।

আমার কথা ওঁর কানে যায় না । কমন যেন একটা ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন রুদ্ধ । দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অশ্রুমনস্কের মত আমার হাতটি তুলে নিয়ে বলেন—বাবুজি ! আমি বাঙলা ভাষা জানি না—কিন্তু ইংরাজীতে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের ‘স্মৃষ্ণিত পাৰাণ’ গল্পটি আমি পড়েছি । আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন অমন ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে ?

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে গেল !

ঠিক সেই সময়েই কলরব-সুখরিত কলেজের একদল ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির হল বিপরীত দিক থেকে । বোধ হয় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ওঁর ।



চিত্র - ৬০

সপ্তদশ গুহা-মন্দিবেব প্ল্যান

- |    |                                   |    |                                   |    |  |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|--|
| ১  | সংসার-চক্র                        | ১৩ | প্রসাধনরতা রাজকণ্ঠা<br>(চিত্র-৬৩) | ২১ | স্বতসোম-জাতক                                   |
| ২  | দানেব দৃশ্য                       | ১৪ | সিংহল অবদান জাতক                  | ২২ | সার্বপুত্রের পশীক্ষা<br>(চিত্র-৬৬)             |
| ৩  | মূর্ত্তুরা মাদ্রী ও বিধাস্তর      | ক  | বাণিজ্যাতবী জলমগ্ন                | ২৩ | গর্ভমন্দিবে ষ্ণগদাবেব বুদ্ধমূর্ত্তি            |
| ৪  | শক্রেব মর্ত্তো আগমন<br>(চিত্র-৬১) | খ  | বাজসীদেব হত্যা-উৎসব               | ২৪ | গোপা, বাহল ও বুদ্ধদেব<br>(চিত্র-৬৭ ও চিত্র-৬৮) |
| ৫  | আটজন মান্ধবী-বুদ্ধ                | গ  | বোধিসত্ত্ব অশ্বরাজ                | ২৫ | শিবি জাতক (চিত্র-৬৯)                           |
| ৬  | ছয়জন নর্ডকী (সিলিঙে)             | ঘ  | সিংহ-কেশবীব দরবার                 | ২৬ | বিশ্বাস্তব জাতক                                |
| ৭  | নলগিবি দমন                        | ঙ  | সিংহ-কেশরী হত্যা                  | ক  | তরবারি দান                                     |
| ৮  | বেগবনে ধর্মপ্রচাববৎ বুদ্ধদেব      | চ  | বিজয়সিহেব যাত্রা                 | খ  | কলিঙ্গবাসীর ভিক্ষা প্রার্থনা                   |
| ৯  | নলগিরির স্দমস্ত আক্রমণ            | ছ  | অভিষেক (চিত্র-৬৫)                 | গ  | পুষতীর নিকট বিদায় যাজ্ঞা                      |
| ১০ | নলগিবি বুদ্ধকে প্রণামরত           | ১৫ | কতিপথ বুদ্ধ চিত্র                 | ঘ  | মাদ্রীর নিকট বিদায় যাজ্ঞা                     |
| ১১ | কৃষ্ণা-অঙ্গর। (চিত্র-৬২)          | ১৬ | মহিষ-জাতক                         | ঙ  | রাজপথে রথারূত বিবাস্তব                         |
| ১২ | হস্তিজাতক (অবলুপ্ত)               | ১৭ | শরভ-জাতক                          | চ  | রথীশ্ব দান                                     |
| ১৩ | মহাকপি-জাতক                       | ১৮ | শ্রাম-জাতক                        | ৮  | সঞ্জয় সম্মুখে জুজুব।<br>(চিত্র-৭০)            |
| ১৪ | বড়দন্ত-জাতক                      | ১৯ | মাতৃ-পোষক জাতক                    |    |  |
| ১৫ | ষ্ণগ-জাতক                         | ২০ | স্বতসোম-জাতক                      |    |  |

যেন সংবিৎ ফিবে এল ফের। আমাব হাতটি ছেড়ে দিয়ে বলেন - লেট্‌স্ নাউ গো টু কেভ নাথার সেভেনটিন—তু ট্রেসাব-হাউস অব অজস্তা ফ্রেস্কোস্।

মীর্জা ইস্‌মাইল কিছু অত্যাক্তি কবেন নি। সপ্তদশ গুহা-বিহাবটি অজস্তা-চিত্রের স্বর্ণভাণ্ডার। অসংখ্য জাতক-কাহিনী থবে থবে সাজানো - যেন আর্ট গ্যালারি।

দাক্ষিণাত্যেব বাজা ঋষিক তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাব স্মৃতিরক্ষার্থে নাকি এই বৌদ্ধ বিহাবটি খনন কবান এবং নানান্ চিত্র-সম্ভাবে এটিকে সাজিয়ে তোলাব ব্যবস্থা কবেন। ষোড়শ বিহাবে দেখেছিলাম গৌতমবুদ্ধেব জীবনেব নানান্ কাহিনী অবলম্বনে চিত্র-সম্ভাব সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সপ্তদশ বিহাবে জাতক-কাহিনীব প্রাবল্য

সপ্তদশ বিহার

লক্ষ্য হল। কেব্দ্রস্তু হল-কামবাটি একটি পূর্ণ চতুষ্কোণ। ৬৪ ফুট দীর্ঘ ও প্রস্থ। কুড়িটি স্তম্ভে এই কেব্দ্রস্তু হল-কামবাটি স্তম্ভাভিত। সম্মুখেব আলন্দে দাঁড়িয়ে প্রথমেই নজবে পড়ে সুবহুং সংসাব-চক্রটিকে ( ১৭১১ )। আট-দশ ফুট বাস বিশিষ্ট একটি বৃত্ত, অনেকটা প্রকাণ্ড ঘড়িব মত। নীচেব দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। চক্রেব বিভিন্ন খোপে গ্রামীণ ও নগবজীবনেব ছোট ছোট খণ্ডচিত্র বিধৃত। বিষয়-বস্তু কী কী ছিল আজ আর তা বোঝা যায় না<sup>১</sup>, মনে হয়, একটি খোপে বলদ দিয়ে চাষ কবানো হচ্ছে, আব একটি খোপে নবনাবীব মিথুন-মৃতি। চিত্রেব বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ বৃক্সতে না পাবলেও অনুভব কবা যায়। এ সংসাব-চক্রেব পাবে পাকে তোমাকে আমাকেও যুবতে হচ্ছে। এই প্রবর্তিত চক্রেব অনুবর্তন যে কবে না -বোব কবি 'মোষণ পার্থ স জীবতি'। উপবে দেখতে পাচ্ছি ছুটি সবুজ বড়ব কবাস্থলিব আভাস। অনেকক্ষণ ভাল কবে নজর কবলে তা দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পীব বক্তব্য যিনি এ চক্রেব চক্রেধাবী, যন্ত্বেব যন্তী, তাঁকে প্রত্যক্ষ কবা যায় না, গুধু অনুভব কবা যায় তাব কবাস্থলিব স্পর্শ। তাব পাশেই একজন বাজা দান কবছেন। খুব সম্ভবতঃ এটি বিশ্বাস্তব জাতক-কাহিনীব অংশ ( ১৭১১ )। দেখছি, বাজাব পাশে চাবজন অমাতা ভিক্ষুকেব দল দান গ্রহণ কবছে।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক শিশুকোডে জননী রাজা একটি তোবণদ্বাব অতিক্রম কবছেন। একটি সভামণ্ডপে বাজা ও মূর্ত্যুভাব তাঁব বানী ( ১৭১৩ ) এ চিত্রগুলি বিশ্বাস্তব-জাতকেব অংশ, সেই জাতক-কাহিনীটি যখন বলব, তখন এ চিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। চিত্রের মিছিল চলছে একটানা স্বর্ণ থেকে সপার্বদ শক্রে (ইন্দ্র) নেমে আসছেন পৃথিবীতে, বিশ্বাস্তবকে পবীক্ষা কবতে ( ১৭১৪ )... গতিবেগে উডছে তাঁব উত্তরীয়, তাঁব কণ্ঠেব শতনবী।

(১) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে সার জেমস্‌ ফাউ সন বলেছিলেন

'১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্লেক এই সংসাবচক্রে সবসমেত ৭৩টি ফিগার দেখেছিলেন। সেগুলি ছিল পাঁচ ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি মাপের। চক্রেব দুই-তৃতীয়াংশ তখন দেখা যেত। পরে অনুমান করা হয়, ডঃ বার্ড এখন থেকে ছুরি দিয়ে টেচে ছবি চুরি কববার চেষ্টা করেন—এখন এ চক্রেটির অতি সামান্যই পবিদৃশমান।' (বর্তমানে এক-বিশমাংশ অবশিষ্ট নেই।)



এই চিত্রটির প্রসঙ্গে একটি সাহিত্য আলোচনা করতে ইচ্ছা করছি। চিত্রে দেখছি, ঘন নীল আকাশের পশ্চাৎপটে আষাঢ়সঘন জলদ-স্তুবক, একেবারে থরে থরে সাজানো! .. মেঘ চলেছে ভেসে.. আর মেঘের সম্মুখে নভচারী সিদ্ধাচার্য গন্ধর্বেব দল তাঁদের বীণা, বংশী, বাণ্যযন্ত্রাদি নিয়ে দ্রুতগতি ভেসে চলেছেন মেঘের আগে আগে ( চিত্র—৬১ )।



চিত্র—৬১

সপার্বদ্ব ইন্দ্রের মর্ত্যে আগমন

অবস্থান—১৭৬

এ খণ্ডদৃশ্যটি ইন্দ্রের স্বর্গ থেকে নেমে আসার দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত -ফলে, মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বেমানান একটুও নয়। ইন্দ্র আকাশপথে নেমে আসছেন, তাঁর সঙ্গে বাণ্যযন্ত্র-ধারী গন্ধর্বেব দলও আসবেন বইকি তা যেন হল, কিন্তু এই খণ্ডদৃশ্যটি দেখে আমার মনে পড়ে গেল কালিদাসের মেঘদূতের একটি বিখ্যাত চরণ।—‘সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াবীর্ণভি-মুক্তমার্গঃ’। অর্থাৎ, দলে দলে মেঘ ধেয়ে আসছে দেখে সিদ্ধদম্পতি বীণা হাতে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ভয় হয়েছে জলকণায় তাদের বাণ্যযন্ত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।

ঐ খণ্ডচিত্রটি দেখে আমার কেমন জানি মনে হল, অজস্রা-শিল্পীর মনে মেঘদূতের ঐ বর্ণনাটি নিশ্চয়ই জাগরুক ছিল এ-পরিকল্পনার সময়। কিন্তু তা কি সম্ভব ?

এই সপ্তদশ বিহারটির নির্মাণকাল ৪৭০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাসের কাল নিয়ে

পাণ্ডিতরা একমত হতে পারেন নি—কিন্তু মান্দাসোবের সূর্যমন্দিবে বৎসভট্ট-লিখিত একটি লিপি পাওয়া গেছে, যার সময় হল ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। তার মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের “বিছাৎস্তুং ললিতবনিভাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ” শ্লোকেব প্রভাব অত্যন্ত স্থূলভাবে পড়েছে। তাই দেখে ইতিহাস-বেত্তা বেরীডেল কীথ বলেছেন, “স্মৃতরাং কালিদাস জীবিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় ৪৭২ অব্দেব পূর্বে, কাজেই তাঁর কাল খ্রীষ্টীয়-পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট কবা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।”

ফলে, এই খণ্ডচিত্রটিতে আমি যদি মেঘদূতের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমার যুক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মান্দাসোরে-উৎকীর্ণ ঐ শ্লোক আর অজন্তাব এই গুহা একই শতাব্দীর, একই দশকেব সম্পদ। আর এই সময়কালেব প্রায় সম্ভব-আশি বৎসর পূর্বে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য স্বীয় কণা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাতক-নৃপতি কঙ্গসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন। অজন্তার ঐ যুগেব শিল্পীরা বাকাতকী বাজাদেব অনুগ্রহভাজন ছিলেন এ-কথা মনে কবা স্বাভাবিক, আব প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে গুপ্তসম্রাটের রাজসভাব কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদ সে বাকাতক বাজসভায় এসেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক নজর আছে।

প্রবেশপথে তোরণের উপর আটজন মানুষী-বুদ্ধের (১৭১৫) আলেখ্য। তার নীচে আটটি ছোট ছোট চৌখুপিতে আট জোড়! মিথুন-চিত্র। প্রবেশপথেব দুপাশে ছুটি মর্মব মূর্তি—শালভাণ্ডুক। নারীমূর্তি। অলিন্দেব সিলিঙে কেন্দ্রস্থলে ছয়জন নর্তকী (১৭১৬) হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষণীয়, তাদের ছয়জনেব সর্বসমেত ছয়টি হাত আছে-বারোটি নয়।

দ্বারের দুই প্রান্তে বুদ্ধদেবেব জীবনের একটি স্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা—নলগিরি-দমন (১৭১৭)। কিন্তু তার পূর্বে বলতে হয়, এই প্রাচীরেই আছে অজন্তাব অগ্ৰতম শ্রেষ্ঠ নারীচিত্র—বিখ্যাত কৃষ্ণা-অঙ্গরা (১৭১৮)। এই কৃষ্ণা-অঙ্গরাও বায়ুভরে ভেসে চলেছে আকাশপথে—গতির জন্ম তাব কণ্ঠেব ইন্দ্রকাস্তমণিখচিত শতনরী একদিকে বেঁকে গেছে। মাথায় টায়রা ও মুকুটে মুক্তার ঝালরগুলিও সব একদিকে হেলে আছে। কিন্তু এ চিত্রেব আসল আবেদন কৃষ্ণা-অঙ্গরার ভাবাস্তমিত মদবিহ্বল অর্ধ-নিমীলিত ছুটি নয়নের দৃষ্টিতে (চিত্র—৬১)।

নলগিরি-দমন কাহিনীর ঘটনা বাজগৃহের। বিশ্বিসাবেব পব অজাতশত্রু তখন মগধের সিংহাসনে। পিতাব ধর্ম শোণিতের স্রোতে মুছে ফেলে দিতে তিনি বন্ধপরিষ্কর।

পূর্বপ্রান্তরের প্রাচীরে দেখছি বেহুবন বিহারে তথাগত বুদ্ধ সন্ধর্মের

মর্মকথা শোনাচ্ছেন (১৭১৭ ক)। এদিকে দেখছি, রাজসভায় অজাতশত্রুর কাছে স্বিকার্ধের অল্পজ দেবদত্ত সদন্তে ঘোষণা করছেন—বেদ, ব্রাহ্মণ আর রাজাকে যে ধর্ম একমাত্র পূজ্য বলে স্বীকার কবে না, সেই ধর্মের মূলোচ্ছেদ করবেন তিনি। অজাতশত্রু আর দেবদত্ত গোপনে জল্পনা করলেন বেহুবনেব ধর্মসভায় চালিত

কবে দেওয়া হবে একটি মদমত্ত হস্তীকে। শিল্পী এই বাজসভাব পাশেই ঐকোছেন বাজাস্তঃপুবেব একটি খণ্ডদৃশ্য। সেখানে দেখছি, ছুটি পুবকামিনী এ সংবাদে সন্ত্রস্তা। যদি মনে কবি, ঐ ছুটি মেয়েব নাম শ্রীমতী ও মালতী, তাহলে মহাবানী লোকেস্ববীব এ স্তম্ভঃপুবে ওবা কি বলাবলি কবছে তা সহজেই অনুমান কবতে পাবব। পবেব দৃশ্বে দেখছি, মদমত্ত একটি বাজহস্তীকে ধর্মসভাব দিকে চালিত কবে দেওয়া হযেছে (১৭১৭ খ) দেখছি, নলগিবি নামে সেই ক্ষিপ্ত গজবাজ উন্নত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে বাজপথ দিযে অগণি০ শীত নবনাবী প্রাণভযে ছুটে পালাচ্ছে একজন সান্ত্রী হাত তুলে সাবধানবাণী উচ্চাবণ



চিত্র— ৬২

কৃষ্ণা-অপবাব

অবস্থান ১৭১৮

কবছে বাজপথেব দুধাবে সাবি সাবি দিতল-বাড়া। একতলায় দোকান-ঘবৎলিতে সকলে প্রাণভযে পালাচ্ছে। দ্বিতলে অলিন্দে ও বাতায়নে ভযত্রস্তা পুবকামিনীদেব আলখা। এই বিবাট প্যানেলটিব একেবাবে শেষপ্রান্তে দেখছি, বিপবীতে দিক থেকে অগ্রসব হযে আসছেন নির্ভীক এক সন্ন্যাসী, প্রশান্ত তাব মূর্তি। দেখছি, প্রমত্ত নলগিবি সেই পরমপুরুষ গৌতমবুদ্ধেব সম্মুখে নতজান্ত হয়ে বসে পড়েছে, বুদ্ধদেব ওব গজবুখে সম্মেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন (১৭১৭ গ)।

এই চিত্র-কাহিনীৰ প্ৰতিটি চবিত্ৰ প্ৰাণবন্ত ও ভাব-ব্যঞ্জনাৰ বাহ্যিক। উদ্ভুক্ত জলপ্ৰপাত যেমন বিশাল হৃদেৰ বৃকে প্ৰচণ্ড বেগে কাঁপিয়ে পড়ে একেবাবে হাৰিয়ে ফেলে নিজেকে, তবলা-সহবাব তেহাই যেমন হঠাৎ এসে থামে সমেৰ মাথাৰ, ঠিক তেমনি এই প্ৰভঞ্জনগতি চিত্ৰ-নাটকেৰ যবনিকা পতন হল নলগৰি-দমনে। চিত্ৰটিৰ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, একই চিত্ৰে শিল্পী সবকয়টি বসেৰ পৰিবেশন কৰেছেন। বাজান্তঃপূৰে মিথুন-মূৰ্তিতে আদিবাসেৰ ইঙ্গিত, ক্ৰোধাঘিত গজাতশক্ৰেৰ বোঁদ্রবস, পলায়নপৰ নবনাবীৰ ভয়ানকবস, হস্তিপদ-দলিত মৃতদেহেৰ বীভৎসবস, আৰ্ত্তত্ৰাণেৰ প্ৰচেষ্টায় সান্ধীৰ বীৰবসেৰ ভূমিকা, মৃত অশ্বীয়েৰ সন্মুখে ক্ৰন্দনবতাৰ কৰুণবসেৰ অভিবাস্ত-সবই আছে, এবং সবাব উপবে পড়েছে শেষ দৃশ্যে শৃঙ্গাব-বীৰ-বোঁদ্র-ভয়ানক-বসেৰ বিপবীতধৰ্মী শাস্ত্ৰবসেৰ কৰুণাধাৰা। একই চিত্ৰেৰ পৰিসৰে নববসেৰ এমন খেলা আৰ কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

অলিন্দ অতিক্ৰম কৰে মণ্ডপেৰ ভিতৰে আসি। এবাবে প্ৰবেশদ্বাবেৰ দিকে মুগ কৰে A B-চিহ্নিত প্ৰাচীবেৰ ক্ৰেস্কোণ্ডলি একে একে দেখতে থাকি। বামপ্ৰান্তে হস্ত-জাতকেৰ কাহিনীটিকে উদ্ধাৰ কৰা গেল না (১৭১৯), কিন্তু তাৰ পাশে মহাকপি-জাতকেৰ প্ৰথম কাহিনীটি আছে অক্ষত (১৭১০)।

পূবজন্মে বোধিসত্ত্ব বাবাণসীৰ উপকণ্ঠে এক মহাকপিকপে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। ক্ৰমে তিনি হন সেই অঞ্চলেৰ বানববাজেৰ প্ৰধান। তাৰ অৰীনে তখন ছিল আশি সহস্ৰ বানব। বাবাণসীৰ দক্ষিণে গঙ্গাতীৰে ছিল একটি অতি বিশাল আশ্ৰমবৃক্ষ। সে বৃক্ষে ফল হত যেমন অস্বাভাবিক বৰমেৰ বড়, তাৰ স্বাদও ছিল তেমনি অতুলনীয়। গঙ্গাতীৰে এক বিজ্ঞ অবণেৰ একান্তে এই ফলবান বৃক্ষটিৰ সন্ধান পায় নি নিকটস্থ গ্রামেৰ মানুহ, তাই কপিৰাজ এই নিৰ্জন আশ্ৰমবৃক্ষটিতে সপাৰ্শদ বসবাস কৰতেন শান্তিপ্ৰিয় কপিৰাজ

এভাবেই মানব-সমাজকে এড়িয়ে নিকপত্ৰেৰ বানবকুলকে প্ৰতিপালন  
মহাকপি জাতক কৰতেন -তিনি বাবে বাবে অমুচবদেৰ বলতেন, যেন এই গোপন

সংবাদটি নিকটস্থ গ্রামে জানাজানি না হয়ে যায়। যেকসালেমেৰ মহামানবেৰ দ্বাদশ শিল্পেৰ মধ্যে যেমন আশ্ব-গোপন কৰে ছিল যুদাস, বানববাজেৰ অমুচৰদলে তেমনি লুকিয়ে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। শুধু তফাৎ এই যে, যুদাস একবাবেই বিশ্বাসঘাতকতা কৰবাব সন্মোগ পেৰেছিল, আৰ এই বিশ্বাসহস্তা প্ৰতি জন্মে বোধিসত্ত্বেৰ সঙ্গ জন্মগ্ৰহণ কৰেছে এই ধৰাধাৰে, আৰ প্ৰতিবাবেই উপকাৰেৰ বিনিময়ে বোধিসত্ত্বেৰ সৰ্ননাশ কৰবাব চেষ্টা কৰেছে এবং প্ৰতি জন্মেই বোধিসত্ত্ব তাকে ক্ষমা কৰেছেন। শেষজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন আবিৰ্ভূত হলেন শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধৰূপে, তখন সে-ও জন্মগ্ৰহণ কৰেছিল ঐ কপিলাবস্ত্ৰৰ বাজপ্ৰাসাদেই—সিদ্ধাৰ্ণেৰ অমুজ<sup>১</sup> দেবদত্তৰূপে। কপিৰাজেৰ ভয় ছিল, সেই দেবদত্তেৰ মাধ্যমে যেন না জানাজানি হয়ে যায় এই আশ্ৰমবৃক্ষেৰ অস্তিত্ত্বেৰ কথা।

(১) মতান্তরে, দেবদত্ত ছিলেন ঘোষণাৰ ভ্ৰাত।

ঘটনাচক্রে কোন একটি বানরের হস্তচ্যুত একটি আম গজাজলে পড়ে যায়, এবং সকলের অলক্ষ্যে সেটি শ্রোতের টানে ভেসে যায় উত্তর দিকে—বারাণসীর দিকে। কোন একটি ধীবরের জালে সেই ফলটি আটকে যায়। ধীবর সেই চূর্ণভদর্শন ফলটি নিয়ে যায় কাশীরাজের দরবাবে—সসন্মানে উপহার দেয় বারাণসীরাজকে। মহারাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি অল্পচরদের ডেকে বললেন, এই ফলবান বৃক্ষটির অবস্থার খুঁজে বার করতেই হবে। সসৈন্য কাশীবাজ গজাতীর ধরে দক্ষিণাভিমুখে চলতে থাকেন; গজাশ্রোতে যখন ভেসে এসেছে এ ফল, তখন নিশ্চয়ই গজাতীরে আছে এই বৃক্ষটি। অবশেষে সত্যই তিনি একসময় আবিষ্কার করে ফেলেন সেই রসাল বৃক্ষটিকে। বানর-সমাকীর্ণ সেই বৃক্ষটিকে দেখে মহারাজের হ্রস্ব ক্রোধ হল, তিনি তীরন্দাজ বাহিনীকে আদেশ করলেন, কপিকুলের হাত থেকে বৃক্ষটি মুক্ত করতে। অসংখ্য সৈন্য মুহূর্তমধ্যে গাছটি ঘিরে ফেলল; সপার্বদ কপিবাড় বৃক্ষে বন্দী হয়ে পড়েন; গাছ থেকে নেমে যে পালাবেন, তারও পথ রইল না।

বানর-দেবদত্ত দেখে এই সুযোগ; সে অগ্নাশ্র বানরদের বলে—বানবরাজের জ্ঞানই এ বিপদ। এস, আমরা আমাদের রাজাকে বন্দী কবে কাশীবাজের কাছে সমর্পণ করি। তাহলে তিনি আমাদের ছেড়ে দিতে পারেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত অগ্নাশ্র বানব প্রত্যাখ্যান করে এ ঘৃণিত প্রস্তাব। বোধিসত্ত্ব বানবরাজ তখন নিকরপায় হয়ে নিজ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন। নিজ দেহ বিস্তারিত করে তিনি গজার অপব তীরের একটি বৃক্ষকে হাত দিয়ে ধরেন—তার বিশাল দেহ এ-ভাবে লছ-মণবুলার সেতুর মত গজাব দুই প্রান্তে যোগসূত্র রচনা করল। বোধিসত্ত্ব বলেন আমাব এই দেহ-সেতুর উপর দিয়ে তোমরা গজার অপব পারে পলায়ন কর। আদেশমাত্র দলে দলে বানবকুল ঐ পথে গজার পরপারে পলায়ন করতে থাকে। বিস্মিত কাশীরাজ তীরন্দাজদের নিরস্ত করেন—বৃক্ষটিকে বানবরশূন্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; তাছাড়া, তিনি এই অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ডের শেষ দেখতে কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

একে একে আশি সহস্র বানব বিপন্নুক্ত হবার পব সর্বশেষে এগিয়ে আসে দেবদত্ত। সে-ও নিরাপদে ওপারে অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু দেহ-সেতু থেকে নিবাপদ আশ্রয়ে উল্লঙ্ঘনের সময় সেই বিশ্বাসঘাতক প্রবল পদাঘাতে বোধিসত্ত্বের মেরুদণ্ডেব অস্থি স্থানচ্যুত করে দিয়ে যায়।

আশি সহস্র বানবের দেহভাবে ক্রান্ততনু বোধিসত্ত্ব এ পদাঘাত সত্ত্ব করতে পাবলেন না—সশব্দে পতিত হলেন গজাগর্ভে। কাশীরাজ এতক্ষণ সমস্ত নাটকটি দেখছিলেন। তাঁর আদেশে রাজানুচরবা গজাগর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনে বোধিসত্ত্বের মৃদু দেহটি।

মহারাজ এতক্ষণে অল্পধাবন করেন, এ সামান্য বানব নন—এ কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা, সসম্মুখে তিনি বলেন—আপনি যখন এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তখন আমাব সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধদান করলেন না কেন ?

বোধিসত্ত্ব বলেন—প্রাণি-হত্যাব জন্ম এ ক্ষমতা প্রয়োগ করি না আমি—আর্তের  
ত্রাণের জন্মই শুধু অলৌকিক ক্ষমতাব ব্যবহার করি।

—কিন্তু আপনি যাদের উপকাব করলেন, তাদেরই একজন তো আপনাকে বধের  
উদ্দেশ্যে পদাঘাত কবে গেল ?

বানবরাজ স্মিতহাস্যে বলেন—তাই তো এ ছুনিযাব নিয়ম কাশীস্বব। আমার এ  
আশি সহস্র অনুচব নিয়ে যদি নিত্য বাবাণসীবামে আহাৰ্হ সংগ্রহে যেতাম, তাহলে উপক্রম  
হত সেই শাস্ত জনপদ। তাই নির্জনে এদের ক্ষুন্নিবৃত্তব আয়োজন কবেছিলাম আমি।  
আমাব সে উপকাবের প্রতিদানে মহাধার্মিক স্বয়ং কাশীবাজ কি আমাকে বধ করতে উত্ত  
হন ন? দেবদত্ত তো সামাগ্র বানব।

লজ্জায় অধোবদন হলেন কাশীবাজ জোডহস্তে বলেন—আপনি আমাকে ক্ষমা  
করুন—আপনাকে সমস্মানে আমাব বাজসভায় গর্ধিষ্ঠিত কবতে চাই।

বানববাজ বলেন—তা যে হবাব নয় কাশীবাজ। আমাব ভবলীলা শেষ হযেছে  
লগ্ন মেকদণ্ড নিয়ে আমি জীবিত থাকতে চাই না। বিদায় দিন আমাকে।

মাশ্ৰলোচনে কাশীবাজ বললেন—আমি ঞ্ববতে পেবেছি, আপনি শাপব্রষ্ট কোন  
দেবতা আপনি নিশ্চয়ই কোন সন্ধম প্রচাবেব উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এ ধবাধামে।  
অনুগ্রহ কবে আমাকে সেই সন্ধমব মমকথা বলে যান, যাতে আপনাব আবরু কাজ আমি  
কিছুটা অগ্রসব কবে দিতে পারি।

বোধিসত্ত্ব বলেন—এ অতি শুভ প্রস্তাব। আপনি অবধান করুন ধমেব মূলকথা  
আপনাকে জ্ঞাপন কবে আমি দেহত্যাগ কবব।

অতঃপব অহিংসা-ধমেব মূলকথা বর্ণনাছে বানববাজ বোধিসত্ত্ব তাঁব মর্ত্যলীলা  
সংববণ কবেন।

জাতকের এই কাহিনীটিকে অজন্তাব শিল্পী রূপায়িত কবেছেন এই প্রাচীবে  
( ১৭১০ )। দেখছি, কাশীবাজ সসৈন্তে আশ্রবৃক্ষেব সন্ধানে নিগত হযেছেন গঙ্গাতীবে,  
সেত্য়দলেব হাতে তীব, বনুক, তববারি, ভন্ন প্রভৃতি আযুধ একেবাবে উপবে দেখছি,  
গঙ্গাব ছুই তীব ছুটি বৃক্ষ যথাক্রমে হাত ও পা দিয়ে ঙ্গাকড়ে ধবে বানবরাজ দেহ-সেতু  
বচনা কবেছেন— ভীতব্রস্ত বানবকুল অতিক্রম কবে যাচ্ছে সেই সেতু। দেখছি, পরেব  
প্যানেনলে আহত বানববাজেব দেহ চাবজন বাহক নিয়ে অসেছে বাজসকাশে। শেষ  
প্যানেনলে দেখা যাচ্ছে, বানবরাজ ধমচক্রমুদ্রায় কাশীরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, সাঁচিব পশ্চিম তোবণের দক্ষিণ-স্তম্ভেব নীৰ্বপীঠ বা আবাকসেব ঠিক  
নীচেই এই জাতক-কাহিনী অবলম্বনে একটি ভাস্কৰ্য আছে। অজন্তার চিত্রেব সঙ্গে সেই  
ভাস্কৰ্য-নিদর্শনেব পবিকল্পনাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সাঁচিব ভাস্কৰ্যই বয়সে প্রাচীনতর। মনে  
হয়, অজন্তাব শিল্পী সাঁচি দর্শন কবে এসে এই প্যানেলটি রূপায়িত কবেন।

এই প্রাচীবেব অপব অংশে ষড়ম্ভ-জাতকের একটি কাহিনী-চিত্র আছে। চিত্রেব

নীচের অংশ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, উর্ধ্বাংশের খানিকটা আজও দেখতে পাওয়া যায় ( ১৬।১১ )। ষড়দন্ত-জাতক কাহিনীটি দশম গুহার অবলুপ্ত চিত্রাবলী বর্ণন করার সময়েই বলেছি ( পৃষ্ঠা ১০০ )। এখানে চিত্রে দেখছি নীচে একটি পদ্মবনের আভাস। এ অংশটি

প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত—হু'একটি পদ্মফুল ও পদ্মপাতা দেখতে পাওয়া  
ষড়দন্ত-জাতক  
যাচ্ছে। গজরাজের উৎক্লিপ্ত শুণ্ডের প্রাস্তভাগও দেখা যাচ্ছে।

উপরে দক্ষিণাংশে দেখছি, কাশীরাজের মৃগয়াধিপতি শরসঙ্কান করছে...দেখছি, বিশালকায় ঋতবর্নের গজরাজ নিজ শুণ্ডে আলিঙ্গন করে গজদন্ত বিচূর্ণ করছেন। মৃগয়াধিপতিকে পর পর চারবার ঝাঁকা হয়েছে। প্রথমবার সে শরসঙ্কানরত, দ্বিতীয়বার সে গজদন্ত-কাঁধে ফিরে যাচ্ছে—কিন্তু তার দৃষ্টি গমনপথের বিপরীত দিকে, সে যেন ফিরে ফিরে দেখছে। তৃতীয়বার দেখছি, মৃগয়াধিপতি ফিরে এসে গজরাজের চরণপ্রান্তে প্রণাম করছে; চতুর্থ চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, সে এসে উপস্থিত হয়েছে স্তম্ভশোভিত এক মণ্ডপের সম্মুখে। অর্থাৎ এই চতুর্থ আলোখো আমরা দৃশ্যান্তরে এসে পড়ছি। হুই দৃশ্যের মাঝখানে রয়েছে মণ্ডপের একটি শোভাস্তম্ভের যতি-চিহ্ন। মণ্ডপের ভিতরে দৃশ্যান্তরে দেখছি, অনুচর একটি স্বর্ণ-খালিকায় গজদন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজা-রানীর সম্মুখে।

কাশীবাজ ও রানী বসে আছেন একটি অনুচর পালকে। রাজার পিছনে নকশা-কাটা উপাধান। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, গজদন্ত দেখে রানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে—তিনি মূর্ছাহত। কাশীরাজ পতনোন্মুখ রানীর দেহবল্লরীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছেন। মণ্ডপে আরও আটজন নরনাবীর আলোখা—সকলেই ভীত চকিত সন্ত্রস্ত।

এই খণ্ডদৃশ্যটির সঙ্গে দশম গুহার অঙ্কিত অধুনা অবলুপ্ত চিত্রটির ( চিত্র—৪০ ) বিষয়-বস্তু অভিন্ন—কিন্তু ছুটি চিত্রের পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সেখানে রানী উপবিষ্টা—তিনি মর্মান্বিতা মাত্র, তখনও তিনি মূর্ছাহত হন নি। এখানে দেখছি, তাঁর দেহভার রক্ষা করছেন কাশীরাজ—বানী পতনোন্মুখ। বনং এই চিত্রটির সঙ্গে পরিকল্পনার দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ষোড়শ বিহারে অঙ্কিত জনপদ-কলাগীর মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে ( চিত্র—৫৯ )। এছাড়া, এই বিহারেরই অলিন্দে বিখ্যাত্তর ও মাদ্রীর যে মৃগলচিত্রটি আছে ( ১৭।৩ ), তাব সঙ্গে রাজা-রানীর বসবার ভঙ্গি, পরিষদদের ভীতচকিত দৃষ্টি এবং মণ্ডপের বহিরঙ্গের পরিকল্পনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রস্থিত দ্বারের অপর পার্শ্বে ছিল মৃগ-জাতকের একটি কাহিনী ( ১৭।১১ )। এটিও প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে—আভাসমাত্র দেখা যায়। একটি মৃগয়ার দৃশ্য—রাজা বোধিসত্ত্ব মৃগকে বন্দী করেছেন। পূর্বিদকের প্রাচীর-গাত্রে একটি অধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টারে ( ১৭।১৩ ) দেখছি প্রসাধনরতা রাজকন্য়ার আলোখা ( চিত্র—৬৩ )। এক পার্শ্বে চামরবাদিনী অপর পার্শ্বে একজন কিঙ্করী প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। 'প্রসাধনরতা রাজকন্য়া' নামে এ চিত্রটি বিখ্যাত এবং ইতিপূর্বে 'সাদৃশ্য' প্রসঙ্গে এই রাজকন্য়ার দক্ষিণচরণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

রাজকন্যার বামহস্তে দর্পণ এবং দক্ষিণকবে কোন প্রসাধন সামগ্রী। গাইডকে বলবেন, বাতি চিত্রের নীচে ধবে দেখিয়ে দেবে রাজকন্যার শতনরীর মুক্তাদান। কেমন অদ্ভুতভাবে চিত্রের সমতল থেকে উঁচু হয়ে আছে। অনাদৃত এ পর্বতগুহায় ঐ ছোট্ট বড়ের বিন্দুগুণী কেমন করে যে আজও টিকে আছে, ঝবে পড়ে নি, ভাবলে অবাক হতে হয়।



চিত্র- ৬৩

প্রসাধনবতা বাজকন্যা

অবস্থান- ১৭।১৩

এর পবেব প্যানেলটি বৃহদায়তন—সি.হল-অবদান জাতক (১৭।১৩)। কাহিনীও দীর্ঘ তাব রূপায়ণও বিস্তৃত অংশ জুড়ে। কেন্দ্রস্থ মণ্ডপেব সম্পূর্ণ পূর্বপ্রাচীর জুড়ে ছবিব পরে ছবি। এই চিত্র-নাটকের বস আহবণেও সেই ছুটি বাধা, প্রথমতঃ, জাতক-বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে দর্শকের অগণবিচয়, আব দ্বিতীয়তঃ, চিত্র-কাহিনীব বিশ্বাস কোন সুসংবদ্ধ



আইন মেনে চলে নি। অথবা মেনে চললেও আমরা সে-বিষয়ে অবহিত নই। তাই 'কয়েকশ' চরিত্রের ভীড়ে আমরা বারে বারে চিত্র-কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলি। সর্ব-প্রথমেই তাই কাহিনীটি জেনে নেবার চেষ্টা করা যাক :

জম্বুদ্বীপে সিংহকল্প মহাজনপদে মহারাজ সিংহকেশরীর রাজত্বে রাস করতেন একজন ধনী বণিক সিংহক। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হল ; সিংহক নবজাতকের নাম রাখলেন সিংহল। শিশু সিংহল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, নানা বিদ্যায় সে অচিরে পারদর্শী হয়ে উঠল। পুত্রের বিবাহ দিতে চাইলেন পিতা—কিন্তু সিংহলের ইচ্ছা, সে প্রথমে বাণিজ্য-

যাত্রায় যাবে। বণিকপুত্র অস্তুতঃ একবার সমুদ্রযাত্রা না করে সিংহল-অবদান জাতক কি ঘর-সংসারে মন দিতে পারে ? অনিচ্ছাসম্বেও সিংহককে অনুমতি দিতে হল। নানা পণ্যে বাণিজ্যভাবী সাজিয়ে সিংহল মধুকব ডিঙায় রওনা হয়ে পড়ল—দূর দেশের সন্ধানে, সমুদ্রপথে।

নানা দেশে বাণিজ্যেব লেন-দেন কবে লাভবান হল বণিক। দেশ-বিদেশের বাণিজ্যসম্পদে পূর্ণ হল পণ্যপোত। স্বদেশে পত্ন্যাবর্তনের পথে একটি অ-পূর্বজ্ঞাত দ্বীপে অবতরণ কবল বণিক সম্প্রদায়। দ্বীপটির নাম তাম্রদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের বণিক কখনও আসে নি এ দ্বীপে। নারিকেল-ছাওয়া সমুদ্রমেখলা এই দ্বীপে কোন পুরুষ-মানুষ নেই। বণিকদল সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবে দেখে—এ এক প্রমীলারাজ্য ! অপূর্ব-সুন্দর নারীর দল স্বাগত সম্ভাষণ জানাল ওদের স্তম্ভিত বিস্মিত বণিকের দল সে নারী-রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করল। এক-একজন গৃহস্থামিনীর ভবনে স্থান লাভ করল এক-একজন বণিক। শুধু স্তম্ভিত ও স্তূপেয়ই নয়, দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত এই নাবিকদের শয্যা-সজ্জিনী হতেও বাধা নেই তাদের—এ-ও যে আতিথা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায় জম্বুদ্বীপের বণিকদল।

শুধু কি জানি, কোন অতীন্দ্রিয় অল্পভূতিতে সচেতন হয়ে ওঠে সিংহল। কিসের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে যেন অস্থিত অনুভব করতে থাকে ক্রমাগত। দলপতি সিংহলকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এসেছিল তাম্রদ্বীপের অনিন্দ্যকান্তি রাজকুমারী স্বয়ং। মণি-দীপিত প্রমোদ-কক্ষে আহার-পানীয়-বাসনে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই ; লাস্তময়ী নর্তকীর দল, বাণ্যস্ত্রীর দল বণিক-পুত্রের আনন্দদানে কার্পণ্য করে না—স্বয়ং রাজকুমারী তার যৌবনোদ্ধত রূপের পসরা সাজিয়ে ইঙ্গিত করে বারে বারে ; কিন্তু বণিক-পুত্রের হৃদয়ে কেমন যেন সাড়া জাগে না। তার কেবলই মনে হয়—এ কেমন রাজ্য ? পুরুষমানুষ এখানে একেবারেই নেই কেন ? কেমন করে তাহলে এরা প্রজন্মের পৃথক জনসংখ্যা বজায় রাখে ? রাজ্যে একটিও অনুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল না কেন ? সমস্ত আয়োজন এত কৃত্রিম মনে হচ্ছে কেন ? জম্বুদ্বীপের এতাবৎ কালের বণিককুল এই লোভনীয় দ্বীপটিকে সম্বন্ধে এড়িয়ে গেছেন কেন ? কেন-কেন-কেন ? রাজকুমারীর মদন-

মন্দিরে পূজারত্ন সমস্ত আয়োজনের উপরে ক্রমাগত প্রাণবোধক চিহ্নের বৃষ্টিতে বণিক-পুত্র মুগ্ধ হল যতটা, সতর্ক হল তার চতুর্ভুজ।

আর এই সর্কর্কতাই রক্ষা করল তাকে—একমাত্র তাকেই। পাঁচশ, অনুচরকে হারিয়ে রিক্ত বণিক একেবারে একাই ফিরে আসতে পেরেছিল সেই তাম্রদ্বীপ থেকে।

তাম্রদ্বীপের অধিবাসিনীরা বস্তুতঃ রাক্ষসী—মোহময়ী নারীর রূপ ধরে তারা বণিকদের নিয়ে যেত স্বগৃহে। রাত্রে তাদের হত্যা কবে নরমাংসে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করত। তাম্রদ্বীপ-বাসিনী রাজকুমারীকে ত্যাগ করে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল সিংহল নিজদেশে। কুহকময়ী রাজকুমারী কিন্তু তবু তাব আশা ছাড়ে না। সত্তোষবিবাহিতা এক নারীর রূপ ধরে পথে-পাওয়া একটি শিশুপুত্র-ক্রোড়ে সে এসে উপনীত হল সিংহকল্প মহাজনপদে। সিংহলের পিতার কাছে সে আবেদন জানায় যে, সিংহল তাকে বিবাহ করেছে, তার পুত্রসন্তানও হয়েছে; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে বড় হওয়ায়, অমঙ্গলময়ী-জ্ঞানে তাকে ত্যাগ করে এসেছে। এই অসহায়া নারীর করুণ আবেদনে সিংহক পুত্রকে ডেকে আদেশ করলেন তাকে গ্রহণ করতে; কিন্তু সিংহল যখন সমস্ত গোপন কথা বাক্ত কবে দিল, তখন ঐ ছদ্মবেশী রাক্ষসীকে তিনি গৃহ থেকে দূর কবে দিলেন। সর্বোদনে বাক্ষসী এসে আবেদন করল রাজদরবারে। এখানেও মহাবাজ সিংহকেশবী মুগ্ধ হলেন তার করুণ কাহিনী শুনে; ডেকে পাঠালেন বণিক-তনয়কে। এবাবও সিংহল বাক্ত কবল তাব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু মহাবাজ সিংহকেশবী বিশ্বাস কবলেন না তাব কথা। প্রত্যাখ্যাতা ছদ্মবেশিনী স্কন্দরীকে স্থান দিলেন নিজ রাজ-অস্ত্রপুবে।

সেই রাত্রে রাক্ষসী হত্যা করল রাজাকে। আব সেই বাত্রেই আকাশপথে তাম্রদ্বীপ থেকে উড়ে এসেছিল রাক্ষসী রাজকুমারী'ব শত সহচরী। দুর্গদ্বার খুলে দিল দুর্গাস্তর-বাসিনী রাজকন্যা; সমস্ত রাত্রিব্যাপী হত্যার উৎসব চলল রাজ-অস্ত্রপুবে।

পরদিন সকালে সংবাদ পেয়ে সিংহল আক্রমণ করল সে দুর্গ। যুদ্ধ হল সিংহলেব অনুচরদলের সঙ্গে বাক্ষসীদের। শেষ পর্যন্ত পরাজিত বাক্ষসীদের আকাশপথে পলায়ন করল তাম্রদ্বীপে।

শোকসমুগ্ধ সিংহকল্প অধিবাসীরা তখন সিংহলকেই তাদের অধিপতি কবতে চাইল। বণিক-পুত্র সিংহল বললে—সে শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে অসম্মত নয়, কিন্তু একটি শর্ত আছে। সিংহকল্প অধিবাসীরা সানন্দে জানায় তাবা সিংহলের আরোপিত সকল শর্তই মেনে নিতে রাজী। তখন সিংহল বলে—তাম্রদ্বীপবাসিনী রাক্ষসীদের উপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে সিংহাসনে বসতে রাজী নয়। যদি সিংহকল্প অধিবাসীরা তার সঙ্গে তাম্রদ্বীপে যুদ্ধযাত্রা করতে সম্মত হয়, তবেই সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত।

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল ওরা। বিরাটাকার অর্ধবপোতে সৈন্যদলকে সাজানো হল। সিংহল স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে অভিযানে। সদলবলে সিংহল এল তাম্রদ্বীপে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দুই পক্ষে; কিন্তু অমিতবিক্রম সিংহলের শৌর্ধবীর্যের কাছে নিঃশেষে

পরাদৃত হল রাক্ষসীকুল। সিংহল হলেন 'বিজয়-সিংহল'। রাক্ষসীদের বিতাড়িত করে তাত্রদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করল আর্থ জম্বুদ্বীপবাসীরা। দ্বীপের নূতন নামকরণ করা হল 'সিংহল'। মহা আড়ম্বরে অভিব্যেক-উৎসব উৎসাহিত হল বিজয়-সিংহলের।

বিস্তৃত পূর্বপ্রাচীর জুড়ে এই কাহিনীটিকে রূপায়িত করেছেন শিল্পী। প্রথমেই দেখাছি সিংহলের প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বাণিজ্যতরী জলমগ্ন হচ্ছে (১৭।১৪-ক)। বিষয়-বস্তু ও কম্পোজিশনের দিক থেকে এই খণ্ডচিত্রটি পূর্ণ-অবদান জাতকেব নৌকাডুবি দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমার তো মনে হল, পূর্ণ-অবদান দৃশ্যটিতেই উন্নততর শিল্পশৈলী বিद्यমান। সেই শ্রেণীগত ছান্দ্যাসিক কম্পোজিশনে চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম—এখানে নৌকাডুবির চিত্রটি আবও বাস্তব, কিন্তু এতে যেন বীভৎসবসেব বাছল্য। বোধ করি সম্পূর্ণ কাহিনীটির বীভৎস ও রুদ্র রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই শিল্পী এভাবে রূপায়িত করেছেন এই দৃশ্যটি। দেখছি, অনেক নাবিক জলে পড়ে গেছে, অনেক মৃত্যু-ভয়াতুর। এখানে ৯৬ খুব ফিকে হয়ে গেছে। পরের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, তাত্রদ্বীপের শ্রমীলারাজে নাবিকবা আতিথ্য গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি তিনটি অলিন্দে মিথুন-স্রুতি। একটি নাবিককে চষকপূর্ণ সুরা এগিয়ে দিচ্ছে একটি আল্লেশয়না নারী, আর একটিতে একটি যুবতী সঙ্গীত পবিবেশন কবছে। একটি তাবু-জাতীয় কক্ষে পুনরায় ছুটি মিথুন-চিত্র। প্রত্যেকটি দৃশ্যই বাক্ষসীদের ঠাকা হয়েছে লাশ্ময়ী স্তম্ভবী নারীর বেশে। পিছনে কিন্তু এই মিলনমধুর দৃশ্যগুলিব সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। সেখানে দেখছি, বাক্ষসীরা নাবিকদের হত্যা করে নরমাংস ভক্ষণ করছে, রক্ত পান করছে। সেখানে শিল্পী তাদের ঐক্যেছন ভয়ঙ্করী বাক্ষসীর বেশে (১৭।১৪-খ)।

এখানে একটি ঋতবর্ণের অঙ্কে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ, জাতকমতে, সিংহলেব উদ্ধারের মূলে ছিলেন একজন ঋতবর্ণের পাক্ষরাজ অঙ্ক—তিনি বোধিসত্ত্ব। চিত্র দেখছি, অঙ্করাজের পিঠে সিংহল ফিরে এসেছে সিংহকল্প জনপদে। অঙ্ক থেকে অবতরণ করে সে উপকারী অঙ্করাজকে নতজানু হয়ে শ্রণাম করছে (১৭।১৪-গ)।

এই দৃশ্যের দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে, রাজা সিংহকেশবীর দরবার-দৃশ্য (১৭।১৪-ঘ)। এই অবলুপ্তপ্রায় চিত্রটির একটি প্রতিলিপি ডাঃ ইয়াজদানীর গ্রন্থেব তৃতীয় খণ্ডে আছে।

চিত্রকর সেখানে অবলুপ্তপ্রায় চিত্রটির সত্ত্বসমাপ্ত অবস্থায় কী রূপ ছিল, তাই কল্পনায় অল্পমান করে ঐক্যেছন। সেটি একটি অপূর্ব চিত্র। রাজাব সম্মুখে বদ্ধ মন্ত্রী যষ্টিতে ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি চিন্তামগ্ন। রাজার বামে একটি অলিন্দ, তারপব সোপান-শ্রেণীর নীচে দাঁড়িয়ে আছে সিংহল। তাব দৃষ্টি জরুটুকুটিল। সে বলছে এই রমণী তাব স্ত্রী নয়—এ বাক্ষসী। সিংহলের বামে রাজকণ্ঠা একটি শিশুকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। রাজকণ্ঠার চিত্রটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ঐক্যেছন শিল্পী—যেন কিসাদের লক্ষ্মীপ্রতিমা। অলিন্দে পাঁচটি পুরকামিনী—রাজাদেশে তারা নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্যে নবাগত অস্তঃপুর-চারিণীকে বরণ করতে এগিয়ে আসছে। দেখছি, একটি বামন শ্রমাধন দ্রব্য মাথায় কবে

চলেছে। রাজার পশ্চাতে বাতায়নবর্তিনী দুটি নারী-চিত্র। দুটিই অপূর্ব সুন্দরী—কিন্তু তারা যেন এই নবাগতাকে খুশিমনে বরণ করতে ইচ্ছুক নয়। বোধ করি, ওরা সিংহ কেশরীর অপরা মহিষী। বাস্তবে এ চিত্রটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

এই রাজসভার দৃশ্যের ঠিক বামে, অর্থাৎ ১৪-গ ও ১৪-ঘ'র অন্তর্বর্তী স্থানে দেখছি নবাগতা রাজকন্যাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে অভিষেক-স্নান করানো হচ্ছে। রাজকন্যা একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপর দণ্ডায়মানা, একজন কিশকবী তার মাথায় গন্ধবারি ঢালাচ্ছে। আরও কয়েকজন নানান গন্ধ ও প্রসাধন দ্রব্য নিয়ে এসেছে। এখানে একটি শিল্প-চাতুর্ঘ লক্ষণীয়। বাজবুমারীর এই বমণী-রূপটি ছন্দবেশ, এ তার বাস্তব আকৃতি নয়—তাই শিল্পী যেন এই নারীমূর্তিটিকে ভাবহীন করে এঁকেছেন—যেন সে বক্ত-মাংসের গুজন-সম্পন্ন নারী নয়—অপাখিব এক মোহময়ী সত্তা। তাই অনায়াসে সে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর—পদ্ম পদদলিত হচ্ছে না তার দেহভারে। ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী বন্ডিচেল্লি যদি আরও হাজারখানেক বছর আগে জন্মাতেন, তাহলে মনে করা যেত যে, অজস্রশিল্পী বন্ডিচেল্লি-অনুকরণে এ চিত্রটি এঁকেছেন!

কাহিনীর পাবস্পর্ষ অনুসাবে এব পববর্তী দৃশ্যটি অনেকটা দূবে ঝাঁকা ( ১৭।১৪-৬ )। এ ঘটনা সেইদিন রাত্রের। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দুটি নগর-তোরণের মাঝখানে দুর্গের প্রবেশ-পথ। বামদিকে ত্রিতলে মহাবাজ সিংহকেশবীকে হত্যা করেছে তান্ত্রদ্বীপবাসিনী রাক্ষসী। এখানকাব চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতলে যে ধ্বংসলীলা চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। পাশাপাশি তিনটি গবাক্ষ। প্রত্যেকটিতেই একটি করে রাক্ষসী ও তিন-চাবটি জম্বুদ্বীপবাসী। মহানন্দে রাজাস্তঃপুরবাসী নরনারীকে হত্যা করে বাক্ষসীবা আহাব কবছে। শিল্পী এই বক্তক্ষয়ী দৃশ্যে পশ্চাৎপাটেব আকাশকে এঁকেছেন গাঢ় লাল বঙে। অজস্রার অস্থ কোথাও এত গাঢ় লাল বঙেব পশ্চাৎপট দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

...নীচে দেখা যাচ্ছে রাত্রি প্রভাতেব দৃশ্য। কন্দকার দুর্গের তোরণে মই লাগিয়ে উঠে আসছে সিংহল...দেখছি, একতলাব ছাদে মুক্ত কুপাণহাতে সে আক্রমণ করেছে রাক্ষসীদের .. রাক্ষসীরা শূন্যে ঠাঠে গেছে, তাদের হাতে নরমাংসের টুকরো।...তোরণের উপরে একটি শকুন... দুর্গ-চত্বরের মাঝখানেও একটি মাংসভুক পাখী মহানন্দে আহাব করছে।... অল্প কয়েকটি কালো রঙের বেখার টানে শিল্পী যেভাবে কয়েকটি উড়ন্ত কাকের চিত্র এঁকেছেন, তা দেখে মনে পড়ে জয়মূল আবেদীন অথবা গোপাল ঘোষেব ঝাঁকা ছবি।

...নীচে দেখা যাচ্ছে শূন্য সিংহাসন।

পরবর্তী ঘটনার জন্ম আবার চলে যেতে হবে ও-প্রাস্তে; চিত্র গ-ঘ-এর নিম্নাংশে। দুটি গর্ভগুহার অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ প্যানেলে সিংহলের দ্বিতীয়বারের সমুদ্রযাত্রা ও সিংহল-বিজয়-কাহিনী ( ১৭।১৪-৮ )।

চিত্রটির পাঁচটি অংশ। প্রথম, সিংহকল্প রাজপ্রাসাদ থেকে বিজয়সিংহলের সদলবলে স্থলপথে যাত্রা। দ্বিতীয়, সিংহলদ্বীপে নৌকাযোগে অবতরণ। তৃতীয়, যুদ্ধদৃশ্য। চতুর্থ,

রাক্ষসীদের পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণ, এবং পঞ্চম বিজয়ী বিজয়সিংহলের অভিষেক। এই পাঁচটি দৃশ্যের স্থান-কাল বিভিন্ন—কিন্তু শিল্পী কোন যতি-চিহ্নের ব্যবহারে দৃশ্যগুলি বিচ্ছিন্ন করেন নি। এই পঞ্চ দৃশ্যের শেষ অঙ্কটির কম্পোজিসন একটি মালার আকারে গড়েছেন তিনি। যেন শেষ অঙ্কের একটি মালা তিনি পরিয়ে দিতে চান বিজয়ী সিংহলের কণ্ঠে। মেঘে মেঘে যেমন মিলে যায়, স্বপ্নে স্বপ্নে যেমন মিলে যায়, অথবা আধুনিক চলচ্চিত্রে ডিজল্ড-প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যেমন এক দৃশ্য অপব দৃশ্যে নিঃশেষে মিশে যায়, এখানেও শিল্পী সেইভাবে এই পাঁচটি দৃশ্যকে মিশিয়ে দিয়েছেন মালার আকারে।

প্রথমে উপরে দেখছি (চিত্র—৬৫) একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করে হস্তিপৃষ্ঠে বিজয়-অভিযানে যাত্রা করছে সিংহল। লক্ষ্মণীয়, এবার প্রথম তার মাথায় মুকুট দেখছি। ছপাশে ছুজন সমর-সচিব, কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে চামর অর্থাৎ সিংহলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে তারা। সিংহলের মাথার উপর রাজছত্র—তার দৃষ্টি কিন্তু ত্রিধ্বকভঙ্গি—পূর্ববর্তী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-দৃশ্যের কথা যেন সে ভুলতে পারছে না। সিংহলের শ্বেতহস্তী পার্শ্ববর্তী ধূসর বর্ণের হস্তীর গুঁড় নিজ গুণ্ডে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছে—যেন তারাও আসন্ন সংগ্রামের পূর্বে শ্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করছে...সঙ্গে চলেছে একদল পদাতিক সৈন্য, তাদের হাতে মুক্ত কুপাণ, ভল্ল ও দীর্ঘাকার ঢালিকা। পূর্বদৃশ্যের সঙ্গে এ দৃশ্যের বিভিন্নতা বোঝাতে প্রথমই ঝাঁক হয়েছে নগর-তোরণদ্বার। এই সমরাভিযান দৃশ্যের সঙ্গে বিধুরপণ্ডিত-জাতকের একটি দৃশ্যের (বিধুর ও পুণ্যকের ইন্দ্রপ্রস্থ ভাগ) সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য ওর নীচে—সৈন্যদল তাত্রদীপে অবতরণ করছে। যদিও প্রচ্ছন্ন কোন যতি-চিহ্ন নেই, তবু পূর্বদৃশ্যের ফিগরগুলি থেকে একটু ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্যের বিষয়-বস্তু ঝাঁক হয়েছে, যেন শূন্য স্থানটুকুই সেই যতি-চিহ্ন। দেখছি, তিনটি নৌকা। সম্মুখভাগে সেই তিনটি রণহস্তী, পিছনে অশ্বাবোহী ও পদাতিক বাহিনী। হস্তীর তুলনায় নৌকাগুলি ছোট সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখছি, ছপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে। এ ঘটনা অবতরণের পব; কারণ, বান্ধসীরা ও জম্বুদ্বীপবাসীরা তখন হাতাহাতি যুদ্ধ কবছে।

কালানুক্রমিকভাবে চতুর্থ দৃশ্য একেবারে নীচে। সেখানে দেখছি বান্ধসীরা যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে অথবা অন্ত্রত্যাগ করে ছই হাত ভূমিতে রেখেছে।

পঞ্চম ও শেষ দৃশ্য মালার আকারে সাজানো কম্পোজিসনটির একেবারে অপব পারে। এ দৃশ্যটির পরিকল্পনার সময় শিল্পী একটি যতি-চিহ্নের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করেছেন। কারণ, শুধু স্থান-কাল নয়, রক্ত ও বীভৎস রস থেকে এবার অগ্ন রসের পরিবেশন করতে হবে তাঁকে। তাই রাক্ষসীপুরীর একসার তাঁবুর (অভিযানকারী সৈন্যদলের আগমন-সংবাদে যা সমুদ্রতীরে নির্মাণ করিয়েছিল রাক্ষসীরা) যতি-চিহ্ন একে তার ওপারে চিত্রিত কবেছেন বিজয়সিংহলের অভিষেক দৃশ্যটি। সিংহল সিংহাসনে উপবিষ্ট!

পূববাসীরা গান গাইছে, বাজাচ্ছ, পুনকামিনীরা অভিষেক-বাবিতে স্নান কবাচ্ছে বিজয়সিংহলকে (১৭১৪-ছ)।

এব পব কষেকটি বুদ্ধমর্তির আলোখ্য (১৭১৫) এব, তাবপব মহিষ-জাতকেব একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (১৭১৬)। বোধিসত্ত্ব সেবার এক ভীমকান্তি মহিষেব কপে অবতীর্ণ। কিন্তু ককণার অবতার তিনি। যে অবণো তিনি বাস কবতেন, সেখানেই থাকত একটি অর্বাচীন বানব। সময়ে-অসময়ে সে বোধিসত্ত্ব-মহিষেব পিঠে চড়ে বসত—নানাভাবে উতাক্ত কবত তাঁকে। দযাব অবতার মহিষ কোন প্রতিবাদ কবতেন না। এইভাবে অত্যাচাবে বানবটি এতই অভাস্ত হয়েছিল যে তাকেই দেখলে সে ছুটে আসত। একদিন বোধিসত্ত্বেব বদলে অত্র একটি আবণাক ম'শ্ব সেই অবণো বিচরণ কবছিল। অর্বাচীন বানবটি লক্ষ্য কবে নি পরিবর্তনটুকু—সে যথাবীতি মহিষেব পিঠেব উপব চড়ে বসে আঁচড়াতে থাকে।

বন্য মহিষ তৎক্ষণাৎ তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয এব শিঙ দিযে তাব উদব ভেদ কবো হতা। কবে বানবটিকে। ছুটি চিত্রে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি একঁছেন অজ্ঞান্তাব শিল্পী। নীচে দেখছি, দযাব অবতাব বোধিসত্ত্ব-মহিষেব পিঠেব উপব উঠে বসেছে বানব, হুহাতে মহিষেব ছুই চোখ টিপে ধবেছে। আব তাব উপবেব দৃশ্বে দেখছি, বন্য মহিষ পদদলিত কবতে যাচ্ছে বানবটিকে। জাতককাব তথা শিল্পীব বক্তব্য এই ছুই দৃশ্বেব নাটকে সোচ্চাব। আহ সাব মন্ত্বে দীক্ষিও এই নিজন গুহাবাসী বৌদ্ধ শ্রমণদেব উপব কোনভাবে অত্যাচাব কবলে তাবা হয়তো প্রতিশোধ নেবেন না—কিন্তু যাব বিধানে চন্দ্র-স্বয় উঠছে, যাব অঙ্গুলিহেলনে এ গুহা-বিহাবেব সম্মুখস্থ স সাব-চক্র ঘূব চলে অবাবিত গতিতে—তাব বিচাবেব হাত থেকে উদ্ধাব পাবাব উপায় নেই।

একটা কথা ভেবে দেখাত হবে—এই মহিষ-জাতক কাহিনীব স্থান-নিবান। এটি সিংহল-অবদান জাতকেব ঠিক পবেই আঁকা। সিংহল-অবদানেব বিশালাযতন প্যানেলটি শেষ কবে কি বৌদ্ধ শিল্পীব মনে হয়েছিল, বেবী নিৰ্ধাতনেব এ কাহিনীটি বৌদ্ধ ধমেব মূলকথা তো কই ব্যক্ত কবেছে না? মৃত্যুব বদলে মৃত্যু, হত্যাব বদলে হত্যা—এই কি বুদ্ধদেবেব বাণী? বুদ্ধদেব তো তা বলেন নি, বলেছেন—যে তোমাকে ভালবাসবে তাকে ভালবেস—যে তোমাব প্রতি শক্রতা সাধন কববে তাকেও ভালবেস। তাই কি শিল্পী ঐ সিংহল-অবদান জাতকেব পবে এই ক্ষুদ্র চিত্রটি একঁ মনেব ভাব লাঘব কবতে চান?

উত্তব প্রাচীরেব পূবপ্রান্তেও ছুটি জাতক-কাহিনী। উপবে শবভ-জাতক (১৭১৭) এবং নীচে শ্যাম-জাতক (১৭১৮)। শবভ জাতকেব চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে—সে কাহিনী ফলে অবাস্তব। শ্যাম-জাতকেব কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: কিশোব শ্যামেব পিতা ও মাতা দুজনেই অন্ধ। বনচাবী এই সংসাবটিব সমস্ত দায়িত্ব ছিল কিশোব শ্যামেব

উপর। বনাস্তুর থেকে ফল সংগ্রহ করে আনা, পানীয় সংগ্রহ করে আনা—সব কাজই করতে হত শ্রামকে। একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত শিকার করতে এসে তাকে শরাহত কবেন। রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মদত্তের অপরাধ ততোধিক। রাজা দেখতে পেয়েছিলেন শ্রামকে—ভেবেছিলেন, এ নিশ্চয়ই দেবশিশু, এ অমর। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করতেই শরনিক্ষেপ করেছিলেন তিনি। যাই হোক, ফল সেই একই। শ্রাম মারা গেল। রাজা শ্রামকে নিয়ে এলেন অন্ধমুনির কাছে। এব পরের অংশটিতেও পার্থক্য আছে রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে। অযোধ্যা-বাজ দশরথকে শাপগ্রস্ত হতে হয়েছিল—কিন্তু কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কোন শাপ দেন নি জাতক-বর্ণিত অন্ধমুনি। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে বজ্রাহতের মতো স্তব্ব হয়ে গিয়েছিলেন মুনিবর। আরও একটি প্রভেদ আছে ছুটি কাহিনীতে। রামায়ণকারের কাহিনীটিতে অজ্ঞান-কৃত পাপে দশরথ শাপগ্রস্ত, মুনিপুত্রও হত। কাহিনীটি ছিল পরিপূর্ণ বিয়োগান্তক। জাতক-বর্ণিত শ্রামের কাহিনীতে দেখছি, সজ্ঞান-কৃত পাপ-সঙ্গেও ব্রহ্মদত্তকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর দেখছি, কাহিনীব শেষে বোধিসত্ত্বের কৃপায় শ্রাম পুনর্জীবিত। এই কাহিনী অবলম্বনে সাঁচির পশ্চিম তোরণের উত্তর স্তম্ভে একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে।

শ্রাম জাতকের নীচের অংশে আছে আবেকটি জাতক-কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট অবস্থায় আছে। এটির নাম মাতৃপোষক-জাতক (১৭১১)।

বোধিসত্ত্ব সেবার এক ষ্ঠেতবর্ণের মহাগজরূপে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই অন্ধ। কিশোর শ্রামের মতোই তিনি অন্ধ পিতামাতার জন্ম বন-বনাস্তুর থেকে আহাৰ্য সংগ্রহ করে আনেন। পিতামাতার আহাৰ্য্যে স্নান্বিত করেন। একদিন বোধিসত্ত্ব গজরাজ দেখতে পেলেন, একটি কাঠুরিয়া সেই গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বনে বনে ঘূবে বেড়াচ্ছে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব সেই কাঠুরিয়াকে পিঠে করে বনপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। কাঠুরিয়া বারাণসীতে

মাতৃপোষক-জা ৩ক

উপস্থিত হয়ে শুনতে পেল যে, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজহস্তীটি পূর্বরাত্রে মারা গেছে। সে বাজসকাশে উপনীত হয়ে বলল, অরণ্য

ঘভালুরের অধিবাসী এক মহাকায় গজের সন্ধান সে দিতে পাবে। বাজনির্দেশে সেই কৃতম্ব কাঠুরিয়া শিকারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই গভীর অরণ্যে। সুকৌশলে শিকারীর দল শূন্য করে ফেলে বোধিসত্ত্ব গজরাজকে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব কোন বাধা দিলেন না। গজরাজকে নিয়ে আসা হল রাজ্য হাতিশালে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই হস্তিশালার রক্ষক এসে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের কাছে নিবেদন করে, ধৃত হস্তী রাজবাটীতে আসার পর থেকে জলগ্রহণ করে নি—উপবাসে সে প্রাণ দিতে উচ্চত। কাশীরাজ কৌতূহলী হয়ে স্বয়ং এলেন হাতিশালে। সত্যই থরে থরে আহাৰ্য্য সাজানো আছে অথচ কণামাত্র গ্রহণ করছে না সেই অনিন্দ্যকাস্তি ষ্ঠেতহস্তী। মহারাজের মনে হল, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তিনি অনুচরদের আদেশ দিলেন হস্তীর শূন্য

মোচন কবে দিতে—এবং বন্ধনমুক্ত হস্তী কোথায় যায়, কি কবে তার সন্ধান বাখাব জন্ম দ্রুতগামী অশ্বাবোহীদের নিযুক্ত কবলেন। মুক্তিপ্রাপ্তিমাত্র গজবাজ কিবে গেলেন নিজেব নিভৃত অবগ্যবাসে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন তাঁব অন্ধ পিতামাতা সাতদিন উপবাসে মবণোন্মুখ। গজবাজ তৎক্ষণাৎ শুণ্ডে কবে জল নিয়ে এসে তাঁদেব গজকুস্তে সিঞ্চন করলেন— আহাৰ্হ—পানীয়ে তাঁদেব সুস্থ কবে ভোলেন।

সংবাদ পোষ কাশীবাজ স্বয়ং এলেন মাতৃভক্ত বোধিসত্ত্বেব কাছে। বোধিসত্ত্বেব সঙ্গে তাঁব বন্ধুত্ব হল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্বেব কাছে অভিধর্মেব অনেক অনুশাসন শুনালেন বাজা।

এই কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্র-কাহিনী এখানে আঁকা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে আজও। চিত্রে দেখছি, শৃঙ্খলাবদ্ধ গজবাজকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাশীবাজেব কাছে। দেখছি, বাজাব হস্তিশালাে বজ্জবদ্ধ উপবাসী গজবাজকে, তাঁব চতুর্দিকে ইক্ষুদণ্ড, বদণীবাণ্ড, চাৰা-লাগানো দ্রুপি-জাতীয় শকাট কব আনা হয়েছে নানান্ গ্রাহাৰ্হ, গথচ গজবাজ উপবাসী। সম্মুখে বিগ্ণযাৰ্হ হস্তিশালােব বক্ষক। পববর্তী প্যা.নলে দেখছি, কাশীবাজেব দববাবে হস্তিশালােব বক্ষক যুক্তকবে তাব অদ্ভুত অভিজ্ঞতােব কথা বর্ণনা কবছে। বাজা ব্রহ্মদত্ত সি হাসনে উপবিষ্ট। দেখছি, হাতীকে শৃঙ্খলমুক্ত কবে দেওয়া হয়েছে, কল্পশাস গজবাজ ছুটে চলেছেন অবগ্য-অভিমাখ গজবাজেব এই দ্রুতগতি গমনভঙ্গিটি অপূব, তাঁব পিছনেই অশ্বপৃষ্ঠে দুজন বাজামুচব, তাবা একটি নগব-তোবণ অতিক্রম কবছে। বন্ধনমুক্ত হস্তীেব সম্মুখেও দুজন বল্লমধাবী পদাতিক অনুচব। শেষ দৃশ্যে, দাৰ্হ মাতাপুত্রেব মিলন-দৃশ্য। এই খণ্ডচিত্রটিেব মাধুৰ্যবস বর্ণনা কবা অসম্ভব। মানুষ নয়, কোন জানোযাবেব চিত্র এ-জাতীয় ভাবব্যঞ্জনা অগ্র কোথাও দেখাছি বলে মনে পড়ে না। গজবাজ দাড়িয়ে আছেন, আবেশ ছুটি চক্ষু বুজে এসেছে তাঁব। শুণ্ডে কবে জল নিয়ে তিনি আবগভবে ঢালছেন অন্ধ পিতাবে গজকুস্তে। তাঁব সম্মুখে অন্ধ পিতা শুণ্ড উত্তোলিত কবে আশ্রাণ কবছেন পুত্রবে দেহ-সৌগন্ধ। মাতা তাঁব শুণ্ড বুলিয়ে দিচ্ছেন পুত্রবে অঙ্গে। শিল্পী অন্ধ পিতামাতাবে চোখ আঁকেন নি—বিস্ত অন্ধ মানুষ যেভাবে দৃষ্টিহীনতােব পবিপূবক হিসাবে প্রিয়জনেব গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহ-ভালবাসা জ্ঞাপন কবে এক্ষেত্রে শিল্পী সেই কৌশল প্রয়োগ কবে ওঁব পিতামাতাবে মনোভাবে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রাম জাতকে যে কথা বলেছি, এবাবও তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখানেও কৃত্তর কাঠবিষাকে ক্ষমা কবেছিলেন বোধিসত্ত্বে—দৈবনির্দেশে মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সিংহল-অবদান জাতকেব রক্তক্ষয়ী বৈবী নিৰ্যাতনেব চিত্রটি আঁকােব পব শিল্পী যেন মনুতপ্ত ক্লাস্ত হয়েই এই সব অহিংসা, ক্ষমা, মহানুভবতােব জাতক কাহিনীগুলি দিয়ে ভবিযে তুলেছেন এ গুহা-বিহাবেব পার্শ্ববর্তী প্যা.নেলগুলি।

অস্তুরালেব অপব পার্শ্বে স্তবসোম জাতকেব একটি দীৰ্ঘ কাহিনী। দ্বর্ভাগ্যক্রমে



এব অনেকগুলি চিত্রই ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবু কাহিনীটি জানা থাকলে এবং বিভিন্ন দৃশ্যেব অবস্থান সঙ্ক্ষে ধারণা থাকলে, ঐর্ষ্যশীল দর্শক এটির আংশিক বসাস্বাদন কবতে পারবেন মনে করে এটিকেও লিপিবদ্ধ করলুম। চিত্রের কিছুটা আছে অস্তবাল প্রাচীরের বামপার্শ্বে, কিছুটা হল-কামবাব দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ( ১৭২০ ও ১৭২১ )।

প্রথমেই দেখছি, বাবাণসীবাজ সুদাস যুগয়্যায় চলেছেন একটি ষেত অশ্বপৃষ্ঠে।  
দেখছি, অছাণ্ড সৈন্যদলকে পিছনে ফেলে বাজা একাই এগিয়ে চলেছেন—তাঁব সম্মুখে হরিণ, বহু শূকব, তাঁব পশ্চাতে শিকারী কুকব। এব উপবে দেখছি, যুগয়্যায়-ক্লাস্ত রাজা ভূমিশযায় নিদ্রিত, একটি সিংহী বাজাব পদলেহন কবছে, রাজাব  
হৃতসোম জাতক ষেত অশ্বব ভীত উৎকর্ষিত দৃষ্টি লক্ষ্য কবাব মতো তাঁব উপবেব প্যানেনে দেখছি, বাজা উঠে বসেছেন, সিংহী পিছন ফিব আছে বটে, তবে ঘাড় বাঁকিয়ে বাজাকে দেখছে। বস্তুতঃ, জাতক-কাহিনী অনুসাবে, অমিতবিক্রম কশীবাজকে দেখে সিংহীর মনে অনুবাগ সঞ্চাবিত হয়েছিল, বাজা তাকে সেই বিজন অবণো গাঙ্গবর্মতে বিবাহ করেন এবং তাঁব একটি পুত্রসন্তান হয়।

পবেব দৃশ্বে দেখা যাচ্ছে, বাজাবেব মাঝখান দিয়ে শিশুকে পিঠে তুলে নিয়ে সেই সিংহী বাজাব প্রাসাদেব দিকে চলেছে। পথেব উপব ফুল ছড়ানো, ছুধাবে নিশান— অর্থাৎ, বাজা তাঁব নববিবাহিতা সিংহী মহিবীকে সসন্মানে বাজপুবীতে আনবাঁব ব্যবস্থা কবেছেন। কিন্তু দেখছি, বাজাবেব লোকেবা ভীত, মন্ত্রস্ত শিশুক্রোড়ে জননী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট। এবা সকলে সার দিবে বসে আছে পথেব ছুধাবেব বাড়ীব ছাদে। ছ'একটি গাংহেব পাতা ইঙ্গিত কবছে মন্ত্রস্ত দর্শকবুল রাজপথেব সমতলে নেই— আছে দ্বিতলে।

এ দৃশ্বেব শেষ প্রান্তে একটি তোবণ-দ্বাব। সেই যর্গ-চিত্রেব ওপাবে বাজসভাব দৃশ্য বাজা শিশুক্রোড়ে সিংহাসনে পদতলে সিংহী পাশে মন্তা, সভাস্থ সকলেই মন্ত্রস্ত। এ চিত্রটি প্রায় অবলুপ্তই বলা চলে।

কিন্তু লক্ষ্য কবলে এব পাশেব চিত্রটি বোঝা যায়। সেটিতে বাজকুমাবে শত্রু-বিদ্রায় শিক্ষিত কবে তোলা হচ্ছে। একটি কদলীবৃক্ষে লক্ষ্য স্থিব কবে বাজপুত্র বল্লম ছুঁড়ছেন। তাঁব পবেব দৃশ্যটি বাজকুমাবেব পাঠশালাব, এই চিত্রটি নষ্ট হয়ে গেছে।

সুদাসেব পুত্র সৌদাস। যুববাজ ক্রমে ক্রমে বয় প্রাপ্ত হলেন। বাজা সুদাসেব স্বর্গাবোহণেব পব তিনিই হলেন কাশীবাজ। পববর্তী চিত্রটি তাঁব অভিষেকেব। সব অভিষেক দৃশ্বেব মতোই ( মহাজনক, সিংহল-অবদান প্রভৃতি ) সেই একই পবিকল্পনা।

কিন্তু সৌদাস হচ্ছে সিংহীব পুত্র। প্রতিদিন তাঁব মাংস চাই। একদিন পাচক দেখল, বাজাব আহাৰ্য মাংস কুকুবে খেয়ে গেছে। ভীতব্রস্ত পাচক একথা গোপন কবে একটি মৃত ব্যক্তিব জঙ্ঘা থেকে মাংস নিয়ে নবমাংস বাগ্না কবে সৌদাসকে খেতে দিল। অত্যন্ত ভূপ্তিব সঙ্গে আহাৰ কবে সৌদাস পুবস্কাব দিল পাচককে এবং জানতে চাইল

এ কিসেব মাংস। পাচক মিথ্যা কথা বলতে আব সাহস কবল না। সৌদাস পাচককে বলে, প্রত্যহ তাকে গোপনে নবমাংস বন্ধন কবে দিতে হবে।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি, নবমাংস বাগ্না হচ্ছে বাজার পাকশালে। দেখছি, একজন পথচারীকে হত্যা করা হচ্ছে।

এ সংবাদ কিন্তু গোপন বটল না। তাই পবেব দৃশ্যে দেখছি, প্রজাবন্দ প্রকাশ্য দববাবে অভিযোগ এনেছে। বাজার সম্মুখে সেনাপতি কালাহাবি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে এ অনাচার বন্ধ কবতে হবে।

ফলে, বাজায়-প্রজায় যুদ্ধ বেধে গেল—সৌদাস একটি সোপানের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত-কৃপাণে আত্মরক্ষা কবছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাকে রাজ্য ত্যাগ কবে বনে চলে যেতে হল।

এব পর সৌদাসেব জীবন শুক হল নূতনভাবে। ভয়ঙ্কর নবমাংসভুক্ত বাক্ষসেব মতো এক গভীর অবণ্যে সে বাস কবতে থাকে। পথচারীদের হত্যা কবে নির্বিচাবে। সে যেন মনুষ্য-সমাজেব বিকক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা কবছে।

ঘটনাচক্রে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা সুতসোম ঐ গভীর অবণ্যপথে চলেছিলেন সন্ন্যাসী নন্দেব আশ্রমে। রাজা সুতসোম বসন্ত-বোধিসত্ত্ব, ধার্মিক রাজসি তিনি। শিল্পী তাঁকে অমুসবণ কবছেন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে। সভাসদ্বা সকলে তাঁকে জানিয়েছিল—ঐ অবণ্যে বাস কবে একজন নরমাংসভুক্ত রাক্ষস। কিন্তু কাবও নিষেধ কানে তোলেন নি সুতসোম। তিনি বেবিষেছিলেন ভিক্ষু নন্দেব আশ্রমের উদ্দেশ্যে। ভিক্ষু নন্দেব গুরু ছিলেন মহামতি বুদ্ধ-কশ্যপ। সুতসোম জানতেন যে, মহাকশ্যপেব মুখ-নিঃসৃত চাবটি শ্লোক একমাত্র নন্দই জানতেন। সেহ মন্ত্র স্বকর্ণে শুনবাব উদ্দেশ্যে চলেছিলেন তিনি, কাবও নিষেধ শোনেন নি।

যথারীতি গভীর অবণ্যে তাব পথ বোধ কবে দাঁডায় সৌদাস। সুতসোম বৃহত্ত পাবেন, ঐই সেই রাক্ষস, বৃহত্ত পাবেন এব হাতে নিস্তাব নেই। সৌদাস বলে বদ অশুভকরণে যাত্রা শুরু কবেছিলে পথিকবব। আজ তোমার জীবনেব শেষদিন।

সুতসোমের ছু চোখ অশ্রু-আঁধ হয়ে গঠে।

নিষ্করণ সৌদাস বলে—অশ্রুপাতে কোন লাভ নেই পথিক, প্রাণভয়ে ভীত অনেক লোকেরই চোখেব জল দেখা অভ্যাস আছে আমার।

চক্ষু মার্জনা কবে সুতসোম এবাব হেসেই বলেন :

শিল্পি না নিষ্করণ ভাবে	কিবা দাবাস্ত হেতু
ধনরাক্ষা নাশ ভাঙ্গ বপি না ক্রন্দন,	
মাধুজন পদশিত	মুচলিত মার্গ অ মি
অমুক্ষণ সাবধানে কপি বাচরণ।	
আনাস্তে গিরিয়া ঘবে	জনিব কশ্যপ মন্ত্র
ব্রাহ্মণের কাছ গহ ছিল অক্ষীকার,	
ইহল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ	পড়িয়া তোমার হাতে
গই দুঃখে বর অশ্রুপার ॥ ৩০ ॥	

সৌদাস কৌতুকবোধ কবে. বলে - তাই নাকি ? মন্ত্রগুলি শুনেলে আব মৃত্যুসময়ে কাঁদবে না তুমি ?

সুতসোম বলেন—না !

বস্তুতঃ, বান্ধসেব ক্ষুন্নবৃত্তিব জন্ম আত্মদানে তাঁব আপত্তি নেই ; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ অশ্রুতপূব মন্ত্রচতুষ্টয় শুনে যেতে পারলেন না বলেই ক্ষুব্ধ। সৌদাসকে তিনি অল্পবোধ কবলেন, তাকে সাময়িক মুক্তি দেবার জন্ম। প্রতিশ্রুতি দিলেন, মন্ত্রচতুষ্টয় শ্রবণ করে তিনি আবার ফিবে আসবেন সৌদাসেব আবণ্যক আবাসে, তাব ক্ষুন্নবৃত্তিব জন্ম।

হা-হা কবে হেসে ওঠে সৌদাস। বলে, একবাব পালাবাব সুষোগ পেলে কি কেউ নিশ্চিত মৃত্যুব মুখে আবাব ফিবে আসে ?

সুতসোম অবাক হয়ে বলেন—কা বলছ তুমি ? সামান্য প্রাণেব চেয়ে মুখেব কথা বড় নয় ?

সৌদাস বলে—নিশ্চয় নয় ! মান্নষকে চিনতে বাকি নেই আমাব।

সুতসোম গম্ভীবকণ্ঠে বলেন—নবমাংসভোজী বলে তে'মাকে আমি ঘৃণা করি নি সিংহীতনয় সৌদাস ; কাবণ, আমি জানি সেজন্ম দায়ী তোমাব জন্ম-ইতিহাস। হিংস্র আণ্যক পাণীব বক্ত তোমাব বমনীতে বহছে বলেই তোমাব চৰিত্ৰেব এই বিকাব—তোমাব ও-বাবহাব সিংহীপুত্ৰেব উপযুক্ত ব্যবহাব, কিন্তু হে কাশীবাজতনয় 'সৌদাস, এইমাত্র তুমি যে কথা বললে—সত্যেব চেয়ে মান্নষেব প্রাণ বড়, এ তো তোমার কাশীরাজ-তনয়েব মতো কথা হল না। মান্নষেব প্রকৃত পবিচয় তো তুমি আজও পাও নি তাহলে।

কেমন যেন খটকা লাগে সৌদাসেব। নবমাংসে তাব আসক্তিব কথা জানতে পোবে সমগ্র কাশীবাসী প্রজাবন্দ তাব বিবন্ধে অস্ত্রধাবণ কবেছিল—তাকে সিংহাসনচ্যুত কবেছে াব। গোটা মন্ত্রগু-সমাজেব বিবন্ধেই প্রচণ্ড অভিমান তাব, অবণ্যাচাবী নবমাংসভোজীকেপে সে এইজন্মই পতিশোধ নিতে উন্নত। কিন্তু এলোকটি যে আজ নূতন কথা শোনাচ্ছে। এ বলছে সেজন্ম সৌদাসকে সে ঘৃণা কবে না। প্রচণ্ড কৌতূহল হল সৌদাসেব। বললে—বেশ, মান্নষেব প্রকৃত পবিচয় পাওযাব জন্ম না হয় একটু মূৰ্খামিই কবা যাক। যাও, মুক্ত তুমি !

সুতসোম চলে গেলেন ভিক্ষু নন্দেব বটিবে। মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্তবাজকে আশ্রমে স্থান দিলেন ভিক্ষু নন্দ। তাকে শোনালেন বুদ্ধ-কণ্ঠ্যপেব সেই অশ্রুতপূব মন্ত্রচতুষ্টয়। পবম ৩প্তি পলেন সুতসোম, মৃত্যুব জন্ম আব খেদ বইল না তাব। পবদিন একাকী ফিবে এলেন সৌদাসেব অবণ্যা-আবাসে। তাকে এভাবে ফিবে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সৌদাস ; বললে—আশ্চৰ্য ! তুমি প্রাণ দিতে ফিবে এসেছ ?

মহাধার্মিক সুতসোম হেসে বললেন—আশা কবি, এতদিনে মান্নষেব প্রকৃত পবিচয়টা বুঝতে পোবেছ তুমি, সিংহীতনয় সৌদাস। নবমাংস ভক্ষণ যদি সিংহীপুত্ৰেব জন্মগত সংস্কার হয়, তবে সত্যধর্ম বন্ধার্ধে প্রাণদানে মান্নষীতনয়েবও আছে জন্মগত অধিকাৰ।

ইন্দ্রপ্রস্থবাজের মহানুভবতায় বিফল হয়ে পড়ে সৌদাস। সে-ও বাজার পুত্র, সে-ও একদিন বসন্ত সিংহাসনে, মাথায় পবত বাজমুকুট। স্নাতসোমের হাত ছুটি ধরে বললে—ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি। জীবনাত্রেই মহত্বে অধিকার আছে। মহত্বেব পবিচয় হয়তো আমিও দেখাতে পারতাম একদিন, কিন্তু তোমরা আমার জন্মের ইতিহাসটা যে ভুলতে পারলে না—শুধু ঘুণাই কবলে আমাকে। তাই আমি আজ নবমাংসভুক বাফস।

স্নাতসোম বলেন—জন্মের জন্ত কেউ দায়ী নয়। কর্মেই তাব অধিকাৰ। তুমি ক্ষুণ্ণবিস্তি কব সিংহীতনয়, আমি প্রস্তুত।

সৌদাস বলে—মানুষীতনয় ইন্দ্রপ্রস্থবাজ, তুমিও এতদিন জানতে না সিংহীশিশুব ঔরুত পবিচয়। আশা কবি, তুমিও এবাব সিংহীতনয়েব প্রকৃত পবিচয়টা পাবে। গোমাকে হত্যা কবব না আমি। তাব প্রতিদানে আমাকে শুধু জানিয়ে দাও বৃদ্ধ-কশ্যপেব কী বাণী শুনে এসে মৃত্যুভবকেও তুচ্ছ করেছ তুমি।

সেই বাণী শ্রবণ কবে সৌদাস সন্ধর্মের অনুসানী হয়ে পাড।

শিগ্ৰুৎ গ্রহণ করে বাজারি স্নাতসোমের।

অস্তবালের পশ্চিম প্রাচীরে আছে বৃহদায়তন একটি সমাপিকাচিত্র (চিত্র - ৬৬)। ঠিক সমাপিকাচিত্র অবশ্য একে বলা উচিত নয়, কাবণ, এতেও আছে তিনটি অংশ। অথবা তিনটি স্তর। এ চিত্রটি কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, অজস্তুয় অতি অল্পসংখ্যক চিত্রই অবশিষ্ট আছে, যাতে রঙ ও বেখা বয়েছে অটুট। এটি তাব একটি। সহস্র বছর পরেও প্রায় প্রত্যেকটি বেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, যদিও বাড়েও ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। তবু রেখার কাবিগবী, যাকে বলে 'পেনসিলিং'-তাব চবম ঔৎকর্ষ এখানে দেখাতে পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, এই চিত্রটিতে শিল্পী বৃহত্তব ভাবতেব, বস্তুতঃ এ প্রাচ্যখণ্ডের, বিভিন্ন জাতিব চিত্র একেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত প্রাচ্যজগতেব সম্পদ, সে সত্য এ-চিত্রে সোচ্চার। 'দিবে আব নিবে মিলাবে মিলিবে'-ব বৃহত্তব মহামানবেব সাগবতীবেব তবজোচ্ছাস এ আলোখে কান পাতলে শুনতে পাবেন। তৃতীয়তঃ, ইটালিবে একটি মনাস্টারিবে নীচু স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে আকা লেওনাটো-ব বিখ্যাত চিত্র 'লাস-সাপার'-এব কল্যাণে যেমন যীশুখ্রীষ্টেব সবকয়টি শিগ্ৰুসমেত প্রভুকে দেখতে পায় খ্রীষ্টান-জগৎ

এ চিত্রটিতে তেমনি বুদ্ধদেবেব যাবতীয় প্রিয় শিগ্ৰুসমেত তথাগত বুদ্ধকে দেখতে পান বৌদ্ধবা।

বুদ্ধদেবেব জীবনীতে আমবা জেনেছি যে, তিনি যখন তাব অভিধর্মেব প্রচাবে ভূ-ভারত প্রদক্ষিণ কবছেন, তখন স্বর্গবাসিনী তাব গন্তধাবিণী জননী মায়াদেবীবে মনে ছুঃখ হয়েছিল তিনি পুত্রবে মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনে যেতে পাবেন নি বলে। বুদ্ধ-জননীবে এই মনোবেদনর কথা জানতে পেবে স্বর্গ থেকে দেববাজ শক্র (ইন্দ্র), ব্রহ্মা প্রভৃতি মর্তো নেমে আসেন বুদ্ধদেবেকে স্বর্গে আমন্ত্রণ জানাতে। গৌতমবুদ্ধ সশবীবে স্বর্গে গিয়ে

অভিধর্মের বাণী প্রচাৰ কবতে সম্মত হলেন। সেখানে তিনি যাবতীয় দেবদেবীর উপস্থিতিতে জননীকে সন্ধর্মের মলকথা শুনিযে আসেন।

স্বর্গ থেকে অববোহণ কবে বুদ্ধদেব দেখতে পেলেন, যাবতীয় পার্থিব মূৰ্ত্তি এবং বৌদ্ধপ্রধানবা সমবেত হযেছেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে। সেই সভায় মহাভিক্ষু সাবিপুত্রকে লোকচক্ষুব সম্মুখে মহাহর্ৎস্বক্ৰে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন কবেন। তিনি জানতেন, মহাজ্ঞানী সাবিপুত্র এ প্রশ্নগুলিব উত্তব দিতে পাববেন। তাব প্রথম প্রশ্নটি ছিল -বস্তুব সংজ্ঞা কি? সাবিপুত্র নিভূঁল উত্তব দিলেন। তখন আরও কঠিন প্রশ্ন কবতে থাকেন বুদ্ধদেব। একে একে সকল প্রশ্নেব নিভূঁল উত্তব দান কবে এই দিনই সাবিপুত্র মহাহর্ৎস্বক্ৰে বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃতি পান।

শিল্পী এই ঘটনাটি অবলম্বনে এখানে একটি বৃহৎ চিত্র এঁকেছেন। আগেই বলেছি, তাব তিনটি স্তবে। উপরে স্বর্গে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচাৰ কবেছেন। দ্বিতীয় স্তবে তিনি স্বর্গ থেকে নাম আসছেন। তৃতীয় ও শেষ স্তবে তিনি সাবিপুত্রকে পবীক্ষা কবেছেন (১৭১-২)।

এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব একটি সিংহাসনে আসীন। তাঁব বামদিকে বসে আছেন দেবগণ এবং স্বর্গগত মহাত্মা পুণ্যাশ্রাব দল। তাঁব দক্ষিণে মায়াদেবী-সম্মেত দেবীবা বসেছেন। এখানে স্বর্গত পুণ্যাশ্রাবদেব মধো একটি বিশেষ মূর্ত্তি দেখতে না পেযে আমি কিন্তু হতাশ হযেছিলুম। আমাব খুব আশা ছিল, শিল্পী শূন্য-সম্বিত একটি

বুদ্ধদেব মগাকৃতি এখানে এঁকে দেবেন, ষোড়শ শতাব্দী-ক

সাবিপুত্রের মূর্ত্তি।

এটি প্রবণ ববে। না, স্বর্গত ঋষি আসিত্বেব আকৃতি আমি খুঁজে

পাই নি বুদ্ধদেব বামে (চিত্র ৬৬-এ এই অংশটি আঁকা হয নি)।

মাঝখানে দেখছি, হুঁষিত স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন বুদ্ধদেব। তাঁব সঙ্গে বযেছেন আরও কয়েকজন স্বর্গীয় সহচব। বোধ কবি, স্বর্গ থেকে বিদায়েব মুহূর্ত্তে ওঁবা এসে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কবেছেন। এখানে লক্ষণীয়, সবকয়টি ফিগব-ই যেন ভাবহীন

যেন এ তাঁদেব স্কুল শবীর নয়, যেন বাতাসে ভাসছেন তাঁবা। পঞ্চদশ শতাব্দীব ইটালীয় চিত্রকব পেকজীনো-ব বিখ্যাত চিত্র 'খ্রীষ্টেব শিশুচতুষ্টয়'-এ যেমন মনে হয, ফিগবগুলি মনুষ্যাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অপার্থিব, ভাবহীন এখানেও বুদ্ধদেব ও তাঁব সহচবদেব তেমনই মনে হয। স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেবেব অবতরণেব এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে সাঁচিব উত্তব-তোবগপথেব পশ্চিম দিকস্থ স্তম্ভেব সর্বোচ্চ পানেলে একটি ভাস্কর্য আছে। সেখানে শিল্পী ত্রিশটি বাপ এঁকেছিলেন এখানে দেখছি মাত্র পাঁচটি ধাপ দেখিয়েই হাঁকিতে সোপানেব অস্তিত্ব বোঝানো হযেছে। লক্ষণীয়, পাঁচটি ধাপেব মধো একমাত্র যেটিতে বুদ্ধদেব পদার্পণ কবে আছেন, সেটিতেই নকশা-কাটা আছে। কিন্তু তা তো হয না। সিঁড়িব সব ধাপেই তো একই অলঙ্কবণ থাকাব কথা। বোধ হয় এভাবে শিল্পী বলতে চান, কোন ধাপেই নকশা নেই—প্রভুব চবণপদ্মপাতে ঐ বিশেষ ধাপটি

রোমাঙ্কিত হয়েছে মাত্র। তিনি যখন পবনভী ধাপে পদার্থণ কববেন, তখন সেটিই আবার বোমাঙ্কিততন্ত্র হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেবের ছুপাশে চক্ৰজনের হাতে আছে চামর—পিছনে একজনের মাথায় অদ্ভুতদর্শন বাজমুকট। বুদ্ধদেবের মাথার উপর সম্মানছত্র।

এবার নীচেব অংশটি দেখি। সোপান-শ্রেণী ও হাতীব পিঠে হাওদাব নকশা অর্ধ-চন্দ্রাকারে একটি যতি-চিহ্ন-বেখাক্রমে এই নীচেব অংশটিকে স্বর্গাবতরণ খণ্ডচিত্র থেকে পৃথক কবেছে। নীচে দেখছি, একটি বস্ত্র-সিংহাসনে বুদ্ধদেব আসীন। প্রলম্বিতপদ ধর্মচক্রে মুদ্রায়। সামনের জমি পুষ্পাকীর্ণ বুদ্ধদেবের পিছনে একটি জ্যোতিঃপ্রভা। প্রভার ছুপাশে দুটি গন্ধর্বশিশু—তাদের পিছনে ছোট ছোট মেঘস্বূপ গন্ধর্বশিশু দুটি যেন উড় আসছে। বুদ্ধদেবের ছুপাশে দুই বোধিসত্ত্ব। বামে বজ্রপাণি, দক্ষিণে পদ্মপাণি। তাঁর দক্ষিণে বাজেন্দ্রবৃন্দ ও বামে শিষ্যদল। এ অংশে পঞ্চাশটির বেশী মূর্তি আছে, তিনটি হস্তী ও ছয়টি অশ্ব (চিত্র ৬৬-তে সম্পূর্ণ মল চিত্রটি আঁকা হয় নি, ফলে, পাঁচটি অশ্ব) আছে। লেওনার্দো-ব “শেষ সাযসাশ” (‘‘ona l’ltiu’’, চেনা উলতিমা) চিত্রটিও এমনি প্রতিসাম্যমূলক। কেন্দ্রস্থলে যীশুখ্রীষ্ট, তাঁর এক এক দিকে ছয়জন শিষ্য। খ্রীষ্ট ধর্মেব গ্রন্থ আলোচনা কবে এই দ্বাদশজন শিষ্যকেই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত কবেছেন বিশাবদেব দল। বুদ্ধদেবের অন্যান্য চৌত্রিশজন প্রধান শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, এ চিত্রে বুদ্ধদেবের বামে আঠাবজন শিষ্যকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর ভিতর মাত্র দুটিকে সনাক্ত কবতে পেবেছেন বিশেষজ্ঞবা। বস্তুতঃ, এ চিত্রের পঞ্চাশোর্ধ্ব চবিত্রের ভিতর মাত্র সাতজনকে সনাক্ত কবতে পেবেছেন অজ্ঞতা-বিশাবদ ডাঃ গোলাম ইযাজদানী। বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি ও বজ্রপাণির কথা আগেই বলেছি। বাকি চাবজন হচ্ছেন এঁবাঃ বুদ্ধদেবের দক্ষিণপদেব সমীপবর্তী ভূতলে উপবিষ্ট যুক্তকব বাজা হচ্ছেন মগধ সম্রাট বিম্বিসাব, তাঁর অতি সন্নিকটে কিশোর বাজবুমাবটি হচ্ছেন তাঁর যুববাজ অজাতশত্রু। বুদ্ধদেবের বামে শিষ্যদলেব মধ্যে প্রথম সাবিতে দ্বিতীয় মূর্তিটি হচ্ছে জ্ঞানয়ুক্ত সাবিপুত্রের। তাঁর পিছনেই যুক্তকব (গৌফ-ওয়াল) মূর্তিটি মহামৌদগল্লায়নের। বাস, এছাড়া আন কাউকে চেনা যায় না।

ডাঃ ইযাজদানীব একটা অশুবিধা ছিল, যা আমাব বা আপনাব নাই। তিনি বিশেষজ্ঞ—তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আপনি-আমি বসপিপাস্ত্র দর্শক—এসেছি অজ্ঞতা দেখে মনপ্রাণ ভরে নিয়ে যেতে। আমবা যদি কল্পনাব রাশ একটু আল্গা কবে দিই—এবং ভালবাজ্যে যদি একটু বেশী আনন্দবস আহরণ কবতে পাবি ‘তাহে কিবা কাব ক্ষতি?’ আগুন, আমবা পবামর্শ কবে আবও কয়েকটি চবিত্রকে সনাক্ত কবি। যাতে বিশেষজ্ঞের দল নেহাৎ ঠাঁ-ঠাঁ কবে প্রতিবাদ কবতে ছুটে না আসেন, তাঁর কিছুটা যুক্তিও দেখাব আমবা।

প্রথমতঃ বলব, বাজা বিম্বিসাবেব বামে মুকুটধারী রূপাতি হচ্ছেন কোশলবাজ প্রসেনজিত। যুক্তিঃ ডাঃ ইযাজদানী বিম্বিসাবেকে সনাক্ত কবেছেন কোন যুক্তিতেঃ

চিন্তে এই অজ্ঞান। x-নূপতিটিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে—বুদ্ধদেবের নিকট যে সব মহাজ্ঞানপদ-নূপতি অভিধমে দীক্ষা নিয়েছিলেন, বিশ্বিসাব তাঁদের মধ্যে প্রধান। এই দুটি সহ-সমীকরণের সমাধান করে ইয়াজদানী বলেছেন, x—বিশ্বিসাব। অনুকল্পভাবে আমরা বলব—বিশ্বিসাবেব পাশে এই অজ্ঞান। y-নূপতিব অবস্থান প্রাধিক্তেব দিক থেকে দ্বিতীয় এবং প্রসেনজিতের স্থান প্রথম যুগের বুদ্ধ-নূপতিদের মধ্যে বিশ্বিসাবেব পবেই। এতএব,  $y = \text{প্রসেনজিত}$ ।

এবাব বুদ্ধদেবের বামচরণ-প্রাপ্তেব সৰ্বনিকটতম মূর্তিটি। শিল্পী একে সাবিপুত্রের চেয়েও বুদ্ধদেবের নিবটতব কবে একেছেন। এব মুখে দেখছি ঋটিয়েছেন এক বিচিত্র হাস্যবেখা, বয়সে তঁন ৩কণ। তবু কেন যে একে ইয়াজদানী সনাও কবেন নি, আমি জানি না। আনান মতামৎ ব্যক্ত কবার আগে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা ঘটনাব কথা বলি :

• মহাপাঁও সাবিপুত্র একবাব বলেছিলেনঃ আমার দট বিশ্বাস, এই ধবাধামে তথাগত বুদ্ধদেবের নত মহাজ্ঞানী উতিপবে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি, আজও নেই, এবং ভবিষ্যতেও কখনও অবতীর্ণ হবেন না।

বুদ্ধদেব সে-কথ শুনেও পে.প. বশ্লেছিলেন তোমার বাণী অশাস্ত্র শ্রুতিমধুব, কিন্তু হে পঙ্কিতাগগণা সাবিপুত্র, তুমি একথা বলাব পূবে এতাবৎকাল যে সব মহাপুরুষ এই ধবাধামে অবতীর্ণ হায়েছেন তাঁদের জীবনী ও বাণী নিশ্চয়ই জেনে নিয়েও।

সাবিপুত্র সলঙ্কে বলেনঃ কাল অনাদি দব অতীতের সৰ্বলের সকল কথা আমি কেমন কবে জানব প্রভু ?

তা বটে। অনন্ততঃ ভবিষ্যতে এ ধবাধামে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ কবেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই তুমি দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পেবেছ ?

আনও লজ্জা পেয়ে সাবিপুত্র বলেনঃ আজ্ঞে না। পান ওব অনাদি নয়, সে যে অনন্ততঃ। স্তম্ভ ভবিষ্যতের কথা আমি কেমন কবে জানব প্রভু ?

ঃ তাও তো ঠিক। তাতলে অনন্ততঃ আজ এই ধবাধামের বিভিন্ন প্রতাপ্তদেশে যত মহাপুরুষ মবদেহ বাণণ কবে বিচরণ কবেছেন, তাঁদের সদৃশক তোমার সম্যক ধারণা হায়েছে নিশ্চয়।

মবমে মবে গিয়ে সাবিপুত্র বলেন—কাল যেমন অনাদি-অনন্ত, পৃথিবীও তেমনি বিপুলা। এই বিপুলা পৃথিবীর সকল প্রতাপ্তদেশের সবাদ আমি কেমন কবে জানব প্রভু ?

বুদ্ধদেব শুধু বললেনঃ তাও তো বটে। এ তো খুব ভাবনার কথা দেখি।

তখন বুদ্ধদেবের চরণে সাষ্টাঙ্কে প্রণিপাত কবে সাবিপুত্র বললেনঃ আমার ভুল আমি বুঝতে পেবেছি প্রভু।

বুদ্ধদেব তখন শিষ্যদের বলেছিলেনঃ জ্ঞানমাগে সাবিপুত্র সবাগ্রগণা, কিন্তু সে আমাকে এত ভক্তি কবে যে, বর্ষণ-উন্মুখ ভক্তিব মেঘে তাব জ্ঞানসুধ কখনও কখনও

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি ছু-নৌকায় পা দিয়ে সারিপুত্র অগ্রসর হতে বাধা পায়। অথচ তোমরা আনন্দকে দেখ, সে শুধু সেবার মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির এলোমেলো হাওয়ায় তাব নৌকা একটুও দোলেনা।

আনন্দ ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র। বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। মহানির্বাণের সময় বুদ্ধদেব তাঁরই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ভিক্ষাপাত্রটি। এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বুদ্ধদেবের বানচন্দ্রবর্তী বিচিত্র হাশ্ববেধায় সমুজ্জল ত্রৈলোক্যটিকে সনাতন ববতে তামার গো বই বাধে না। বুদ্ধদেবের কঠিন ও কুট প্রশ্নে বং সারিপুত্রের জ্ঞানগত পত্রান্তরে সনাই যখন অভিভূত, “তখন মনে মনে বলছে। ‘আনন্দার্গেব এ-নৌকায় আনাব কি পয়োজন। আমি আছি তোমার চরণসেবা কবতে - তাই বসেছি, তোমার চরণমূলে। আনাব নিবাণ নৈকায় কে? যেন এ-কথা ভেবেই ওষুৎ, অথচ ফুট উঠেছে নৈমোনানসামাকা বিচিত্র হাসিটি।

প্রাচীরের বিশ্রীণ হাশ জড়ে সম্পদশ হস্তায় অব। এক ববতে চণটি শজন্তুর অগ্নতম শ্রেষ্ঠ চিত্র গো বটেই, বোন ববি বিশ্রণ অগ্নতম শ্রেষ্ঠ বেসে।

বুদ্ধদেবের বানপাঠের আগে একটিমাত্র হস্তী। তাব পিঠে একজন মতিন, সঙ্গে সহচরী বদল ‘বানর্গি’ চিত্র তাব হস্তী হস্ত মিলেগটি হাতহো বে। আনুপালী বই ঘটনা পববর্তী নারো, বুদ্ধদেবের বানাতা মঃ ‘গাঃ’ শিষ্টস্বী হয়ো-গোন একেবাবে শেষ পযাযে। আমি, তা মনে ববনছি, নৈ মঃ হস্তীটি হাচ্চন কাশীর বণিকশ্রেণে যশের সহধর্মিণী। সাবনাথ মৃগদাণে প্রথম পঃ চণ পবতনের এনএবো বানব কাশীধামের শ্রেষ্ঠ বনী বণিকপ্রব। বশদেব সঙ্গীক ও সনাতা বুদ্ধদেবের বাছে দাফ নিবেছিলেন। যশ-জাবাঠি হাচ্চন গোতনববের প্রথমা শিষ্টা, আনাব বা-না, হাশ্বপুটে ই মঃ হস্তীটি যশোদেব-জাবা। একটিমাত্র সংশব ওষুৎ হাচ্চ শিষ্টী এব মাখাব মুকুট পবিযেতেন। বাজা ও বানী ছাড়া অজস্রা-শিষ্টী মুকুট ব্যবহার কবতে চান না সচনচব।

পাঠক যাতে অস্বাভাব চবিগ্রহণব সনাতনববে নিজেই সচেষ্ঠ হতে পাবেন, তাই বুদ্ধদেব যে ক্রমপযাযে দাফ দিয়েছিলেন, সেইভাবে তাব প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিষ্যদেব কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম।

--

(১) যে বদনব বুদ্ধদেবের বানপারিনাৎ হয়, নঃ হস্তী হস্তগণব বাবাব পব বশো নপবার উপকর্মে আনুপালার সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়।

(২) ‘অপরূপা অজস্রা’ প্রবন মঃ পঃ পঃ হাত ব তথাপিক পরম শক্ত্যম্পদ মঃ হস্তী হস্তগণব চটাপাব্যার এই অংশটির প্রসঙ্গে আমাকে বনোচালন ‘তুমি যখন বনানব পঃ জালুগা কব দিতেও রাৎ হাচ্চ, তখন ই মঃ হস্তীক বশোদেব-জাবা মনে না কবে মহাগোতম ও হো মনে করতে পঃ। তার পিছনের বিক্ষাণিতনয়না মঃ হস্তীকে সেক্ষেত্রে বশোধবা এবঃ গঃ হস্তব উপবে যুক্তকব শিষ্টস্বীটিকে রাঃ বলে মনে করা চলবে।’

বুদ্ধ শাস্ত্রকব ববমেন, গোতনের বানাতা মহাগোতন পঃ যশাধর ভিস্বী হবাব অঃ হস্তীপ্রাধিণী হিসাবে বুদ্ধদেবের অঃ হস্তগণ কবেছিলেন পর্যকাল। একবাবে শেঃ পরাবে এ অঃ হস্তী দিঃ হস্তগণ বুদ্ধদেব। এ-টিয়ে বুদ্ধদেবের বামবিক একমাত্র হস্তী পুটে শাক্যপুরকামিনীদেবই হযতে বকেছেন অজস্রা-শিষ্টী। বঃ হস্তীটির বাজনার সেক্ষেত্রে বোকা। যার আমি আনন্দবিত্তে উঃ এ-মঃ মনে নিবেছি।



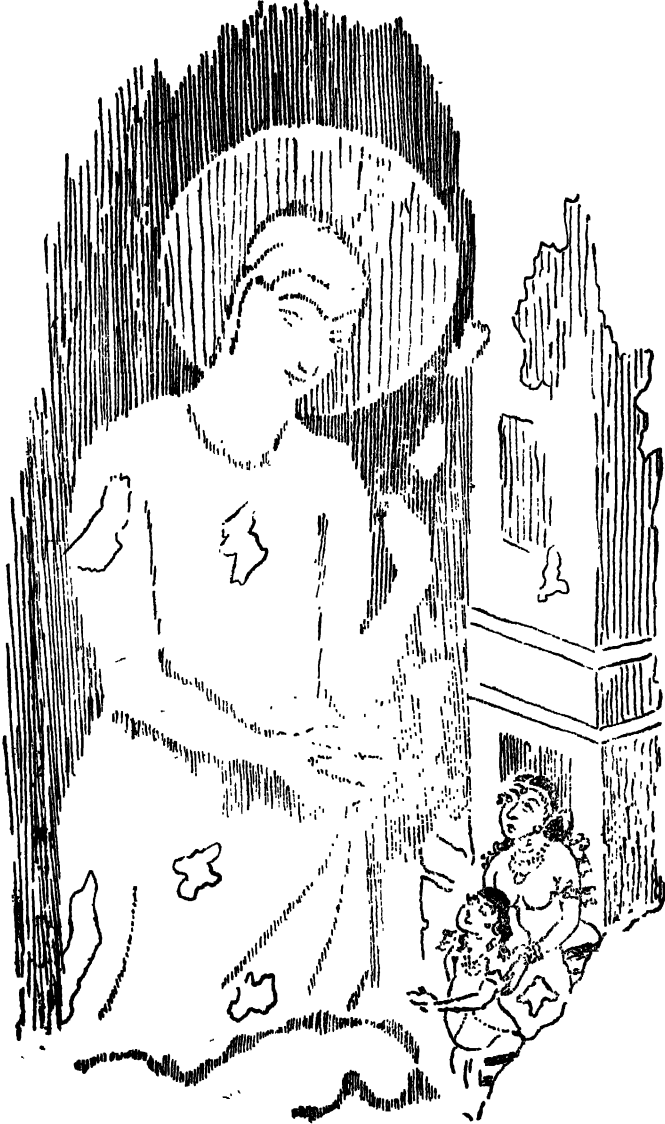
ধ্যান-কোণ্ডিয়া, অশ্বজিত, ভাস্প, মহানাম, ভজ্রিক, যশোদেব (স্ত্রী ও মাতা), বিমল, সুবহু, পূর্ণ, উরুবেলা-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ, গয়া-কাশ্যপ, সারিপুত্র, মহামৌদ্যগল্লায়ন, চন্দ্র, অনিরুদ্ধ, নন্দিন, সুভূতি, রেবত, অমোঘরাজ, মহাপারগিক, ভকুল, নন্দ, রাজল, স্বাগত ও আনন্দ ।

মূল গর্ভ-মন্দিরে মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের বিরাটায়তন মর্মরমূর্তি (১৭১২৩) । ধ্যানস্তিমিত ধর্মচক্র মুদ্রা । প্রলম্বিতপদ—অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত চিত্রে যা দেখেছি । পদভলে মৃগদাবের প্রতীক ছুটি হরিণ-শিশু । মূল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশপথে বামদিকে অন্তরালের উত্তর প্রাচীরে সপ্তদশ গুহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রটি । সেই গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব (১৭১২৪) ।

চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শককে কঁাদতে দেখেছি । উপস্থাস পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের পাতা ভিজে উঠতে দেখেছি । কিন্তু কোন একটি স্থিরচিত্র দেখতে দেখতেও যে দর্শকের চোখ অশ্রু-সজ্জল হয়ে উঠতে পারে, এই চিত্রটি দেখবার গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব আগে তা জানা ছিল না । একক চিত্র তো নয়, ওর ভিতরেই যে দেখতে পাচ্ছি মন্দভাগিনী যশোধরার সমস্ত জীবনটাকে । ওর চোখের তারায় ওর ছুটি হাতের মুদ্রায় যে অনেক কথা ও বলছে—নির্ধাক্ত চিত্র তো এ নয় ।

দেখছি, অতি বিশালায়তন বুদ্ধদেবের সম্মুখে ছুটি ক্ষুদ্র প্রাণী (চিত্র—৬৭) । বুদ্ধ দেবের পরিধানে পীত অঙ্গিন, তাঁর মাথা পিছনে জ্যোতিঃপ্রভা : তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র । বিশাল করে ঝাঁকলেও শিল্পী কিন্তু বুদ্ধদেবকে স্পষ্ট করে ঝাঁকেন নি । পশ্চাদ্ভাগের উপর তাঁর দেহাবয়বকে সুস্পষ্ট বেখায় চিহ্নিত করেন নি । যেন মনে হয়, এ কোন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—এ যেন এক দীর্ঘাত্ত অপর্যায় সত্তা । তিনি অতি বিশাল, তিনি মহিমময়, কিন্তু তিনি রঙ ও বেখার বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ ! অপরপক্ষে, গোপা ও বাহুল আয়তনে ছোট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেহের প্রকৃতি দেখা, অলদার, পরিধেয়ের প্রতিটি পরিচয় সুস্পষ্ট ।

যশোধরার পিছনে একটি ভোরগদার—মহামানবের পিছনে রেখাঙ্কীন রঙহীন কালো আকাশ । যশোধরার পরিধেয় শুভ্র, বুদ্ধদেবের পশ্চাদ্ভাগে ক্রকবর্ণ । শিল্পী কি জানতেন এ বৈজ্ঞানিক সত্য—যে সাতটা রঙ যেখানে ঘন হয়ে আমে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রতা, আর সব রঙ যাকে ভাগ করে যায়, তারেকই অধিভূত করে ক্রকবর্ণ ? জানি, ঐ বৃহৎ ভোরগদারটি ভারসাম্যের খাতিরে ঝাঁক । বিশালায়তন বুদ্ধদেবের তুলনায় নারী ও শিশু দুটির আকার বা 'ম্যাস' ঘাটুতি হয়ে যাচ্ছে বলে ঐ ভোরগদারটি ঝাঁকতে বাধ্য হয়েছেন তিনি ; কিন্তু বিশ্বাস করলে ইচ্ছা করে সেজন্য নয়—শিল্পী যেন বলতে চান যশোধরার পশ্চাদ্ভাগে জীবনের তোরণদ্বার গাঢ় রুদ্ধ, আর তুলনায় মহামানবের পশ্চাতে শুধুই মহাশূন্য ।



চিত্র—৬৭ : বুদ্ধদেব, গোপা ও রাজল

অবস্থান—১৭১২৪

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে এসে প্রাচ্য-শিল্প-বিশারদ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :<sup>১)</sup>

মহিমময় বুদ্ধদেবের সুস্থখে উল্কাদানরত নারী ও শিশুপুত্রের চিত্রটি অবিস্মরণীয়। ...মিঃ গ্রিফিথের গ্রন্থে এবং ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত এ্যালবামে শুধু নারী ও শিশুকেই আঁকা হয়েছে—আশ্চর্যের কথা,

(১) Introduction by Lawrence Binyon to "My Pilgrimages to Ajanta & Bagh"—by Mr Mukul Dey, London 1923.

কেউই তার সঙ্গে বৃদ্ধদেবের চিত্রটি আঁকেন নি। কলে, মাতাপুত্রের ঐ বিশেষ ওল্লিতে তাঁড়িখে থাকায় যিনি মূল উৎস, তাঁকে পাঠক অন্তর্মান করতে বাধ্য হন।

কিন্তু আর একটা কথা। তিনটি চবিত্রকে ক্ষুদ্র গ্রন্থেব পৃষ্ঠায় একসঙ্গে দেখাতে গেলে, মাতাপুত্রের দেহাবয়ব এত ক্ষুদ্র হয়ে যায় যে, তাব সৃষ্টি কাজ দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাতাপুত্রকে কিছু বড় করে আবার একে দেখাতে হল (চিত্র—৬৮)। এবাব চেয়ে দেখুন বাহুল্যের দিকে, কী অপার বিন্যাস, কী অপূর্ব আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী ও শিশু-মুখে! দেখুন মন্দভাগিনী যশোধবাকেও। লক্ষ্য করুন ওঁব কবাস্কুলিব মুদ্রা!

ত্রিফিথ বলেছেন :<sup>১</sup>

Hands are put in with a pretty manner, grace and truth of expression which, to those acquainted with Indian life, is full of suggestiveness. It is precisely this that, to this day, supple wrists, palms, and fingers beseech, explain, deprecate and caress.

যশোধবাব ছুটি হাতের কবাস্কুলি যেন তাব হয়ে কথা বলছে। এক বলে এ ছবি নির্দোষ? একট কান পাতলেই শুনতে পাবন, ওব বামহস্ত বলছে: 'তাপুত্র পাগলা, ঐ তোব বাপ। মা ওব কাছ, ও তোকে পৃথিবীব বাজা করে দিতে পাবে। এই বেলা চেয়ে নে তোব পিছুন।'

কিন্তু এই তো যশোধবাব শেষ কথা নয়। সে যে তাব জীবন দিয়ে চিনে নিয়েছে ঐ দযাব অবতাব' নিষ্কব উদাসীন মানষটিকে। তাই ওব অবচেতন মনে আছে শধা তাই বা-হাতে ছেলেকে ঠেলে দিয়ে ও ডান হাতে আবার তাকে আগলে রাখছে মন্দভাগিনী! তাই ওব ডান হাতের কবাস্কুলি বলছে: 'যাসনে বে, যাসনে। ও বড় নিষ্ঠুর। ও কেড়ে নিয়েছে আমাব স্বামীকে— শ্রয়োগ পেলে ও কেড়ে নেবে আমাব সন্তানকেও! ও যে দযাব অবতাব।'

বিনিয়ন বলেছেন :

আমিাব শিল্পাঙ্গেশেব জীবনে এব চেয়ে মহিমময়, এব, এমন নকণাষ আপ্ত মর্যসঙ্গী কোন চিত্র দেখেছি বলে তো মনে কবতে পারছি না।

এ-চিত্র প্রসঙ্গে এইটিই শেষ কথা নয় কি?

এবাব আমবা দেখব আব একটি সুদীর্ঘ জাতক-কাহিনী বিশ্বাস্তব-জাতক। কিন্তু চালচিত্র ছাড়া যেমন প্রতিমাব স্বরূপ ফোটে না, পশ্চাদপট ছাড়া যেমন কোন ছবি খোলে না, তেমনি বিশ্বাস্তব-জাতকের প্রকৃত গলায়নের জন্ত বোধিসত্ত্ব বিশ্বাস্তবের বংশ-পরিচয়টি জানা থাকা দবকাব। বিশ্বাস্তবের পিতামহ হচ্ছেন স্বনামগন্ত মহাবাজ শিবি। মহাভাবতে<sup>২</sup>

(১) *Guide to Ajanta Frescoes*, Dept of 'Archeology, H E H. the Nizam's Govt, Hyderabad, 1935.

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত-বনপর্বে (১১১ম অধ্যায়) ও অশ্বশাসন পর্বে (২-৩ অধ্যায়) শিবিরাজ্য কাহিনী উল্লেখ। সেখানে শিবিরাজ্য পরণাথ কবুতবর লক্ষ নিরু দেহের মাস দান ববেছিলেন।

সত্যনিষ্ঠ শিবিরাজার উপাখ্যান আমবা পড়েছি, সে কাহিনী প্রথম গুহায় ঝাঁকা আছে, তা-ও দেখে এসেছি আমবা (১।৩)। জাতকমতে শিবিরাজার কাহিনীটি অশ্রবকম।

বিশ্ব শব্দ জাতক

একজন অন্ধ ভিখারী তাঁব কাছে একটি চক্ষু ভিক্ষা করেছিল,

দানশীল শিবিরাজা তাকে প্রার্থনার অতিবিক্ত নিজের ছুটি চক্ষুই

দান করেন। মহাভারত-বর্ণিত কাহিনীর মত এখানেও দেবরাজ শত্রু শিবিরাজকে ছুটি চক্ষুই প্রার্থ্যণ করেন। সেই কাহিনী অবলম্বনে অজ্ঞান-শিল্পী এই সপ্তদশ গুহাতে একটি



চিত্র- ৬৮

গোপা ও বাজল

বস্তান ১৭২৪

অনবদ্য চিত্র ঐকে বেশে গেছেন। সেই শিবিরাজার পুত্র হচ্ছেন মহামতি সঞ্জয় এবং তাঁব পুত্রবধু হচ্ছেন মহাবানী পুষ্পতী। যবরাজ বিষ্ণুদেব এদেবই সম্বান। তাঁব জীবনের মূলমন্ত্র ছিল পিতামহের বাণী :

অতি প্রিয় ভাব ২'রে যাহা ৩ব আঁও আবেবেণ  
তাহাও চাহিলে দিবে ভূমিবাণে মন যাচকেব ॥'

বিশ্বাস্তবেব জন্মেব পূবেই বাজমহিষাব কবকোশী বিচাব কবে গ্রহাচাব বলেছিলেন, জাতক হবেন ভুবন-বিখ্যাত দানবীৰ এব একে বাঁজৈশ্বযেব মগো আবদ্ধ কবে বাখা যাবে না, ইনি যৌবনেই বনবাসী হবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ কবে মহাবাজ সঞ্জয় এব মহাবানী প্রতিজ্ঞা কবলেন, এ অখটন কিছুতেই ঘটতে দেবেন না ওঁবা।

অনুমাত্র জাতক না'ক বলেছিল মা, শ্যামি কিছু দান কবেও চাই যবে কিছু আছে ?

শিশুবালা শোকত বিস্বাস্তব ত ম', শ্যামি সজ, সব কিছুকেই সে দান কবে দেয জাহায়, বদ, অলঙ্কার স পাবে

সঞ্জয় আন পুনঃই গাফ) কবলেন দান না না কব মনেব গাও বাবা দেন না তাবা। পিতামহেব দানশীলত পোএব মবে। স এ ১১০ ও ২২০২৩।

অষ্টমবর্ষ ববসকালে বালক ম'কে প'ল - আঁমি এমন কিছু দান কবেও চাই, যা হবে মহাদান। না হলে উপ হবে না আমাব অশান্ত হৃদয।

ক্রমা ব লন বি দন কবেও চাই হু'ন

--গামি ব দ হব কোল হু'ন। না স, চন ওখণা হু'দয

দিতামহেব দানশীলতাব প্রতিশ্রুতি ক'ত চাই হু'ন।

বালক বলে শি'ম'হর ক'লে ও'ক প'টি চন প্রাণী ক'লেচি'না াঁন এবে ছুটি চক্ষুই দান ক'লেছিলেন। তার এতদগন ক'ব'ব' বেমন ক'লে না আমাব লে ছুটি বও চক্ষু ন'শ।

ভাবিতা হ'ল'ন জননী, দাশ্চল্যগ্রস্ত হ'লেন মহাবাজ বিস্ময়, কিছুতেই তাবা যুবরাজকে বনবাসী হতে দেবেন না। মহাবাজ সমস্ত বাণে অর্পণ ক'লে এক অপকৃপা সূন্দরীকে নিয়ে এলেন পুত্রবণ বলে। বিশ্বাস্তব-ক্রমা সজ্ঞাবিশ্বস্তিতা পুত্রবণকে জনাঙ্কিকে নিয়ে এসে বলেন গ্রহাচাধি ভবিষ্যদ্বাণী ক'লেছেন, তোমাব স্ত্রী যৌবনকালে পিতামহকে ত্যাগ ক'লে বনবাসী হ'বে। সে ললাট-লিখন ব্যর্থ ক'লেও হ'বে তোমাবে। ক'মন, পাবে ?

নববয়সলক্ষে শ্রীবাভক্তি ব'লে জানাব স পাবে

বিশ্বাস্তব-জাযা মাত্রী বিতর্বা ছিল না মহাবাজ-ব-পত্নী সীবলী'ব মত, কিন্তু তাব সংসার-জ্ঞান ছিল প্রথব। সীবলী'ব মত সে ক'লে ভোলাবাব চেষ্টা ক'বে নি, ভালবাসা দিয়েও নয়—সে ঠিকই চিনতে পেরেছিল বাজপুত্রকে। সে জানত, কৌরোগেব কী ওষধ।

বিবাহ-উৎসবশেষে পুষ্পস্ববক-সজ্জিত পালকে নববিবাহিত দম্পতীর বাসবশয়্যায় মাজীকে হাত ধবে পৌঁছে দিয়ে গেল নর্মসহচরী বদল। সজ্জীত, কোতুক, হাশ্ব-পরিহাস শেষ হলে অর্গলবন্ধ ঘবে নবদম্পতীকে বেখে বিদায় নিল তারা। মাজী তখন বিশ্বাস্তবের পদপ্রান্তে নামিয়ে বাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। বাছমূল ধবে বিশ্বাস্তব ওকে তুলে ধবেন। পদ্ম-কোবকতুল্য ছুটি হাত জোড় কবে মাদ্রী বলে—প্রভু, এই আনন্দের দিনে একটি ভিক্ষা আছে।

উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন বিশ্বাস্তব। দান কবতে পাবলে আব কিছু চান না তিনি। বলেন বল স্চবিভূত, কী দান পেলে সুখী হবে তুমি ?

প্রতিশ্রুতি দিন, আমাকে ত্যাগ কবে প্রব্রজ্যা নিয়ে কোনদিন বনবাসী হবেন না ?

বিশ্বাস্তবের প্রস্তাবে ফুটে ওঠে ক্ষীণ হাস্যবেখা, বলেন কর্তিন প্রতিশ্রুতি খাদ্য নব নিলে তুমি কিন্তু প্রার্থীকে আমি কখনও বিমুখ কবি না। দিলাম প্রতিশ্রুতি, গুচিস্তে।

মিলন-বাহিনীশেষে দ্বাব খুলে বাহিরে এসে মাদ্রী দেখে, অলিন্দেব একান্তে প্রভাতের প্রতীক্ষায় জগে বসে আছেন বিশ্বাস্তব-জননী। পুত্রবধকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে বলেন মনে আছে ?

সলজ্জ মাদ্রী বলে—আছে মা, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে ত্যাগ কবে সম্মাস নেবেন না।

স্বাস্তব নিশ্বাস পড়ে সঞ্জয়-জায়াব।

স সাবে আবদ হয়ে পড়েন ক্রমে বিশ্বাস্তব। ছুটি সন্তান হয়েছে তাঁব। দেবশিশুর মত দিব্যকাহ্নি দুটি নিষ্পাপ শিশু ওরপক্ষেব চন্দ্রকলাব মত দিন দিন বাজপাসাদবে উজ্জ্বল কবে গেলে। মাদ্রীব ছুটি নয়নের মণি যেন পুএ জালী আব কণ্ঠা কৃষ্ণাজিন। মহাবাজ সঞ্জয় শাস্ত্র হন, পৃথতী নিশ্চিন্ত হন গ্রহচায়েব ভবিষ্যদ্বাণী তাবা বাখ কবে পেবেছেন।

এদিকে দানবাব বিশ্বাস্তবের জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন নেই। ক্রমাগত ছুঁহাতে দান কবে চলছেন তিনি—তাঁব বৈভব, তাঁব সম্পদ, বাজপুত্রের ব্যক্তিগত যাকিছু—অলঙ্কার, পারিবেয, আহাব, তৈজসপত্র। বাজা-বানী ক্রক্ষেপ কবেন না—অতুল বাজ-সম্পদের কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে এতে ?

প্রমাদেব সূত্রপাত প্রথম দেখা দিল, যেদিন যুববাজ একজন প্রার্থীকে দান কবে বসলেন নিজ তববারি। অসঙ্কট হলেন অমাত্যবর্গ, আতত হলেন মহামন্ত্রী, ক্ষুব্ধ হলেন প্রবান সেনাপতি। এ কী অনাচার। ক্ষত্রিয় বাজপুত্র যদি আশ্রয়ক্ষান অঙ্গ পর্ষত্ব নিদ্বিধায় দান কবে বসেন, তবে প্রজাবন্দ কোন ভবসায় তাঁব হাতে তুলে দেবে শাসনদণ্ড ?

মহাবাজ সঞ্জয়-ও মমাহত হয়েছিলেন, কিন্তু পুত্রের দানকার্যে তিনি কখনও বাধা দিতেন না, তাঁই স্বীকাব করে নিলেন যুবরাজের এই অক্ষত্রিয় আচার !

কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। এব কিছুদিন পবে কলিক্ত দেশে দেখা দিল অনাবৃষ্টি-জনিত ছর্ভিক্ষ। নিবল্ল প্রজাব দল ভিক্ষার্থে এল বাজপ্রাসাদে, কিন্তু তারা বাজদববাবে না গিয়ে এসে দাঁড়াল যুববাজেব গৃহে। এদের ছুদশাব বিগণিও হয়ে গেলেন বিশ্বাস্তব —ওদের দান বর্ধে দিলেন বাজহ ত্রীটিকে।

এই বাজহস্ত্রীটি ছিল বাজোব শ্রেষ্ঠ সম্পদ বা হস্ত্রীকবে সে নিম্মেধ আকাশে আষাট-সঘন জলদ সঞ্চাব কবতে পাবত। উৎফুল্ল কলিক্তবাসীরা বাজহস্ত্রী নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাভর্ভন কবে, কিন্তু এদিকে সঞ্জযেব বাজো ঘনীভূত হয়ে ংতে প্রচণ্ড অসস্তোষ। বাজপুত্রেব কোন অর্বিকার নেই বাজসম্পদ এভাবে পববাজো বিলিয়ে দেবাব। অসস্ত্য পজাববন্দ প্রকাশে অভিযোগ আনল বাজদববাবে তারা বাজপুত্রেব বিচার চাব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহাবাজ।

মহামন্ত্রী তার বর্ধমলে নিবেদন কবেন, প্রজাববন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে অবিলখে পববাজকে স্তানাস্তবে প্রেবণ বকন। নচে-১১৭ ন। ববা গুপ্তপাতক নিযুক্ত কবে বসবে।

মহাবানী বলেন কিছুদিনেব জন্ম ংবে নাভুসালয়ে প্রেবণ কবন মহাবাজ।

মহাবাজ সঞ্জযেব মুখে যুচে শ্রেষ্ঠ বিচিণ হাস্তবেবা তার সেই গম্মাভাবিক ংতি দেখে শিহবিত হালেন বানী। মহাবাজ বলেন, মন্ত্রীমহোদযেব পবাসর্ধও শুনেছি, মহাবানীব স্তুযুক্তিও গুনলাম কিন্তু তোমবা একটা কথা ভূলে গেছে, তা হচ্ছে এই যে, আন যে সি হাসনে বসে আছি, সেও সি হাসনেই একদিন উপবেশন ববাস্তন সত্যনির্ধ মহাবাজ শিবি।

মন্ত্রী বলেন সে-কথা বেন বগাচেন মহাবাজ ?

দৃচকণ্ড সঞ্জয বলেন হায়েব বিচারে শিাপুত্র সম্পক নেই। বাজ্য-শাসনেব বিধানে বাজসম্পাওব সাতসানল ববাব একটিনাএ শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। তাই দিতে হবে আমাকে।

আর্তবর্ধে পুষ্ত্রী বলেন কা সেহ বাজদহ

সঞ্জয বলেন তুমি অস্ত্রপুনে যাও বানী, এ তুমি সস্ত্র কবতে পাববে না। আমি ক্ষত্রিয় নৃপতি, আমাকে সব সস্ত্র কবতে হয়। যে ছর্ভেবকে এতদিন প্রতীবোধ কবে এসেছি সর্বপ্রকারে, সেই দণ্ডাদেশই দিতে হবে আমাকে।

শিহবিত মন্ত্রী বলেন— মহাবাজ ?

হাঁ, তাই পুত্রকে নিবাসন দণ্ড দিলাম।

সে দণ্ডাদেশ শুনে মুছিতা হয়ে পড়েন বিষ্ণু ২৭-৫০ নী বিষ্ণু উপবানী স্বয নিবিকাব। দণ্ডাদেশ শুনে তিনি বলেন—বাজাদেশ শিবাবার্থ, তবে, আমি একটি দিনেব জন্ম সময় চাইছি মহাবাজ! আগামীকাল আমি একস্ত্রে বনবাসে যাব।

উদগত অশ্রু গোপন করে সঞ্জয বলেন—কেন ? একদিন সময় চাইছ কেন ?

-নির্বাসনে যাত্রা কবার পূর্বে আমার যা-কিছু সম্পত্তি আমি প্রজাবর্গকে দান কবে যেতে চাই। আপনি শতদান উৎসবের আয়োজন করেন, পিতা।

শুনে অভিভূত হয়ে গেল প্রজাবর্গ, বিস্তৃত রাজ্যদেশ অমোঘ। সমস্ত দিন ধবে যুববাজ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মুক্তহস্তে দান কবে দিলেন। দিবসান্তে বিজুহস্তে ফিবে এলেন রাজপ্রাসাদে। প্রণাম কবলেন পিতাকে, জননীও পদপ্রান্তে জানান প্রণতি, রাজ-পুরীর প্রতিটি কর্মচারী, প্রতিটি ভূত্বয় কাছে বিদায় গ্রহণ কবলেন। অবশেষে এসে উপনীত হলেন নিজ নিকেতনে মাত্রীও কাছে বিদায় নিতে। রাজ্যদেশেও কথা এখনও কেউ তাঁকে জ্ঞাপন কবতে সাহসী হয় নি তখন,

সর্ব স্বহৃদে। মদ্রহুতাপে নাপাদি  
বাগানে বিখ্যাত, বাত বিজু অ.  
বন ধাতু, স্বর্ণ মুদ্রা পিতা পিতা  
দিয়াছি তোমায় প্রিয়ে তাঁতুক।  
পাশ্চাত্য গ্রামে তুমি সমস্ত গমন  
ববহ স্থানে বোনা নবগদ স্ত্রী  
স্বাধীনতায় মাউ নলন তন  
'কোমায় গ্রন প ৩ ববিন স্থাপন। ১৬৩ ৬৬ ॥

বিশ্বাস্তব তখন প্রভূত্ব কবেন :

শীলন ব্যাও ৩২ ১৭৩ ১  
যিা যা পাহাত যো ১৬ ২ ৩  
দান ভিন্ন অস্ত্র কোন স্থানে প ১৭৭  
নিরাপদে স্ত্রীে . 'নদ্র মন  
পুত্রগণে বব সেনা ৩৩ বা ৩৬  
ইহবেও স্বতঃপূর্ব, পবিচয়া তাঁ  
কবিও খতনে, মাজি, বায়ে বাকে ধনে।

এ রাজ্য ইহিত আমি কবিলে প্রহ্নন  
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয় কোন জন  
চান তব ভর্তা হতে, ভর্তা মনোমত্ত  
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার  
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাক ৩৬ ॥ ৬৭ ৬৮ ॥

স্তম্ভিতা মাত্রী বলেন—আপনি এ-সব কী বলছেন প্রভু? কী হয়েছে?

(১) দেওয়ান সম্পাদিত 'জাতকথা'না ন মক ৭ল পালিও বায় লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহ যোগ্য মহাশয় কর্তৃক আকারিত ও মুদ্রিত।

(২) পরাশর 'হিতায় ন ৭ মতে পত্রিকায় প্রাক স্বর্ভব।



আর সত্যগোপনের প্রচেষ্টা নিরর্থক বুঝে বিশ্বাস্তর বলেন—সকলেব কাছেই আমি বিদায় নিয়ে এসেছি, প্রিয়তম! রাত্রি প্রভাতে আমি রাজাদেশে নির্বাসনে চলে যাব।<sup>১</sup> তুমি প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, শুচিস্মিতে!

মাত্রী এতকণে আশ্বস্ত হলেন, অতি দুঃখেও তাঁর গুণ্ডপ্রান্তে ফুটে ওঠে বিচিহ্ন এক হাস্যরেখা, বলেন—আমি তো দানবীর নই যুবরাজ, যে প্রার্থনামাত্রই প্রার্থীকে বিদায় 'দান' করব।

বাজপুত্র ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন--কিন্তু বিচ্ছেদ যখন অমোঘ, তখন প্রসন্নমনে বিদায় দেওয়াই তো বিধেয় ?

মাত্রী বলেন--না! আমি আপনাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবতে পাবব না। আপনাব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ককন যুববাজ! আপান সত্যবদ্ধ, বলেছিলেন আমাকে হ্যাপ বলে বনে চলে যাবেন না।

নিরন্তর রাজপুত্র বলেন—তুমি ভুল কবছ মাত্রী! আমি তো স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নিয়ে বনে হেতে চাইছি না। এ যে রাজদণ্ড!

যুক্তকবে মাত্রী বলেন—সত্যবন্ধা কবেও সে দণ্ডদেশ পালন কবতে পাবেন আপনি, যুববাজ! সেই দণ্ডেব ভাগ আমাকেও গ্রহণ কসনাব অধিকাব প্রদান ককন। স্বামীর সমস্ত কিছুবই অর্পাশ স্বীকৃত! আমিও আপনার সঙ্গ নিবাসনে যাব।

—কিন্তু আবশ্যিক জীবন যে ছবিসহ দুঃখেব!

—না! আপনার বিবর্ত-যজ্ঞনা ভোগেব অপেক্ষা নয।<sup>২</sup>

—কিন্তু আমাদের নাগালক সপ্তান ছটি? তোমাব ছটি নয়নের মণি? জালী এবং কৃষ্ণার্জুন?

—তাবাও অনুগমন কববে তাদের জননীকে।

—ওরা যে দুঃখপোষ্য শিশু, মাত্রী!

চন্দন দীপশিখাব মত যুক্তকবে উঠে দাঁড়ান মাত্রী, স্থির সংযতকণে বলেন—সত্যনিয় যুববাজ, আপনাব পূর্বাচনে আমি বখনও প্রতিবন্ধক হই নি। আমাকেও স্বধর্ম অন্তসরণে আপনি বাশা দেবেন না, এই আমাব একান্ত মিনতি।

—কী তোমাব সেই ধর্ম, মাত্রী?

—স্বামীপুত্রের সেবা।

সত্যশ্রয়ী বিশ্বাস্তর আন বাধা দেন নি।

পরদিন অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত রাজবথে যুববাজ সম্বীক ও সপুত্রকন্যা নিষ্ক্রান্ত হলেন বাজপুত্রী থেকে। অর্গলবদ্ধগৃহে মৃত্যুতুবা পৃষতী জানতেও পাবলেন না, ছাবপ্রান্তে প্রণাম

(১) ভাঙকের কবি এখানে মাত্রীর মুখে হিমা-যেব অতির্দীর্ঘ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বন্ধ যেন 'সার্গ' আবঙ্কুহ' বলে দীর্ঘ পদের বর্ণনা দিয়েছিল 'সম্প্রদায় মে হৃদয়' কবে, সাক্ষীও হেমনি জাতক-কবিকে এখানে হিমালয় বর্ণনার সুযোগ দিয়েছেন।

করে গেল কারা। অল্পতপ্ত প্রজাবৃন্দ সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজপথে। এই মুহূর্তটিতে ওরা ভুলে গেছে, পূর্বদিন ঐরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজদরবারে অভিযোগ এনেছিল ওরাই।

নগরসীমান্তে বাধা পেয়ে বিশ্বাস্তর রথ রক্ষা করেন। চারজন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—শতদানের সংবাদ পেয়ে ওরা দূর দেশ থেকে আসছে। বিশ্বাস্তর সখেদে বলেন—আজ আমি যে নিঃশ্ব ভাই! কি দিতে পারি বল, তোমাদের ?

প্রার্থীদের মুখপাত্র অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—আমাদের চারজনকে আপনার রথের চাবটি অশ্ব দান করুন।

উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বিশ্বাস্তর। ঠিক কথা! এ-কথা তো মনে ছিল না।

অতঃপর পদব্রজে যাত্রা। মহাসমুদ্র বিশ্বাস্তর রাজবধু মাদ্রীকে তখন বলেন :

তুমি কোলে লও রুম্বাজিনারে এখন ;  
ছোট সেই লঘুভার ; জানী বড় ভার,  
সেহেতু ভার আমি লইলাম ভার ॥ ২১৮ ॥

পুত্রকন্যাকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু হল সেই দুজন ভাগ্যহতের, রাজবৈভবের প্রাচুর্যের মধ্যে অতিষষ্ঠে এতকাল যঁারা বাস করে এসেছেন।

অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশে বন্ধ পর্বত! এখানেই বনবাসে কালাতিপাত করবেন মহাসমুদ্র। অবাঞ্ছিতভাবে মাদ্রী দেখতে থাকেন সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে। স্থাপদ-সঙ্কুল এ গহন অরণ্যে কেমন করে মানুষ করে তুলবেন তাঁর সেই নয়নের ছুটি মণিকে ? কেমন করে বাচিয়ে রাখবেন ধর্মনিষ্ঠ স্বামীকে ? তবু দুর্ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার করেন না মাদ্রী। বোধিসত্ত্ব দিব্যরাত্রি ধ্যানমগ্ন, আর অতন্দ্র সাধনায়, ছুটি শিশুর সাহায্যে সেই গভীর অরণ্যে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করেন রাজবধু মাদ্রী। বিশ্বাস্তর উদাসীন, নিষ্পৃহ—আহার্য তাঁর হাতে তুলে দিলেও তিনি আহার করতে ভুলে যান, দান করে দেন খাও। অবশ্য, এ গহন অরণ্যে প্রাণীক ভীড় নেই, তবু আহার্য তো সংগ্রহ করে আনতে হবে। বিশ্বাস্তর উপাসনা করেন, পান করেন, শিশু-সন্তান ছুটি খেলা করে বন-কুরঙ্গের সঙ্গে, আর নিয়লস পরিশ্রমে রাজবধু মাদ্রী উদয়াস্ত আহার্য সংগ্রহ করেন। পার্বত্য শ্রোতস্বিনী থেকে নিয়ে আসেন পানীয় জল, ফলবান বৃক্ষ থেকে আহার্য করে আনেন বনজ ফল। দিবসান্তে কুটির প্রত্যাবর্তন করে দেখেন ধ্যানমগ্ন বিশ্বাস্তর বসে আছেন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত, আব শিশু-সন্তান ছুটি খেলা করছে পর্ণকুটিরের অদূরে। মাদ্রীর পদধ্বজে খেলা ফেলে ছুটে আসে জালী ও রুম্বাজিন। সমস্ত দিন অদর্শনের পরে জননীর সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওরা। আর কোন বাধা মানে না, আর কোন কাজ করতে দেয় না মাদ্রীকে। মাদ্রীও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কথা ভুলে যান—এই অস্তমূর্ধ-উদ্ভাসিত সান্ধ্য মুহূর্তটিই তাঁর দিব্যরাত্রির নিয়লস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। শিশু-সন্তান ছুটিকে বুকে টেনে নেন, হাত বুলিয়ে দেন মাথায়, গল্প বলেন।

ক্রমে গভীর হয়ে আসে আরণ্যক রাত্রি। নিশাচর প্রাণীর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া

যায় তখন। মাজী আহাৰ্য বণ্টন করেন। স্বামীপুত্রের আহাৰ্য্যে অবশিষ্ট কিছু থাকলে মুখে দেন।

কিন্তু নির্ভুর বিধাতা মল্লভাগিনী রাজবধুর ললাটে এটুকু মুখও লেখেন নি। একদিন দিবসাস্তে বনাস্তুর থেকে আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে মাজী দেখেন কুটিরের সম্মুখে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন বিশ্বাস্তুর, তাঁর চরণপ্রান্তে হরিণ-শিশু দুটি সাথীর অভাবে নিত্রামগ্ন।

চিন্তাঘটিত হালেন মাজী, কুটিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্বেষণ করতে থাকেন; কিন্তু শিশু দুটির কলকণ্ঠ শুনতে পেলেন না কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি শিশুশূলভ কোন খেলার ছল। জননীকে চমকিত করে দেবার উদ্দেশ্যে ওরা বুঝি কোন পত্রাত্মবালে লুকিয়ে আছে। উৎকলিতা মাজীর মনের কথা স্তম্ভরভাবে বর্ণনা করেছেন জাতককার :

পূলাবালি সব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা  
 দুটিয়া আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।  
 আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই ?  
 অরণ্য হইতে এসে আশিত্যাম ফিরি  
 দূর হতে দেখি মোরে ছুটে আসি স্বরা  
 ধরিত জড়ায়ে।...তবে, আজ কোথা তারা ?  
 হৃদয়ে পূর্ণ হইয়াছে স্তন্যময় মোর ;  
 বিপত্তি শঙ্কায় মোর বুক ফাটি যায়  
 জালী, কুম্ভা, অভাগীর নয়নের ধন,  
 দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ? ॥ ৫৫২ ॥

বারংবার নাম পরে ডাকার পরেও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিতা হলেন মাজী। সহসা তাঁর লক্ষ্য হয় নিত্রিত হরিণ-শিশুর মুদ্রিত চক্ষু-প্রান্তে অশ্রুগণ্ড। যা কখনও কবেন নি তাঁই করে নসেন মাজী; অকালে ধ্যানভঙ্গ করলেন সুবরাজের বগেন ওরা কোথায় ?

শাস্ত্র গনিচলিত কণ্ঠে বিশ্বাস্তুর বলেন - ওবা তো নেই !

—নেই ! সে কি ! কোথায় তাবা ?

—আজ একজন ব্রাহ্মণ এসেছিল ! ডিম্ফা চাইল সে। আমি তাকে বললাম, আমি নিঃস্ব বনবাসী তপস্বী, কি দিতে পারি তোমাকে ? ব্রাহ্মণ তখন জালী আর কুম্ভাজিনিকে নির্দেশ করে বললে এই দুটি শিশুকে আপনি দান করে দিন, ক্রীতদাসরূপে ওদের বিক্রি করলে—

চীৎকার করে ওঠেন মাজী—স্বাস্ত হন যুবরাজ ! আর বলবেন না। বাকিটুকু আমাদের অন্নমান করে নিতে দিন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলেন মাজী, সে নির্ভুর কাহিনীর বর্ণনা পাঠ করা যায় না :

জালী ও কুম্বাজিনার  
দিলেন তাহাই তিনি  
হৃত্ত্বতা উভয়কে  
হেঁৰি এ অদ্ভুত ত্যাগ

হাত ধরি বিশ্বাস্তব  
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা  
ব্রাহ্মণেবে দান যেনে  
শিহরিঙ্গ সৰ্বশোক

ব্রাহ্মণেবে করিলেন দান  
ছিল তার যে ছুটি সন্তান।  
ক বশেন হস্তমানে তিনি,  
দানতেজ্ঞ কাঁপিল মেদিনী ॥ ৪৬৫ ॥

নিষ্কর ব্রাহ্মণ আনিল তখন  
লতার আঘাতে দুজনে তাড়ায়  
বাঁকি রজ্জুপাশে দণ্ডের আঘাতে  
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে

দাঁত দিয়া লতা করিয়া ছেদন।  
কান্দিল তাহাতে শিশু দুটি হায়।  
শিশু ছাটি সেই মাষ তাড়াইয়া  
লাগিলা দেখিতে বাঙ্গা চাড়াচয়া ॥ ৪৬৮

ঈশানচন্দ্র ঘোষ মশাই লিখেছেন .

অতঃপর কুম্বাব , ও কুম্বাবর দেহে যে যে স্থানে জাবাত লাগিল, সেহ সেই স্থানেই চৰ্ঘ ছিঁড়িয় গেল ও বক্ত বাহিব হইল। প্রসাবে। তাড়নায় শ' ' ভস পাইষ দিঠাপিঠি হইব দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর এক বিষয় স্থান দফা হইবা বা'। ব্রাহ্মণের পদস্থলন হইল এন সে আছাড় খাইয়া পড়িল। অমনি শিশু দুইটিব বোমল হস্ত হস্তে স বঠি- লক্ষপাতা খুঁশিয়া গেল তাহারা কান্দিতে কান্দিতে সেই মহাসমুদ্র নিকট উপস্থিত হইল :

ব্রাহ্মণেব হস্ত হতে মুক্তিলাভ করি  
শিশু দুটি যিরি গিষা মাশনোক্তে হা',  
পিতান নিকটে উল মুখপানে চা।।  
অথথপত্রব মত কাঁপতে কঁ পিতো  
পিতাব চন্দ্র তা' বপিল বল্লন।  
প্রণমি কহিল আলি এতক বচন :  
“মা নাই আশ্রমে এবে, তবু বাবা তুমি  
দিতেছ এ ব্রাহ্মণেবে আমা দুইজনে।  
ক্ষণক অপেক্ষা কর, মা আসুন ফি'ব  
দেখি শাকে একবাব জনমেব মত।  
ক ব শোন ব্রাহ্মণে , জ . পব দান।

এ মহানিষ্ঠব ধন পদাসু ব্রাহ্মণ -  
বান্দিয়া প্রহ্লাদ বশে সন্তান তোমাব,  
বান্দি -সে মাগ বেক শাকে যেমন  
•পাপি মধ্যস্থভাবে তুমি উদাসীন।  
রুধা তো নিতান্ত শিশু দুঃখ সে জানে না,  
যুথপ্রহ্লা হবিণ পৌত্তিক ধেকপ  
স্তম্ভতবে কান্দে, বাবা রুধাও তেমনি  
কান্দিতেছে, মবিবে সে না পাইলে মাকে।  
তাবে শুধু থাকিবাবে দাও অহুমতি। ৪৭০—৪৭২ ॥

তাই ভাবছি, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী : ক্লান্ত হন যুবরাজ ! আর বলবেন না, বাকিটুকু আমাকে অনুমান করে নিতে দিন !

ধূলায় লুটিয়ে পড়েন মহারাজ সঞ্জয়ের আদরিণী পুত্রবধু ।

সাস্তুনা দেবার জন্ত এগিয়ে আসেন বিশ্বাস্তর । ভূমিশয়া থেকে মন্দভাগিনীকে উত্তোলন করবার জন্ত বাড়িয়ে দেন ছুটি হাত । মাদ্রী বিহ্ব্যৎপৃষ্ঠার মত উঠে বসেন, বলেন : আমাকে সাস্তুনা দেবার কোন চেষ্টা করবেন না যুবরাজ ! স্পর্শ করবেন না আমাকে । আমার সাস্তুনা আমি নিজেই খুঁজে নেব ।



চিত্র--৬৯

শিবি-জাতক—মহারাজের চক্ষু উৎপাটনের পরের দৃশ্য

অবস্থান—১৭১৫

মহাস্ব স্বখেদে বলেন : আজ তোমার বড় দুঃখের দিন, মাদ্রী !

বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মাদ্রীর বিশীর্ণ ওষ্ঠে । বলেন— কিন্তু আজই যে আপনার বড় সুখের দিন, প্রভু ! আজই যে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়েছে !

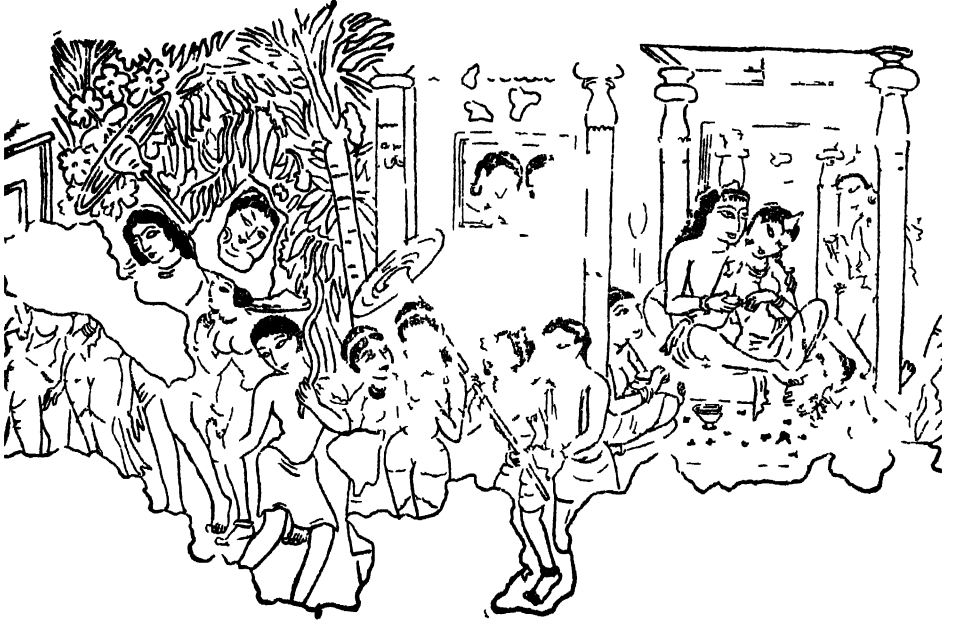
বিস্মিত বিশ্বাস্তর বলেন : কী সেই উচ্চাভিলাষ, মাদ্রী ?

—মহান্নভবতায় আপনার পিতামহকে অতিক্রম করা । মহারাজ শিবি শুধু নিজের ছুটি চক্ষুই দান করেছিলেন । আপনি তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন । দানের উদ্দানায়

ইতিপূৰ্বেই অন্ধ হয়েছিলেন আপনি, আজ তত্পৰি উৎপাটন কৰেছেন আপনার ধৰ্মপত্নীৰ ছুটি নয়নেৰ মণি।<sup>২</sup>

কাহিনী-চিত্ৰ এব পৰ এৰিগৈ গেছে জালী ও কৃষ্ণাজিনেৰ পথৰেখা ধৰে। এবাব সেই কাহিনী-চিত্ৰৰ প্ৰসঙ্গে আসা যাক :

কিন্তু কাহিনী-চিত্ৰেৰ ক্ষে.এ.৬ বিশ্বাস্তবেৰ পিতামহেৰ চিত্ৰটিৰ কথাই প্ৰথমে বলে নিত হয়। এই চিত্ৰটিতে ( ১৭১৫ ) দেখতে পাঁচ্ছি ব্ৰাহ্মণকে চক্ষু দান কৰাৰ পৰে শিবিবাজাৰ অবস্থা। মহাপাজা বসে আছেন একটি চত্ৰাতপেৰ নীচে। অসীম যত্নগায় তিনি বাম হাতে চেপে ধাৰেছেন নিজেৰ চোখ, কিন্তু তাঁৰ উপবেশনেৰ ভিত্তিতে ব্ৰাহ্মণচিত মহাধৰ্ম অভাব নেই। মহাবাজেৰ সন্নিবটে লয়াছেন বানী, একজন সত্ৰীদি এবং আৰু একজন পুৰকাৰিনী। মন্ত্ৰীৰ হস্তেৰ মুদাটি লক্ষণীয়। চিত্ৰটি বাস্তব লুপ্তপায়, ওৰ অল্পসংখ্যক



চিত্ৰ ৭০ : বিশ্বাস্তবেৰ বিদায় দৃশ্য

অবস্থান- ১৭১৩ ও ১৭১২

বেখাৰ ভগ্নাংশ থেকেই চেনা যায় শিল্পীৰ দৰদ-ভবা তুলিকে। এই অনবদ্য চিত্ৰটি শিল্পী মিস্ ডব্ৰোথি লাৰ্চাৰেৰ অনুসৰণে এখানে সন্মোজিত কৰলাম ( চিত্ৰ ৬৯ )।

বিশ্বাস্ত্ৰ জাতকেৰ গুৰু বাহিবেৰ অলিন্দেৰ বামপাৰ্শ্ব- সেখানে দেখাছি ( চিত্ৰ-৭০ )

(১) শাস্ত্ৰ অৰ্থাৎ বুদ্ধ দৰ এহ জাৱ-কাহিনে বাণী কৰাৰ পৰে ব্ৰাহ্মণক তাকে প্ৰায় কৰেন-ভগবন এই কাহিনে ০০ আপনি তিনেৰ বোম্বিন্ধ বিশ্বাস্ত্ৰ অঙ্ক সকলে কে? বুদ্ধদেব উত্তরে সেই 'সমবধান' এইভাবে বুঝিৰে যিহেছিলেন : বেবদন্ত সেজয়ে ছিল বুদ্ধক, রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন রাজা সঞ্জয় মহামাৰা ছিলেন পুৰতী, রাজল ছিলেন জালী, অশ্ৰপাৰিকা উৎপলবৰ্ণা ছিলেন কৃষ্ণাজিন এবং রাজল-ময়নী ছিলেন মাতী।

একটি মণ্ডপে মুছাতুবা মাদ্রীকে যুববাজ সাজুনা দিচ্ছেন। হুজনে বসেছেন একটি পালকে। একটি ভৃত্য ভূঙ্গাব বাচ্চিয়ে খবেছে যুববাজেব দিকে। যুববাজেব হাতে একটি চষক, তাতে কোন ঔষধ অথবা সুবা। বর্তমানে যুববাজেব আলেখাটি বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু মাদ্রীব মুখমোর্ন্দর্ঘ প্রায় অটুটই আছে। তাবপব দেখছি বিশ্বাস্তব ও মাদ্রী বাজপ্রাসাদ ত্যাগ কবে যাচ্ছেন। একজন ছত্রধাবিণী মাদ্রীব মাথাব উপব ছএ ববে আছে। শওদান উৎসবে একজন ভিক্কুক এসেছে--তার হাতে একটি বঙ্কিম যষ্টি। পিছনেব গবাকে দেখতে পাচ্ছি মহাবাজ সঞ্জয ও বানী পৃষতীকে। পুত্র ও পুত্রবধব বিদায়-যাত্রা দেখেছেন তাঁব।

বিহাবেব ভিতবে ( ১৭১২ এবং ১৭১৬-ক ) দেখছি শতদানেব দৃশ্য। রাজপুত্র একজন প্রাণীকে নিজ ওববাবি দান কবেছেন।...উপবে কলিঙ্গ দেশ থেকে ছুভিক্ক-পীড়িত প্রজাবন্দ এসেছে যুববাজেব কাছে ( ১৭১৬-খ )। তাদেব চুল-বাধাব বীতি উৎকলদেশীয়।

নীচে দেখছি, নিবাসন-দণ্ড পাওযাব পব যুববাজ এসেছেন জননীব মহলে ( ১৭১৬-গ )। নতজান্ন হয়ে বসেছেন তাঁব পদপ্রান্তে। পৃষতীব মুখে কাকণ্য ও বিষাদেব অপূব স মিশ্রণ। পাশেব প্যানেলে মহাবাজাব কাছে যুববাজ বিদায় নিতে এসেছেন। মহাবাজাব দক্ষিণহস্তটি অক্ষত নেই--কিন্তু তাব সিংহাসনে উপবিষ্ট ভঙ্কিটিতে রাজোচিত মর্যাদাব বাঞ্ছনা। দৈতিক ভঙ্কিতে তিনি কঠোব স্মায়াদীশ, অথচ তাঁব ছুটি নযনে বিষাদেব মুর্ছনা। একই আলেখে ছুটি বিপণীত ভাবেব বাঞ্ছনায় এ চিত্রটি অনবন্ত।

পামপ্রান্তেব অব-হস্তে ( পিলাস্টাবে ) বাজবন-মাদ্রীব কাছে এসেছেন বিশ্বাস্তব। এখানে একটি শিল্প-চাতুয লক্ষণীয়। মাদ্রী ও বিশ্বাস্তব একই সমামণ্ডপে আছেন, কিন্তু ঔদেব আলেখা ছুটি প্রাচীবেব একই সমতলে থাকে নয। পিলাস্টাবেব খাঁজে মাদ্রী ও প্রাচীবেব বিশ্বাস্তব যেন মুখেমুখি, অথচ হুজনেব মাঝখানে আসন্ন বিচ্ছেদেব প্রতীক এই সমকোণটি ( ১৭১৬-ঘ )।

এব পাশে অথবা নীচে সম্ভবতঃ শতদানেব একটি দৃশ্য ছিল, সেটি নষ্ট হয়ে গেছে পবেব দৃশ্যে দেখছি, বথাকাট বাজপুত্র চলছেন সম্মুখ বাজপণ্ড দিযে পিছনেব আসনে ছুটি শিশুসন্তান বথ চলছে বাজাবেব মাঝখানে দিযে ( ১৭১৬-ঙ )। পাশাপাশি তিনটি দোকান। ছঙ্ক-বিক্রেতা তাব পাত্রটি বেখে বিদায়ী যুববাজেবে যুক্তকবে নমস্কাব করছে। পবেব দোকানটিতে একজন তেল-বাবসায়ী পাত্র তেল ঢালাছে, তৃতীয় বিপণীতে দোকানদাব দাঁড়িপাল্লায কিছু পণ্যব্যব ওজন করছে। দোকানখাল দ্বিতল-গৃহেব একতলায। উপরে বাতায়নে এব অর্গন্দে পুবকার্মিনীদেব ভীড়। বথেব সম্মুখে চারজন প্রার্থী, তাদেব পোশাক, শিবস্ত্রাণ ও দেহাৰ্কাতি বিভিন্ন। একজন সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয়।

পরেব দৃশ্যে দেখছি, বাজপুত্র সপরিবাবে হুতলে দণ্ডায়মান ( ১৭১৬-চ )। ব্রাহ্মণকে তিনি অশ্ব দান কবেছেন। বাজপুত্রেব হস্তে কমণ্ডলু--সম্ভবতঃ, তিল-গঙ্গোদকে শাস্ত্র-সুশ্রুত দান কবেছেন তিনি। এ দৃশ্যেও চাবজন পথিক। তাদেব কেউ হৃষিক্ত, কেউ অনন্দিত।

উপবি-লিখিত বৃহৎ প্যানেলের নীচে বহু পর্বতে বাজপুত্রের আবণ্যক জীবনের



চিত্র ৭১

জুজুক কতক জালী ৭ কুম্ভাজিনসে পাননা  
অবস্থান—১৭২৬ চ ও ১৭২৬ চ ৭২ এন ১০ - ৭

৭১)। এই তিনখানি চিত্র যেন তিনটি বর্ণনায় বর্ণিত পর্বতের বসন্ত তমস্রাণ্ড পর্ব

তিনটি অনবগু চিত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ  
চিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।  
অতি আশ্চর্য্যভাবে দেখা যায়। প্রথম  
চিত্রে দিন, মাদ্রী গবণো ফল আহরণ  
করছেন। মাদ্রীকে পাশাপাশি কয়েকবার  
ধাঁকা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পীর বক্তব্য  
বাজববব এ কাজটি হয়ে পড়েছিল  
নির্ভর্যন-পদ্ধতিব অগুর্ভুক্ত। দ্বিতীয় চিত্রে  
জুজুক নামে এক জন লোভী নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ  
পনবুটিনব পাবপ্রাপ্তে এসেছে জালী ৩  
৭২)। জিনকে ভিন্মা চাওঁ (চিত্র ৭২)  
৭৩)। চিত্রে দেখাছ, সেই নিদানব দুঃখময়  
সন্দর্ভাবলে ১৩ শতা কটিবব সম্মুখে  
ভামতলে বাসছেন মাদ্রী। আব প্রস্তুবাসনে  
এব সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বাস্তব (চিত্র



চিত্র ৭২

বিশ্বাস্তব মাদ্রীকে মহাদানের কথা জানাচ্ছেন  
অবস্থান—১৭২৬-৮ ৭ ১৭ ২৬ চ এব মধ্যবর্তী অংশ



কবেছেন শিল্পী। নিষ্পাপ দেবশিশু'র অবাক্ চাহনিতে, মমাহতা জননী'র অজ্ঞদাহের ভাব-  
ব্যঞ্জনা'য়, বিশ্বাস্তবেব অনাসক্তিতে চিত্রগুলি ছিল অনবচ্ছ। বাজবধূ'র প্রথম চিত্রের সঙ্গে  
তুলনা কবলে দেখা যায়, বনবাসিনী মালী শীর্ণা, সম্পূর্ণ নিবাভবণা, যেন বিষাদেব প্রতিমা।  
অপবপক্ষে, জুজুককে বয়েকটি খেখা'র টানে শিল্পী কবেছেন নিষ্ঠুর, লোভী আ'র কুচক্রী।  
পরম আপসোসেব কথা, এ চিত্রগুলি আ'র অত্মস্থায় গেলে দেখতে পাবেন না আপনি।  
এ শতাব্দী'র প্রাবল্যে মিস 'দুবে'র্থা ল'র্চা'র এ'ই চিত্রগুলিকে অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন,  
তা'র 'দুচ বইয়েব' গ্রন্থসংগে বর্তমান লেখক কিছু বাথ পয়াস কবেছেন মাত্র।

কাবো-উপাধিক্তা মা'শী'র 'ত্যাগ কবে' 'এব প'র চিত্রের মিছিল এগিয়ে চলেছে  
জুজুক-এব পদাঙ্ক অনুসরণ কবে। 'প্রথম বাত্রি গভীর হয়ে আসে। স্বাপদ-ভীত নিষ্ঠুর  
জুজুক স্বয়ং বৃদ্ধে আবেতন ক'র, অথচ গ্রন্থায় শিশুটিকে ফেলে বাখে ভয়স্ব'ব অরণো,  
ভূতলেই।...প্রা'ন' ভয়ে ভী'ন দুটি শিশু অরণো বোদন ক'রছে দেবরাজ ইন্দ্র কুপাপববশ  
হয়ে বিশ্বাস্তবেব কপ ধ'বে আবিভূ'ক্ত হ'য়ছেন 'এদেব সম্মুখে পিতাকে দেখতে পেয়ে  
আস্থ'ত হয় 'শিশু দুটি নিশ্চিন্তে ও'র। দু'মিষে পড়ে পিতৃরূপী ইন্দ্রের ক্রোড়ে।  
নিশাবসানে বৃক্ষচূড় থেকে অবগোহণ ক'বে জুজুক শিশুদের কাছে শোনে, রা'ত্রে  
তাদের পিতা এসেছিলেন। ভয় হয় 'ল'ভী ব্রাহ্মণব--কি জানি যদি পিতৃস্নেহে  
সে পুত্রকল্যা'ন ইচ্ছ'য় নি'ও চায়? অর্থা'ন ব'দ পবহে'ব এলাকা পাব হয়ে জুজুক  
অন্তর চলে যায় 'এ'দেব ম'লা প'লে 'সে শিশু দুটিকে বিক্রী কবে দিতে চায়, কিন্তু  
এতটুকু শিশু'বে কে 'ন'তদ'স ক'র'ত চা'য়ে'ব? পথে পথে ফিবেছে ব্রাহ্মণ দেশ-দেশান্তবে,  
তা'র সঙ্গে যিবেছে দুটি স'ত্রাণ্য ম'জাব স'ম্মান। 'ব'ল'গ অবস্থা, উজ্জয়িনী, কিন্তু জুজুক-  
'বে প'ত্রা'শা অনুযায়ী মল্য দিতে কেউই স্বী'কৃত হয় না। চিত্র-নাটিকে'র শেষ অঙ্কে  
দেখছি, 'এব মহাজনপদে প'রেশ'ক 'তো'র আ'দা'বে নগবপাল 'ব'কে গা'ঢ়'ক'ছে, বলছে--এই  
দেবশিশু দুটি 'ক'ত্রো'ন'ব স'ম্মান' 'এব 'স'থ'া 'এ'ত 'ক'র' ক'বে'ও 'এ'দেব?'

সংস্কৃত ভাষায় 'ব্রাহ্মণ' 'ই'তি 'হ' 'এ'ত 'ক'র' 'ক'বে'পা' 'ক'র' না নগরপাল  
'এ'ত 'ক'র' 'স' 'মি'ত' 'ব'ল' 'এ'ত 'ক'র' 'ক'বে' 'এ'ত 'ক'র' 'ক'বে' 'এ'ত 'ক'র' 'ক'বে'  
পাল ব্রাহ্মণ'ক 'প্রা'ক্টি'ব ক'বে'ছে 'মহা'শ'ক্কে'র স'ম্মুখে। 'স'ম্মু'খ 'এ'ক' 'প্র'বণ ক'বে 'মহা'বাজ  
জুজুককে বলছেন, 'স'ত্রা' ক'র' 'বল', 'ভূ'ন' চূ'নি ক'র' 'নি'।'

দী'ত জুজুক বৃ'ক্ক'ক'বে 'শ'প' 'ক'র'।

ক' 'ক' 'ন' 'ব'বে'ছে 'তো'ন' 'ক'বে'।

ক' 'ক' 'ন' 'ব'বে'ছে 'তো'ন' 'ক'বে'।

ব' 'ক' 'ন' 'ব'বে'ছে 'তো'ন' 'ক'বে'।

এ'ই 'ক' 'ন' 'ব'বে'ছে 'তো'ন' 'ক'বে'। ৭২৪ ॥'

(১) মিস লার্চারের স্কেচ পেটি হার্ড'র 'ম' 'ক'র্ক'ক' 'স'ম্মু'খ' 'এব' 'উ'ত্ত'রা 'সো'স'াই'ট' 'ব'র্ক'ক' 'প্র'কাশ'িত 'দু'স্রা'ণ্য 'এ'ক'টি'তে  
প্রাণ'ব'।

: নাম জানি না, তবে সে লোকটি এই ছুটি সন্তানের পিতা।

শুনে সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করে ওঠে! একবাক্যে সকলে বলে,—এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কাহিনী। পিতা হয়ে সন্তানকে কেউ ক্রীতদাসরূপে দান কবতে পারে ?

কিন্তু মহাবাজেব কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করে না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন। সত্য বটে, পিতা হয়ে কেউ সন্তানকে দান করে না, কিন্তু এ সমাগরা পৃথিবীতে কখনও কখনও ব্যতিক্রমই যে নিয়মেব পবিচাষক। এ বিচিত্র ছুনিয়ায় অন্ততঃ একটি মাহুষেব কথা মহাবাজ মর্মে মর্মে জানেন, যাব পক্ষে এ অসম্ভবও সম্ভব।

অমাত্যবর্গ একবাক্যে বলে—মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক নাক্ষণিকে শাস্তি দিন মহাবাজ।

সে-কথায় কর্ণপাত না করে মহাবাজ নগবপালকে বলেন—সেই শিশু ছুটিকে সভায় নিয়ে এস প্রথমে। তাঁদেব কথা না শুনে আমি তো একে শাস্তি দিতে পারি না।

বজাদেশে বুলিমলিন ছুটি দেবশিশু প্রবেশ করে মণি-দীপিত সভাকক্ষে। দর্শনমাত্র সিংহাসন ছুড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন সতানিষ্ঠ মহাবাজ সঞ্জয় :

তপ্ত কাঞ্চনের গায়	মুখখানি শোভা পায়
কে ঐ আশিচ্ছ হেথা ? দেহেব ববণ	
স্বর্ণ নিকসমোজ্জল	উক্কাখুথবং ঠাঁপ
আন কি গোগমবা কেহ ও বার নন্দন ?	
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব শোভা	উভয়বই মনোলোভ
উভয়েবই এক রূপ আকারে প্রকাবে,	
একটি জালীব মত	অপরটি কৃষ্ণ যেন
এল কি বাছাবা সিনে এতদিন পবে ? ॥ ৬৫০-৬৫১ ॥	

অন্তঃপুবে থেকে ছুটে আসেন মহাবানী। এ যে তাঁদেবই হাবানো মণিক। শিশু ছুটিকে বৃকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রুতে ভেসে যান মহাবাজাধিবাজ সঞ্জয় আর মহাবানী পুষতী ( ১৭১৬-৯ )।

চিত্রেব পবে চিত্র একে সবশেষে গ্রন্থ অনবচ্ছিন্ন মিলনদৃশ্যে জাতক কাহিনীকে শাস্বত করে বেখে গেছেন অজস্রা-শিল্পী এই সম্পদশ গুণায়। দেখতি ( চিত্র ৭৩ ), মহাবাজ সঞ্জয় বসে আছেন সিংহাসনে তার দক্ষিণতঃ একটি প্রস্তুটিত পুষ্প। তার পাশে সিংহাসনেব উপাধানেব কাণ্ঠে কুম্বাজিন। ৬-পাশে পুষতী, তার বামে ( চিত্র- ৭৩-এব বাহিবে ) জালী। বাজাদেশে বনাগাব-বক্ষক জজুক-এব প্রেসাবিত অঞ্চলে স্বর্ণকলস উজ্জাড করে দিচ্ছে। গায়নিষ্ঠ মহাবাজ স্বর্ণমূলো ক্রয় কবছেন নিজ পৌত্র-পৌত্রীক।

পববতী চিত্র দেখছি, মহাবাজেব আদেশে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হচ্ছে যুবরাজ বিশ্বাস্তব এবং মাজীকে। ইতিমধ্যে নির্বাসনেব মেবাদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদেব। শেষ অঙ্কেব শেষ দৃশ্যে যুববাজেব অভিষেক।

জাতকের অধিকাংশ চিত্র-কাহিনীই বিয়োগাত্মক। মাতৃপোষক-জাতক, চম্পেয়া-জাতক প্রভৃতি যে কয়টি মিলনাত্মক কাহিনী আছে, সে কয়টি তাই বিশেষভাবে ভালো লাগে। সে হিসাবে বিশ্বাস্তর-জাতকেও কাহিনী শেষে দর্শক স্বস্থির একটি নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পান।



চিত্র ৭৩

বামে নীচে- নগবপাল জুজুক-এর পথবোধ করোছে। দক্ষিণে উপরে রাজসভায় জুজুক-এর কাছ থেকে স্বর্ণমূল্যে মহাবাজ জালী ও কুম্বাঙ্গিনকে কয় কবছেন।

অবস্থান—১৭২৬ ৬

এ নাটক যদি কখনও মঞ্চস্থ করেন, তবে প্রযোজনাবোধে কিছু যোগ ও বিয়োগ আপনি করতে পারেন। শুধু একটি বিষয়ে অজ্ঞান-শিল্পীর নিদেহ অতিক্রম করতে পাবেন না। সে হচ্ছে ঐ নিষ্ঠুর লোভী জুজুক-এর কপসঙ্ক। ওব ঐ শকুনি-নাসা, ছাগলাথ দাড়ি, ছিন্ন ছত্র আন লুকৃ দৃষ্টি এ নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এমন কোন অভিনেতাকে ঐ ভূমিকাটি কপায়ণের অধিকার দেবেন না—স্বর্ণমুদ্রাব দর্শনে যাঁব বিরলকেশ মস্তকে সজাকব কাঁটার মত চুলগুলি খাড়া হয়ে না ওঠে।

সপ্তদশ গুহায় আৰু একটা জাতক কাহিনী দেখেই ৭ পৰ্যায় শেষ কৰিব আঁমৰা। এ কাহিনীটি হ'ল জাতক দ্বিতীয় গুহাতই এ কাহিনীটি আঁমৰা আলোচনা কৰেছি। কিন্তু সে গুহায়-আঁকা ছবিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও গা আঁমৰা সংযোজন কৰি নি। এবাৰ এই সপ্তদশ গুহাৰ সামনেৰে বাবাৰ্দাৰ বসন্তাৰে এ চিত্ৰটিকে অনেকটা ভালো অবস্থায় পেয়েছি, আৰু তাই সেটি এখানে সংযোজন কৰে দিলাম (চিত্ৰ- ৭৬)।

চিত্ৰেৰ দক্ষিণদিকে দেখা, বাজ-শিকারী উঠাতক ছটি স্বাক্ষৰ কৰে আনছে তাৰ নাথান উপৰ অত্যাচ্চ পলায়নপৰ হ'লসবলাকা। পশ্চিম দৰে বাজদৰবাৰ। কাশীবাজ ক'ল আছেন সিংহাসনে, ঠিক তাৰ গিড়নেই বানী স্মেমাংদেৰ তাৰ মাথায় বাজছত্ৰ।

মাৰ পাশেই একজন চামবদাৰ্দ্দিনী। বাজৰ সন্মুখে একজন অনাতা এৰা আশে-পাশে আৰু কয়েকজন নবনাৰী। বাজদম্পতিৰ সন্মুখে ছটি আসনে ছটি বাজহ'ল। বাধসহ এৰা তাৰ প্ৰধান সেনাপতি বাজৰ ব'লোৰ হাতৰ মুদাগুলি লক্ষণীয় প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলা যায় যে, তৃত্যশিল্পে যমুনানদীৰ ১৮০ খৃষ্টাব্দৰ বাগনা আছে, অজস্ৰা চিত্ৰেৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰও তমনি শুধুমাৰ হাতৰ পৰা নানাৰ্থকৰ ১৮০ খৃষ্টাব্দৰ ব্যক্তি কৰে।



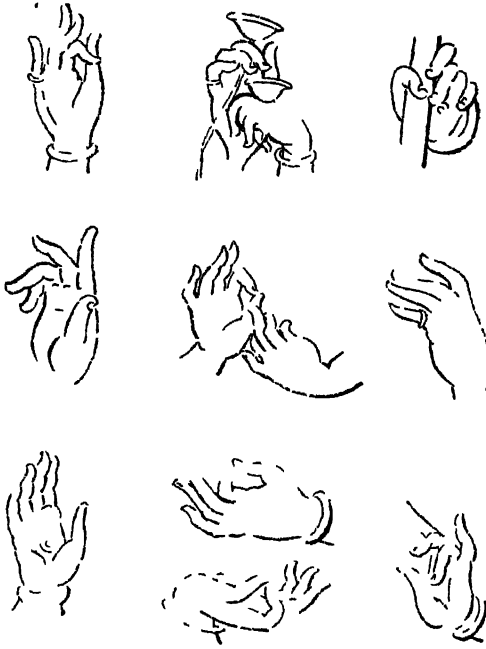
চিত্ৰ ৭৬

হ.স-৫।৩ক

স্বপ্নান - ১৭ - ১৯৫১

তাৰ ভাষা বুঝতে হলে কীৰ্তিমত গবেষণা কৰতে হ'বে। অজস্ৰাৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন গ্ৰিফিথ বলেছিলেন, “অজস্ৰাৰ শিল্পী গাঁক শিল্পেৰ আদৰ্শেৰ সোন খাব ধায়েন না, তাই শবীৰ-সংক্ৰান্ত মাপাজাপেৰ নিখুঁত ৰূপায়ণে তাকে কখনও দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত হতে হয় নি। মানসচক্ষে বাস্তব দৃশ্য বা ৰস্মকে তিনি যে ভাবে প্ৰত্যক্ষ কৰেছেন,

অনায়াসভঙ্গিতে তাই কপায়িত কবেছেন। টানা টানা নয়নযুগলকে আবণ দীর্ঘায়ত কবাব প্রচেষ্টা যেন সব শিল্পীবই একটা গাধাবণ বাতিক, যদিও কোন ইংবাজ দর্শকেব-



চিত্র ৭১

ব্যঞ্জনাঙ্গম হাঃঃঃ মুদ্রা

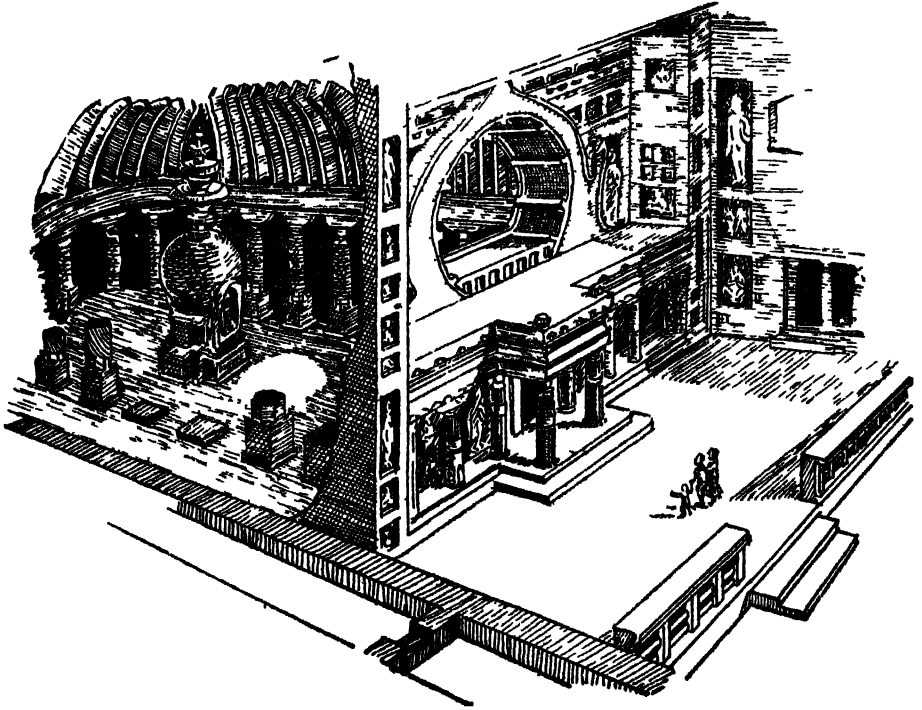
। চিত্র ৭১ । ১৫ ১৩

৩০খে প্রাচ্যযুগেব নাগ্নুবদব এ আসন-পাঁড়ি হয়ে এসব বিচিত্র ভঙ্গিটাকেই বোপ কবি আবণ বাড়াবাড়ি বলে মনে হববে। হাতেব মৃদায় আভিজাত্যেব ব্যঞ্জনা বিমূত হয়ে গঠে। ভাবগীয জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাব প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তার কাছেই এ অঙ্গুলিমুদ্রাব বক্তব্য সোচ্চার। সংক্ষেপে বলতে পারি, ব্যঞ্জনাঙ্গম মণিবন্ধ, হাতেব তালু ও কবালুজি আজও ঐভাবেই মনেব ভাব ব্যক্ত কবে--কখনও প্রার্থনায়, কখনও বাধাদানে, কখনও আমন্ত্রণে, কখনও সাস্তুনায়, কখনও বা সোহাগ জানাতে।

অজস্তাব বিভিন্ন চিত্র থেকে কয়েকটি হাতেব মুদ্রা এখানে সংযোজিত কবেছি (চিত্র—৭৫-এ)।

সপ্তদশ গুহা দর্শনের পর আমবা আবার অবশিষ্ট গুহাগুলিতে পর্বিক্রমা শুরু কবতে পারি। অষ্টাদশ গুহায় দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে সেটি। এব পব অবস্থিত মহাযান-যুগেব চৈত্য উনবিংশতি গুহা।

উনবিংশতি শতাব্দীর চৌত্থের দুটি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। চিত্র—৭৬-এ সম্মুখের অংশ (ফাসাদ) এর কিছুটা ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। এ-জগ্য কল্পনায় পর্বত-গাত্রের খানিকটা অংশ অপসারিত করে নিতে হয়েছে। সূর্যগবাক্ষ-পথে বিবিষ্ণি কেমনভাবে ভিতরে প্রবেশ করে, তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিতরের হল-কামরাব বারমর্দিকস্থ স্তম্ভগুলিকে জমির সমান্তরালে কল্পনায় কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে দুটি সুবিধা হয়েছে। প্রথমতঃ, পিছনদিকে অবস্থিত স্তম্ভটিকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয়তঃ, স্তম্ভগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় কল্পিত হওয়ায় স্তম্ভের গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যাচ্ছে। অর্থাৎ, কোন অংশ চৌকোণা, কোন অংশ



চিত্র—৭৬

### উনবিংশতি চৌত্থের ফাসাদ ও অভ্যন্তরভাগ

গোলাকৃতি, কোথায় আটকোণা তা দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভশীর্ষগুলিকে সংযুক্ত করে যে বীম বা কড়ি (আর্কট্রেড) আছে, সেটিকেও দেখা যাচ্ছে। আর সেই বীমের উপর অবস্থিত সারি সারি খিলান-আকারের বীম কিভাবে ছাদের ভাব বহনের ভান করছে, তাও অল্পমান করা যায়। আগেই বলেছি, স্তম্ভগুলি ছাদের ভাব বহন করছে না। ফলে, স্তম্ভের উপর ঐ আর্কট্রেড এবং তার উপর অবস্থিত ঐ খিলানগুলির কেউই ছাদের ভার বহন করছে না

কাঠের কাঠামো বা কফ ট্রাসের অনুকরণে প্রস্তর-শিল্পী প্রথা-মার্কিক এগুলি খোদাই করে গেছেন মাত্র। মিঃ পাসি ব্রাউন বলেছেন, 'ওদের হাত ছেনি-হাতুড়িতে নিযুক্ত থাকলেও ওদের মনে বয়ে গেছে সেই আদিম কবাত-বাটালির যুগের স্মৃতি।' আমাদের কিন্তু মনে হয় নি যে, সেইটিই একমাত্র কারণ। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা বলে যে, কোন স্থাপত্য-কর্মের (engineering structure) ভাববহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেই স্থপতিবিদের কর্তব্য শেষ হয় না,—তাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গৃহবাসীর মনে হয় যে, সেটি ভেঙে পড়বে না। গৃহবাসীর মানসিক শান্তির জন্য অনেক স্থপতিবির আধুনিক বাড়ীর ক্যাষ্টি-লিভার বাবান্দার নীচে বীমের (ভাববাহী নয়) ঘাভাস দেখান। আমাদের মনে হয়, অজ্ঞান্য স্থাপত্য-শিল্পী এই কারণেও এই স্তম্ভ 'বামহণি খোদাই' করিয়েছিলেন।

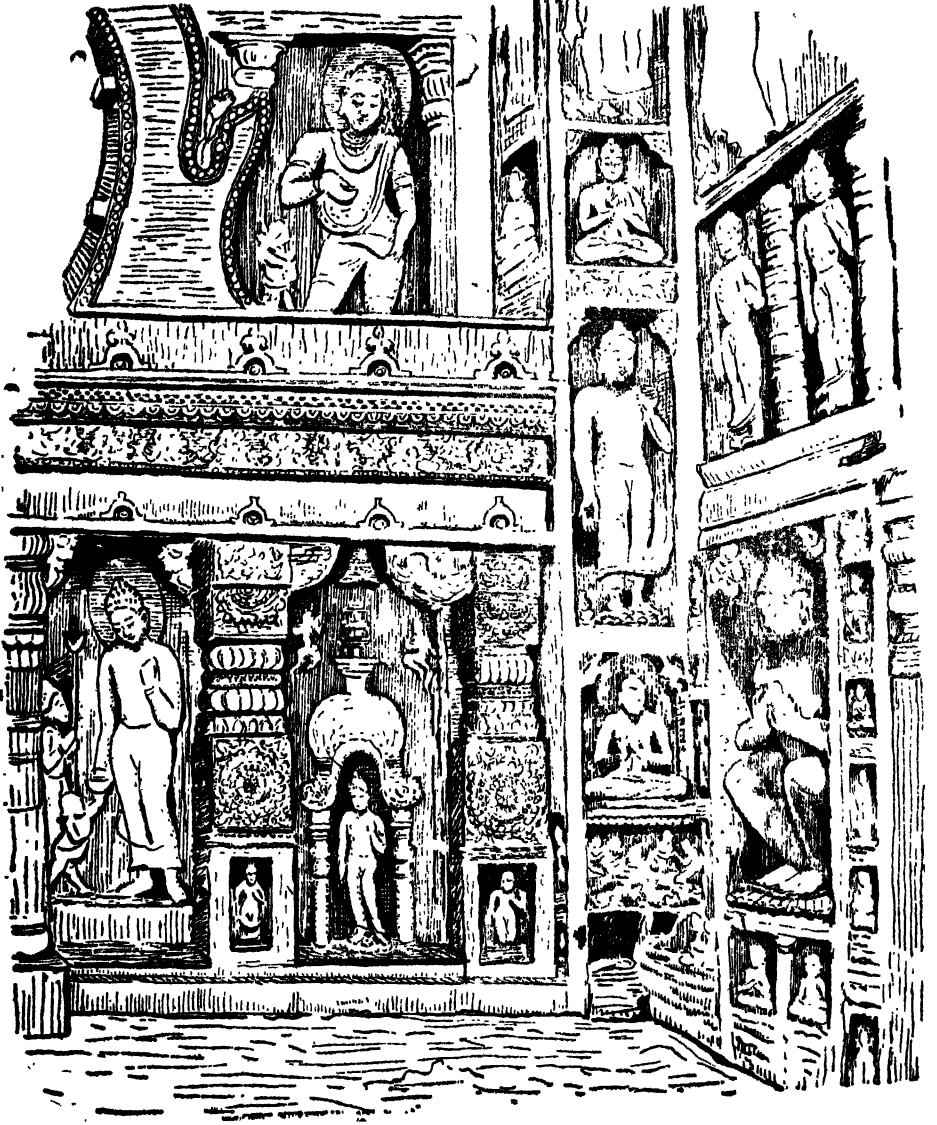
সে যাই হোক, আশা করি, প্রান ও এলিভেসানের বদল অথবা নিছক ফটোগ্রাফের পাবিত্যেও এই কাল্পনিক চিত্রটির মাধ্যমে এই গুহা-মান্দবের স্বরূপটা ভাল বোঝা যাচ্ছে।

প্রবেশ-পথের আংশিক সম্মুখ-চিত্র দেখা হয়েছে চিত্র-৭৭-এ। আধাখানা আঁকা হয়েছে ভাস্কর্যের খুঁটিনাটি ভাল করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে। সূর্যগবাক্ষের একটু ইঙ্গিত হয়েছে উপরের দিকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিত্র-৭৬-এব কোন অংশটি চিত্র-৭৭-এ বড় করে দেখানো হয়েছে।

উনবিংশতি শতাব্দীর সম্মুখে যে পশ্চিম চর, সেখানে সম্ভবতঃ পূর্বে আব-একটি প্রবেশ-তোরণ ছিল। বর্তমানে যেটি প্রবেশ-তোরণ তাব সম্মুখে আছে একটি ছোট বাবান্দা, ইংবেজীতে যাকে বলে 'পোর্টিকো'। তাব দু'পাশে দুটি স্তম্ভ। চিত্র-৭৬-এ সে দুটিকে আমরা আগেই দেখেছি। পোর্টিকোর পূর্বে একটি অগ্নিদ, তাব বাহিরের দিকে এক-সানি স্তম্ভ, ভিতরের দিকে পবত-গাত্রে খোদাই-করা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি। মাঝখানে প্রবেশ-পথের ঠিক উপরে অগ্ন্যুৎকৃতি স্তম্ভগাছ। তাব স্বরূপও আমরা হতিপূর্বে (চিত্র-৪৭-এ) ভাল করে দেখেছি। প্রবেশ-পথ দিয়ে এবার গুহা-চৈতোর ভিতরে আসা গেল। দেখছি, দু'পাশে দুই-সানি স্তম্ভ, সবসময়ে পনেরটি। মাঝখানে, প্রবেশ-পথের বিপরীত প্রান্তে—স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ ও গন্ধর্বে মূর্তি খোদাই করা। স্তম্ভটির বর্ণনা ইতিপূর্বেই চিত্র-৫৬-এ করা হয়েছে। এ চৈত্যেও কিছু কিছু চিত্র এক সময়ে ছিল, বর্তমানে কিছুই দেখা যায় না।

এবার প্রবেশ-পথের সম্মুখ-দৃশ্যটির, যাকে বলে গুহা-চৈতোর 'ফাসাদ', তাব বর্ণনা করি। সূর্যগবাক্ষের দু'পাশে দুটি গন্ধর্ব-মূর্তি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূর্তি দুটি ভারসাম্য বা 'সিমেন্ট্রি' বক্ষ্য করছে বাট। কিন্তু একটি অপবর্তিত ঠিক বিপরীত ভঙ্গি (mirror image) নয়। যে-কোন সাধারণ শিল্পী প্রতিসাম্যের স্বার্থে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থাপন একই বক্রম করতেন, এ-মূর্তি ডানদিকে হলে থাকলে ও-মূর্তি বাঁদিকে হলে থাকত, কিন্তু অজ্ঞান্য জ্ঞাত-শিল্পী তা করেন নি। আবও লক্ষণীয়, বাঁদিকের মূর্তিটি নারীমূর্তি, অথচ ডানদিকের মূর্তিটি (যেটি চিত্র-৭৭-এ দেখা যাচ্ছে) পুরুষের। এই গন্ধর্ব-মূর্তিদ্বয়ের উপরে ও নীচে

জমির সমান্তরাল ছুটি কড়ি (frieze)। সেখানে ছোট ছোট সূর্যগবাক্ষ-অনুসরণে অলঙ্করণ। তার নীচে, দক্ষিণদিকে (চিত্র—৭৭) দেখছি, একটি স্তূপের ভিতর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। চৈত্য-



চিত্র—৭৭

উনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদের অংশ

অভ্যন্তরস্থ মূল স্তূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী। বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। ভিতরের স্তূপে বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ প্রতিসাম্য-মূলক (চিত্র—৫৬), অথচ এখানে তাঁর দক্ষিণহস্তে বরদানের ভঙ্গি



বামহস্ত বুকেব কাছে। হমিকাব পরিকল্পনাতেও বৈপবীত্য আছে। এই স্তূপ-বুদ্ধেব দু'পাশে দুটি অলঙ্কৃত অধ-স্তম্ভ বা পিলাম্ভাব। অধ-স্তম্ভেব ওপাশেব কুল্লুজিতে দেখছি, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন যশোধবা ও বাহুল। সম্ভ্রমশ গুহাব শ্রেষ্ঠ চিত্র গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেবেব (চিত্র—৬৭) সঙ্গে এই ভাস্কর্যটি তুলনীয়।

বস্তুতঃ, সমগ্র ফাসাদটি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ, গন্ধর্ব, কিম্বব মূর্তিতে আগাগোড়া মোড়া। ফুল-সতা-পাতাব বাহ্যবই বা কত। সমস্ত কার্কাগই পাথব-কেটে কবা—ছেনি-হাতুড়িব চাতুর্ঘ, বঙ-তুলিব নয়। মুষ্কবিন্মাষে দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। শেষ গুপ্তযুগেব শ্রেষ্ঠ ভাস্কবেব অত্যন্ত নিদর্শন এই ফাসাদটি।

বিংশতি বিহাবেটিব সম্মুখেও দুটি স্তম্ভ ও দুটি অধ-স্তম্ভ। অলিন্দেব ছাদে কাঠেব কডি-ববগাব অন্তবরণ। এই গুহাব বাবোটি গভ-গুহা আছে। মূল গর্ভ-গুহাব আছে

বিংশতি বিহাব  
দক্ষিণে ধর্মচক্রমুদ্রা, চরণতলে চব্বিণ-শিশু। গর্ভ-গুহাব দক্ষিণে  
একটি খাদাই-ববা মতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাজা ও রানীব  
মতি। বাবাব হাঃ চতুঃকোণ এণটি পাখা, বাজাব উপব তিনি দেহভাব হাস্ত কবতে  
উদ্রতা। তার চুল-বাধাব কানদ্যটি লক্ষ্য কববাব নঃ।

একবিংশতি বিহাবেব সম্মুখেও অলিন্দটি আছে পাড়েও তবু যে দুটি স্তম্ভ এখনও  
দাডিয়ে থাকে, তাঃ স্তম্ভেব নকশা সাদা। কলকান কাজ দেখতে পাওয়া যায়।  
উপবেব 'বিঃক্র' নাগব জঃ ও রানীব মতি খাদাই ববা হল-কামরাটি প্রায় বর্গক্ষেত্র।  
দৈর্ঘ্যে ৫১' ফুট, প্রস্থ ৫১ ফাঃ সম্মুখে দ্বাদশটি স্তম্ভ, সেগুলিব অলঙ্করণ দ্বিতীয়

ত্রয়োবিংশতি বিহাব  
বিহাবেব অন্তবরণ এটি গুহাটিও খ্যাষ্টান্তব বর্ষ শতাব্দীতে  
খাদিত গুহাব ভিত্তি চোদটি গর্ভ-গুহা আছে, কেন্দ্রীয় গর্ভ-  
মন্দিবে বুদ্ধমতিঃ - পদ্মাসন, বর্মচক্রমুদ্রা।

দ্বাবিংশতি বিহাবেটি মধ্য গর্ভ-গুহা, সম্মুখেও অলিন্দটি ভেঙে পাড়েছে দু'পাশে  
দুটি অস-সমাপ্ত গভ-গুহা। বেদীঃ গভ-গুহাব স্নপিতপদ উপবিষ্ট বুদ্ধমতি। এই গুহাব  
দক্ষিণ প্রাচীরে শ্যনবান একটি বুদ্ধমতি—পদ্মাসন, ধর্মচক্রমুদ্রা।  
দক্ষিণে বিহাব  
উপবেব এক-দাবি মাণ্ডমাবুদ্ধ। এই গুহাব কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্রেব  
নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে তাব পাসোদ্ধাব কবা অসম্ভব।

ত্রয়োবিংশতি বিহাবেটিও সমসাময়িক। এখানে, অলিন্দে দেখতে পাচ্ছি কার্কাগ-  
খচিত চাবটি গুর্ণকায় এণ দুটি অধকায় স্তম্ভ। সেগুলিব স্তম্ভমূল চতুঃকোণ, মধ্য অংশ  
গোলাকাব, উপবে আমলক ও গ্রাবাকাস। আকাবে এটি একবিংশতি বিহাবেব প্রায়  
সমান। এখানেও গুহাব অভ্যন্তবে দ্বাদশটি স্তম্ভ। বিহাবেটি  
ত্রয়োবিংশতি বিহাব  
অসমাপ্ত। মূল গর্ভমন্দিবে কোন মতি নেই। সম্ভবতঃ, অসমাপ্ত  
অবস্থায় এটি পবিত্যক্ত হয়েছিল। মতিটিকে কপায়িত কবাব পূর্বেই।

আপনি যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক বা ঐ জাতীয় কিছু হন, তাহলে চতুর্বিংশতি



প্রাচীর খোদাই করিতে বাকী বয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় এগুলি ইচ্ছা কবেই খনন করা হত না। শেষ পর্যায়ে এই প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলা হত। চতুর্বিংশতি বৎসর অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় যখন পবিতাক্ত হয়, তখনও এই প্রস্তর-প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলা হয় নি। প্রথম অবস্থায় এই প্রাচীরগুলি ছেড়ে যাওয়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন গলিপথে যখন শিল্পীর দল কাজ করতেন, তখন একজন কাবিগরের ছেনি-হাতুড়ির আঘাতে ছিটকে-যাওয়া পাথরের টুকরোয় যাত্র পাশ্চাত্য শিল্পী আহত না হন, তাই এ ব্যবস্থা।

পঞ্চবিংশতি বিহাৰটিতে এখন যাওয়ার বাস্তু নেই। এটি প্রায় পঁচিশ ফুট লম্বা ও চওড়া বর্গক্ষেত্র। সম্মুখ-ভাগে তিনটি প্রবেশ-দ্বার ছিল। এটিও অসমাপ্ত অবস্থায় পবিতাক্ত।

ষড়বিংশতি হুতাটি একটি চৈত্র্য। অল্পায়া নিৰ্মিত শেষ চৈত্র্য, ষ্ট্রাটোস্তব সপ্তম শতাব্দীতে নিৰ্মিত। ফাসাদেব সম্মুখে বিস্তীর্ণ চক্ৰ। সম্মুখস্থ ত্রিভুজ ও পোটিকো-টি ভেঙে গেছে। ভিত্তি বা পিত্ত অংশে এক-সারি বামন মূৰ্ত্তি খোদাই করা। ফাসাদেব বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মূৰ্ত্তি মন্দির খোদিত। চৈত্র্য-গবাক্ষেব ছুঁপাশে দুটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূৰ্ত্তি। তাদেব ছুঁপাশে দুটি বুদ্ধমূৰ্ত্তি-ববদামূৰ্ত্তি। তাদেব দুই পাশে পুনরায় দুটি বুদ্ধদায়ক পদ্ধমূৰ্ত্তি প্রায় বৃডি ফুট দীর্ঘ। চৈত্র্য-গবাক্ষেব সপসমেত হুতাট স্তম্ভ ছাড়া প্রবেশপথে দুটি গণদেব-বহুল গাঢ়কান। স্তম্ভশীর্ষেব বাকোটে বন্দব দুটি নাবার্মি। এগাফা স্তম্ভগুলি এবং স্তম্ভের নব্যভাগ গোলাকৃতি, নকশা-কাটা ও পল-গোলা। শীর্ষদেশ আমলক, অপ-নঃ ৫ মণোপরি ছ-মুখা ত্র্যাম্বক। স্তম্ভেব উপরেব বর্ডটিও (বাক পাশ্চাত্য ভাষায় বঃ tufonium) বদ্ধমূৰ্ত্তি। এ নানান দায়ক নকশা।

পারশ-দেশের মিশ্রণী দিকের মন্দির মূল ১১৮২ না উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক (১৮৫০-১৯১০) সাল পর্যন্ত পুনরায় ১৮৫০-১৯১০ সাল পর্যন্ত পুনরায় ১৯১০-১৯১০ সাল পর্যন্ত পুনরায় গাত্রে খোদিত। দ্বিতীয় হুতায যে মহামানবেব জন্মদশাটি দেবে এসেছি, তাই মানব-সৌন্দর্যেব শেষগৌলী ওখান বিমূর্ত। বিশাল মান দিক মন্দির স্তম্ভগুলি যাবতীয় ভাস্কর্যেব মধ্যে এটি প্রথম বুদ্ধদেব তার দক্ষিণাংশ মূৰ্ত্তি বসে থাকে। তার দক্ষিণ-স্তম্ভ মাথার নীচে। মাথার ভাবে উপাধানটি যেন গল্প লস গেছে। মহামানবেব দেবেব দুই পাশে দুটি শালবৃক্ষ। উপরে এক-সারি দেবতার মূৰ্ত্তি তারা আনন্দ করছেন, বাস্তব বাজাচ্ছেন, মহামানবেক সম্মানে স্বর্গে গাছান জানাতে যেন নেমে এসেছেন বুদ্ধদেবেব মণোপরিবায় আকাশপথে। বুদ্ধদেবেব সম্মুখে দর্শকেব দিকে পিছন ফিবে বসে আছেন এক-সারি ভক্ত। তারা বসেছেন ভূমিশায়া। তারা বেদনায় আধুত, রোক্তমান, শোকাহত। যে পাশ্চাত্য তিনি শয়ন কবেছেন তার কাঁই নির্বাচিত-শিখা দীপ-সমমিহ একটি দীপাবাব এবং কিছু ফুল ছড়ানো। মহামানবেব পদপ্রান্তে ভিক্ত

আনন্দ। বুদ্ধদেবের কাছ থেকে শেষদান নিতে হচ্ছে তাঁকে—তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টি। দক্ষিণহস্তের তালুতে ভিক্ষু আনন্দ মাথা বেখেছেন, বিষাদখিন্ন মমাতত মূর্তি তাঁর।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অজস্রা-শিল্পী এই মহান দৃশ্যপটটি কপাৰ্ণিত কৰেছেন। বুদ্ধদেবের পায়ের নখ থেকে দীপাধারটি পর্যন্ত সজীব ও সুন্দর। কিঞ্চিৎ এ ভাস্কৰ্যের মূল আবেদন সামগ্ৰিক মহানুভবতায়।

গা-হিয়ান তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে গৌতমবুদ্ধের মহানিবাণ প্রসঙ্গে বলেছেন :

কুশীনগরের উত্তরে ছুটি শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে হিমাবতী (গওকণ্ঠ) নদতীরে উত্তর দিকে মুখ করে এই যুগাবতার মহাপবিনির্বাণ লাভ করেন।

এখানে দেখছি ছুটি শালবৃক্ষ, দেখছি তিন উত্তর দিকে মুখ কৰেই শয্যে আছেন বটে।

এই চৈতন্যে আবণ একটি ভাস্কৰ্যের নিদর্শন লক্ষণীয়। মাব কর্তৃক বুদ্ধদেবের তপস্যা-ভঙ্গের প্রচেষ্টা ও মাবের পবাজয়। একই বিষয়-বস্তু নিয়ে একটি দক্ষিণ (অবগ্ৰাণ ১১০) আমবা প্রথম গুহায় দেখে এসেছি এখানে সেই দৃশ্যটি বড়-ছোট পৰিবৰ্ত্তে ছেঁদিত-শক্তিতে মংকর্ণ। তপস্যা-বঃ বুদ্ধদেব পসে আছেন কক্ষপ্ত-প, ভূমিস্পর্শমুদায়, বাণিবুদ্ধ-  
বুদ্ধ ও মাব

তলে। তাঁর নীচে মাবের গুণ বস্তু ষ্ট, বঃ ও বঙ্গ, তাকে প্রাণোত্তিত কৰছে। তাঁদের বসনের মধ্য ও হৃষণের প্রাচুৰ্য উদ্দেশ্য-প্রাণোদিত। তাঁদের সঙ্গে এসেছে আবণ দুজন সহচরী। মাব দক্ষিণে দৃশ্যমান। মহাসন্ন্যাসীকে শক্রসৈন্য চাবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তাঁদের মনে দুৰ্জয় আবাব হস্তপুষ্টি যুদ্ধ কৰছে। শিল্পী হযতো ওদের মব্যে গিবমেখলবাইনকে পুনৰায় দেখতে চেখেছেন কাবণ, আবাব মাবকে দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য, দক্ষিণাধানে বুদ্ধদেবের পদতাল-পরাভূত মাব।

এই গুহা-চৈতন্যে ভাস্কৰ্য পসঙ্গ ফাঃমন বলছেন ববভূদেবের বৃহদায়তন মন্দিরের ভাস্কৰ্যের সঙ্গে এই বর্ডাবিশাঃ গুহা-চৈতন্যে অবস্থিত ভাস্কৰ্য নিদর্শনের সাদৃশ্য এক বেণী যে, বশ নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় পশ্চিম-বঃ শিল্পাচারঃ মযাঃ গায়ঃ বাক কৰেছিলেন।

এই গুহাব পব আবণ চাবটি গুহাব গাঃঃ দেখাঃ গাঃঃ। পশ্চিম-শক্তি মপ্তবিশক্তি—উন  
ক্রিঃঃ বিঃঃঃ  
বিহাবটিঃ অসমাপ। গুঃঃ শক্তিঃ গুঃঃ বঃঃনানে যাঃয়া যাঃ  
না। এটিঃ অসমাপ্ত অবস্ৰায় পৰিতাক্ত হযছিল। হযতো শেষ  
ঃলে এটিঃ একটি চৈতন্যে কপ নিত। উনক্রিঃঃ বিহাবটিঃ  
ছুঃগম। সেটি আমাব দেখা হয নি।

১ One of the most interesting results obtained from studying of the sculptures in this cave is the almost absolute certainty that the Great Temple of Boro-Buddor in Java was designed by artists from the West of India. The style of execution of the figure sculptures in the two temples resemble each other so nearly that we might almost fancy that they were carved by the same individual.  
Cave Temples of India by Fergusson & Burgess, London, 1880.

ত্রিংশত গুহা-মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার একটি কাবণ আছে। অজস্রাব বিষয়ে যত প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, তাকে এই গুহাটির উল্লেখ নেই। ফার্ডিনান্দ, বার্জেস, গ্রিন্ফিল্ড, হ্যাবি হ্যাম এ-বিষয়ে নীরব, পাসি ব্রাউন-সাহেব তাব গ্রন্থেব পবিশিষ্টে অজস্রা-গুহাব যে কাল-নির্দেশক সূচী দিয়েছেন, সেখানেও এ গুহাটির নামোল্লেখ নেই। তাব কাবণ এই যে, এই গুহাটি আবিষ্কৃত হযেছে মাত্র বছর দশেক আগে এব এক ঘটনাচক্রে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দেব জানুয়ারি মাসে একদিন প্রবল বর্ষণে ষোড়শ বিহাবের সম্মুখস্থ পথটিতে একটি ধস নামাব আশঙ্ক দেখা দেয। এই পাবস্ত্রা পথটিকে রক্ষা কববাব উদ্দেশ্যে অতঃপব পুরাতত্ত্ব-বিভাগ একটি ধস-বোধী প্রাচীর (retaining wall) গেথে দেবাব ব্যবস্থা কবেন। এল ইট-বাগি-সিমেন্ট। এই প্রাচীরেব বনিযাদ খুঁড়তে গিয়ায় হঠাৎ অতর্কিতে বেবিযে পড়ল এবটা ফাপা গুহা। কুলিব সন্দাব গায় ধস পড়ল পুরাতত্ত্ব-বিভাগেব কমচারীকে বেট বাগিয়ে দিতে হব, না হলে এদেব পড়তাব পোষাচ্ছে না।

ধমকে ওঠেন কমচারী এই ছুদিন আগে তুমি বেট মেনে নিয়ে সহি দিয়েছ, আজ বেটে পোষাচ্ছে না বললে শুনব কেন ?

হাত ছুটি কচলে কুলি-সন্দাব বলে—তখন কি জানতাম গুজুব, ভিতবে অতবড় ফোকব ? অতখানি ভবাট কবতে হবে।

আংক ওঠেন কমচারী কি বললে ? ফোকব .বাখায়

অকুস্থলে ছুটে গেলেম তিনি খবর গেল বড়ক প্রাব বাহে। হেড-অফিস থেকে ছুটে এলেম সবাই বহল পড়ে কুলি-সন্দাবেব দেয়াল গাথাব বাজ। শুক হয়ে গেল খনন-কায। একে একে দেব হ্রয় পড়ল একটি গুহা, একটি সপ এব সর্গশেষে আবিষ্কৃত হল একটি অপূব হীনযানী গুহা। অভ্যন্তরভাগ প্রায় .২ ফট বর্গক্ষেত্র। এখান একটি

শিল্পলিপি পাওয়া গেছে আজও যাব পারোদ্ধাব কবা যায় নি।  
গুহাব কাচ্চ হীনযানী কাযদায় খোদিত ছুটি প্রস্তব-শযা।

সম্মুখ-ভাগে একটি অলিন্দও এককালে ছিল বলে অনুমান কবা যায়। এটি বিহাব না চৈত্য ? ভূপেব অস্তিত্ব বাল এটি চৈত্য, কিন্তু চতুর্দান পবিনয়না ও প্রস্তব-শযা ইঙ্গিত কবে এটি বিহাব। সম্মুখ-ভাগে একটি স্তম্ভেব গায় নবন চৈত্যেব অল্পকপ কয়েকটি অক্ষব খোদাই কব।

সবচেয়ে আশ্চর্যেব কথা, এই গুহাব প্রবেশ-পথটি ১৯ ইঞ্চি লম্বা ইট দিয়ে বন্ধ কবা ছিল। কবে এটি বন্ধ করা হযেছিল ? কেন নিশ্চিন্দেহে এটি হীনযানী যগব। সম্ভবত. খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর, অর্থাৎ অজস্রাব প্রাচীনতম হুহাদলেব অন্তর্ভুক্ত। পববর্তী কালে এর ঠিক উপবেই ষোড়শ বিহাবটি খনন কবা হযেছিল বলেই কি মহাবানী বৌদ্ধবা এব প্রবেশ-পথটি ইট দিয়ে বন্ধ কবে দিয়েছিলেন ? কিন্তু তাহলে সমস্ত ফোকরটাই বা বন্ধ করেন নি কেন ? ভিতরে ফাঁপা অংশ বেখে শুধু প্রবেশ-পথটাই বা বন্ধ কবলেন কেন ?

ইতিহাস এ প্রশ্নেব আজও জবাব দেয় নি।

অজন্তাবাসেব মেঘাদ আমাব শেষ হয়ে এল। যাবাব দিন সকালে বসেছিলুম বাগাচা নদীৰ ধাবে মীর্জা ইসমাইলেব সঙ্গে গুহা-মন্দিবেব দ্বাব তখনও খোলে নি, শুক হয় নি যাত্রীদের ভীড। কথা প্রসঙ্গে ইসমাইল সাহেব বলেন—ইযাজদানী বলেছেন, The artist, to enhance the emotional effect of the scenes, has delineated Madri with all the charms of youth and beauty which he could imagine

শুনে আমি বলেছিলুম বোব কবি সেটাই একমাএ কাবণ নয়। কবণ কাহিনীটিকে হৃদয়গ্রাহী কবাবা উদ্দেশ্যেই শিল্পী মাদ্রীকে অপকণা শূন্দবী কবে চিত্রিত কবেন নি। সম্ভবতঃ কাবণটি আবও গভীবে নিহিত।

টনি বলেন—কি বলুম ?

বলি -পালি ভাষা আমি জানি না, কাল বাএ মূল জাতকেব আঙ্গিক অনুবাদ পড়ছি যুম। পড়ে আমাব মনে হযছে, জাতককাব বিশ্বাস্তবেব মহানুভবতা প্রচাবে এতই মুখব যে, মাদ্রী-চবিত্রটিব অন্তগত বেদনাৰ কথা বলবাব সময় স্বতই স্বল্পভাষ হয পড়েছেন। মাদ্রীৰ প্রসঙ্গ সেখানে অতি অল্পই আছে।

ইসমাইল সাহেব হেসে বলেন—আপনি এ গল্প আপনাৰ বইয়ে লেগাবার সময় নিশ্চয় জাতককাবেব এ ক্রটি সশোণন কবে নেনেব।

আমি বলি—কথাটা ঠিক হল না ইসমাইল সাহেব। জাতককাবেব বসবাবেব অন্তর্ভুক্ত প্রতি ইঙ্গিত কবছি না আমি। মহৎ সাহিত্যেব বোব হয় এই লক্ষণ। আপনি বাংলা ভাষা জানেন না, না হলে একটি উদাহরণ দিতুম। বাণভট্ট অথবা বাগ্মকিৰ প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এ-জাতীয় অভিযোগ এনেছিলেন স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ। গত যুগেব মহাকাবীর উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ হয়ে এ-যুগেব মহাকাবি পত্রলেখা আব উর্মিল। চরিত্রেব মর্ষাদা মিটিয়ে দিতে লেখনী বাবণ কবেছিলেন।

টনি বলেন—এখানে কি বলতে চাইছেন ?

আমি বলতে চাই, জাতককাব মাদ্রী-চবিত্রটি চিত্রণে যে অবহেলা, যে উপেক্ষা দোষায়িত, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই অজন্তাব শিল্পী সেই কাব্য-উপেক্ষিতাব আলোখ্য আঁকবাব সময় সৌন্দর্যেব পবিপূবকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন মাদ্রীৰ অপ্রাপ্ত মর্ষাদা।

ইসমাইল বলেন— ও তো বুঝলাম, কিন্তু অজন্তাব শিল্পী স্বয়ং যে চবিত্রটিব প্রতি অবহে। কবেছেন, উপেক্ষা করেছেন, তার মর্ষাদা তাহলে কে মেটাবে ?

কার কথা বলছেন আপনি ?

ভেবে দেখুন। নাগরানী সূমনা খুঁজে পেয়েছে চম্পেয়্যরাজকে, মাদ্রী ফিবে

শেয়েছে তার স্বামীপুত্রকে, সীবলীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে পরজন্মে, মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করেছে সে। জন্ম-জন্মান্তরে বোধিসত্ত্ব এগিয়ে গেছেন পরম পরিণতির দিকে—শেষ জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, তাঁর মহাপরির্নির্বাণ হয়েছে। কিন্তু বাবুজি, আমার যশোধরা মায়ের পরিণতি কি ? অজ্ঞতা গুহার তাঁকে শেষবার দেখেছি কপিলাবস্তুর প্রাসাদ-তোরণে মহাভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে—জেনেছি তারপর উপেক্ষিতা অবহেলিতা রাজবধু নিদারুণ অভিমানে পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন পিতার কাছে, তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন পিতৃধন প্রার্থনা করতে। তাঁর সে ছেলে আর কিরে আসে নি ! তাঁকে মূর্ছাতুর অবস্থায় রেখে রাজা শুদ্ধোধন ছুটে গিয়েছিলেন শ্রুতপ্রোথারামে। ব্যস্, তারপর তাঁর কথা বলতে ভুলেছেন শিল্পী ! বাবুজি, আমি মুসলমান,—বুদ্ধদেবকে আমি মহামানব হিসাবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার যশোধরা মাকেও কম শ্রদ্ধা করি না। অজ্ঞতার শিল্পীদের দেখা পেলে আমি বলতাম—গৌতমবুদ্ধের মহান্নভবতা প্রচারে তুমি এতই মুগ্ধ যে, আমার মা-যশোধরার পরিণতি দেখাতে ভুলে গেলে তুমি !

আমি অবাক হয়ে দেখি, বলিরেখাঙ্কিত বুদ্ধের মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে ! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাশ্চাত্যের জগৎ আমি বালি—আচ্চা, আর একটা প্রশ্ন। ফদাঁপুর গ্রাম তো অজ্ঞতা গুহা থেকে মাত্র তিন মাইল। এ গ্রামে লোকজনের বাস নিশ্চয়ই তিন-চারশ' বছরের। অথচ ওরা জানত না এত কাছের এই গুহা-মন্দিরগুলির অস্তিত্ব ?

মীর্জা ইসমাইল ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে, বলেন—ওরা জানত না ধরে নিচ্ছেন কেন ?

—তাহলে বাইরের ছনিয়া এতবড় খবরটা জানতে পারল না কেন ?

—জানবে কেমন করে ? এটাকে তো ওরা মস্তবড় কোন খবর মনে করে নি। ওদের বিশ্বাস এ খুবই স্বাভাবিক। ক্যানিংহ্যাম সাহেব ফদাঁপুর গ্রামে খোঁজখবর করেছিলেন। গাঁওবুড়ো তাঁকে বলেছিল—ও গুহার কথা তো আমরা বরাবরই জানি। আমাদের খুড়ো-জ্যাঠা-বাপ-পিতামো সবাই জানত।

সাহেব কোঁতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ওই গুহার মধ্যে অমন সব ছবি কারা ঐঁকে গেছে জানবার কোঁতুহল হয় নি তোমাদের ?

সাহেবের অনভিজ্ঞতার হেসেছিল গাঁওবুড়ো, বলেছিল—জানব না কেন ? সবই তো জানি। ওগুলো তো ছবি নয়, ওগুলোর পিছনে মস্ত এক কাহিনী আছে।

অতঃপর গাঁওবুড়ো সাহেবকে শুনিয়েছিল সে ইতিকথা :

অনেক—অনেকদিন আগে—সে কত কুড়ি বছর আগেকার কথা তা বলতে পারব না ; কিন্তু তখন আকাশের পাখী আর গাছ-পাথর-নদী-ফুল, সব মান্নবের ভাষায় কথা বলতে পারত। স্বর্গের দেবদেবীরা স্বর্গবাসের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এসে ধনী দিলেন একদিন, বললেন—প্রভু, একরাতেই জগৎ আমাদের মর্ত্যে গিয়ে বনভোজন করে আসবার অনুমতি দিন। ইন্দ্র বলেন,—তা যাও, কিন্তু ছ'শিয়ার ! মনে

রেখ, সকালের আলো ফোটার আগেই, প্রথম পাখীর ডাক শোনার আগেই, সকলকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। তা না হ'লে স্বর্গের দরজা চিরকালের জন্ত বন্ধ হয়ে বাবে কিন্তু। দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নর-অঙ্গরার দল খুশীয়াল হয়ে ওঠে। দলে দলে ওরা হাওয়ার ভেসে ভেসে নেমে এল মর্ত্যে। এই বাগোড়া নদীর গুহাগুলি দেখতে পেয়ে তারা স্থির করে, খেয়াল-খুশিতে এখানেই কাটিয়ে দেবে একটা পৌষালী ছুটির দিন। ওরা বাগোড়ায় নেমে স্নান করে এল। গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে খিচুড়ি বানালো। মহা আনন্দে কেটে গেল একটা দিন আর একটা রাত। কিন্তু গুহার অন্ধকারে ওরা ভুলে গেল পূব-আকাশের দিকে নজর রাখতে। ওদের অজান্তে ক্রমে রুক্ষ হয়ে এল পূব-আকাশ, ভারের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে—অন্ধকার গুহার ভিতর ওরা জানতেও পারল না। শেষ বেশ সবাইকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল ভোরের কুঁকড়ে! বাস্! বন্ধ হয়ে গেল স্বর্গের সোনার দরজা! আটক পড়ে গেলেন ওরা। যে যেখানে যেভাবে ছিলেন বন্দী হয়ে পড়লেন গুহার দেওয়ালে—কেউ ছবি, কেউ শ্রেফ পাথর!

কাহিনী শেষ করে মীর্জা ইসমাইল বলেন—কী মূর্খ ছিল ওরা!

আমি বলি—এ গল্প শুনে কিন্তু ওদের মূর্খামির কথাটাই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ে নি। আমি ভাবছিলাম—কী স্নন্দর উপকথাটি। ভাবছিলাম, যদি ওদের মতো সরল বিশ্বাসে এ কাহিনী মেনে নিতে পারতুম।

ক্র কুণ্ঠিত হয় ইসমাইল সাহেবের। বলেন—আপনি বিশ্বাস করতে চান এ আঘাতে গল্প?

বলি—ইসমাইল সাহেব, বিশ্বাস করি এ-কথা তো আমি বলি নি। কিন্তু এই অজন্তা-চিত্রের রসোপলব্ধির জন্ত আপনি আমি তো অনায়াসে মেনে নিয়েছি—জন্মমাত্র বিশ্বাস্তর মায়ের কাছে দানের সামগ্রী চায়, মেনে নিয়েছি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মৃগীর মিলনে ঋতুশৃঙ্গ পুত্রের জন্ম হতে পারে, স্বীকার করে নিয়েছি যড়দন্ত হস্তীর অস্তিত্ব, বিশ্বাস করেছি সূতোসোম-জাতকের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা। কিংবদন্তীটিকেও মেনে নিলে যদি রসের রাজ্যে লাভবান হই, তবে একেই বা স্বীকার করে নেব না কেন?

অনেকক্ষণ ইসমাইল সাহেব কোন জবাব দিলেন না। তারপর দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—বাবুজি, তাহলে আপনাকে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এ-কথা আজও কাউকে বলি নি—জানতুম কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে পাগলা বুড়োর ক্যাপামি। আপনাকেও আমি এ-গল্প বিশ্বাস করতে বলছি না—মনে করুন এ-ও এক আঘাতে গল্প। দেখুন, একে মেনে নিলে যদি রসের রাজ্যে লাভবান হতে পারেন।

উপলব্ধুর বাগোড়া নদীর প্রবহমান শ্রোতের দিকে তাকিয়ে অন্তমনস্কের মতো বৃদ্ধ মীর্জা ইসমাইল অতঃপর বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা:

এখানে বখন আমি প্রথম চাকরি নিয়ে আছি, তখন আমার জোয়ান ধরম। জাতক-কাহিনীগুলি তখনও জানি না, মেঘের গিল, গ্রীকিধ, লেডী হেরিংহামের নামও শুনি নি।



তিনকূলে আমার কেউ নেই, কলে এখানেই পড়ে থাকতুম সারা বছর। ছবিগুলি দেখে আর সকলের মতো আমিও অবাক হয়েছিলুম প্রথমটায়। তারপর সহকর্মীদের মুখে একে একে গুনলুম জাতকের কাহিনীগুলি। আগে চিত্রের চরিত্রগুলিকে যে চোখে দেখতুম, এর পর থেকে অণু চোখে ওদের দেখতে শুরু করলুম। ওদের হাসি-কান্না, সুখ-হুঃখের ভাগ নিতে শুরু করি সেই সময় থেকেই। প্রতিটি চিত্রের হাতী, বাঘ, হরিণ, রাজহংস, সাপ, পাহাড়, নদী—প্রতিটি অঙ্গুরী, কিম্বদ, গন্ধর্ব—জাতক-বর্ণিত নরনারীর সঙ্গে আমার মিতালি হল। ওদের ভালবেসে কেলি ক্রমে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালো লাগত। সরকারী কাজের অবকাশে ওদের ছবি আঁকতে শুরু করি। পাতার পরে পাতা, খাতার পরে খাতা ভরে গেল ছবিতে। সবই পেনসিল স্কেচ। একটা মাসখের জীবন তো বড় কম নয়, শেষে আর কপি করার উপযুক্ত নতুন ছবি পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই নতুন ছবির সন্ধানে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ব্যাখ্যা আমি আজও দিতে পারি না। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেটা ঘোর বর্ষাকাল। সেদিন একটাও ঝাট্টী আসে নি। আমার সহকর্মীরা কেউই আসে নি গুহা-মন্দিরে। সকাল থেকে বর্ষা হচ্ছে ক্রমাগত। তবু নেশার ঝোঁকে স্কেচ-বই বগলে আমি এসেছিলাম গুহায়। হঠাৎ প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হওয়ায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম দশ নম্বর গুহা-মন্দিরে। বসে আছি তো বসে আছি, বৃষ্টি থামার নাম নেই, শেষে ক্লান্ত হয়ে পাথরের মেজেতে শুয়ে পড়ি। এ গুহায় কোন ছবি নেই। চারদিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু আঁকিবুঁকি। গত দেড়-দুশ' বছর ধরে নানান জাতের মানুষ নানান ভাষায় রেখে গেছে তাদের অপকীর্তির স্বাক্ষর। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ি। নিশ্চয় দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি আমি—ঘুম ভাঙল একেবারে পড়ন্ত বেলায়। না, ঘুম ভাঙল বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। হয়তো ঘুম আমার সত্যিই ভাঙে নি—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসেছি। ঘুমের ভিতর স্বপ্নই হ'ক, অথবা জাগরণেই হ'ক, দেখলাম আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—বর্ষার জলে উপলমুখর কলনাদিনী বাগোড়া অনর্গল প্রলাপ বকে চলেছে। এদিকে সূর্যগবাকের পথে বাঁকা হয়ে গুহায় প্রবেশ করেছে এক ঝলক রোদ—পূবের দেওয়ালে পড়েছে সেই সোনালী আলো। হঠাৎ নজরে পড়ল, আমার সম্মুখে গুহার প্রাচীরের যে অংশটা অন্তস্তূর্ষের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেখানে সমস্ত প্রাচীর জুড়ে একটা বৃহদায়তন চিত্রাবলী। স্তম্ভিত হয়ে যাই আমি;—কী আশ্চর্য, এ ছবি তো কই আগে কখনও দেখি নি। শুধু তাই নয়, রঙে আর রেখায় এমন উজ্জ্বল ছবি তো অজন্টার কোথাও নজরে পড়ে নি আমার। স্তম্ভিত হয়ে অস্তিত্ব হলে আমি তাকিয়ে থাকি সেই চিত্রটির দিকে। অদ্ভুত সেই প্যানেলটি ৭' বড় বড় হস্তিস্থলের অরণ্য আবাস...রাজসভা...মূর্তীভূমি রানী...রানীর এলায়িত তমুকে ধরে আছেন রাজা... পার্শ্বের...কিঙ্কর...সস্তামগুপ! তন্নয় হয়ে দেখতে থাকি চিত্রগুলি। আমার চোখে যেন

পলক পড়ে না। ক্রমে তিল তিল করে অপসারিত হল অন্তসূৰ্ণের শেষ আলোকরশ্মি। একেবারে নিভে গেল সন্ধ্যায়। দিগন্ত-জোড়া অন্ধকারে ঢেকে গেল বাগোড়া উপত্যকা।

ঠিক সেই সময়েই তন্নয় ভাবটা কেটে গেল আমার। যেন বাস্তবজগতে ফিরে এলাম ফের। অথবা বলতে পারেন ঠিক তখনই স্বপ্নদর্শন শেষ হল আমার। মোট কথা, বাহাজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্র নজরে পড়ল গুহার ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারের গর্ভে বিলীন। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে ফুটে উঠেছে সপ্তর্ষির চিরন্তন জিজ্ঞাসা। পায়ে পায়ে চলে আসি নিজের ডেরায়। আচ্ছন্ন ভাবটা তখনও আছে কিন্তু। বাসায় ফিরে এসেই ফের বার করি স্কেচ-বই। গুহায় দেখা ছবিটি তখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। খাড়া করলুম সেখানা আমার ছবির খাতায় সারারাত জেগে।

পরদিন সকালে সহকর্মী বন্ধুকে সেখানি দেখাতে সে বলে—এখন থেকে কি অজ্ঞস্তা-স্টাইলে এমন মন-গড়া ছবিই আঁকবে ?

আমি বলি মন-গড়া ছবি নয় ভাই, এ ছবি দশ নম্বর গুহায় দেখে এঁকেছি।

বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বলে—মায়ের কাছে মাসীর গল্প ? দশ নম্বর গুহা আমি চিনি না ?

ওর সেই অট্টহাসে যেন অভিজ্ঞান ফিরে আসে আমার। তাই তো! এ ছবি আমি কাল কেমন করে দেখলুম ? বছর দশেক আছি অজ্ঞস্তায়—দশ নম্বরে যে কোন ছবি নেই তা আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে ? তাহলে ?

তখনই দৌড়ানুম দশ নম্বর গুহার দিকে। আশ্চর্য! সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু সারি সারি স্বাক্ষর! আঁকিঁকি! দেবনাগরি, ইংরাজি, মারাঠি, ওড়িয়া। আমি কি তাহলে স্বপ্ন দেখেছি কাল ? এত স্পষ্ট ? বসে রইলুম সেখানে। সমস্ত দিন। সে দিনটি ছিল মেঘমুক্ত হাস্যকরোচ্ছল। যেন আমার হৃদশা দেখে বৃষ্টি-ধোওয়া গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করে হাসছে। পড়ন্ত বেলায় ঠিক তেমন করে সূর্যগবাক্ষের পথে বাঁকা হয়ে গুহা-মন্দিরে প্রবেশ করল অন্তসূৰ্ণের কোঁতুহল; কিন্তু যেন আমাকে দেখে ধমকে গেল। যেন সচেতন আমাকে দেখে প্রথামাফিক সে কর্তব্যকর্ম করে গেল শুধু—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূর্বপ্রাচীর। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করছে কিন্তু সেই আঁকিঁকি ছাড়া কিছুই দেখতে পেনুম না। নিজের পাগলামিতে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি ক্রমশঃ। তবু উঠে যেতে পারি না। ক্রমে তিল তিল করে সরে গেল সূৰ্ণের শেষ আলো। মানুষ্যের অত্যাচারে ক্ষতচর্ছ-লাঞ্ছিত মুখে পূর্বপ্রাচীর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল।

মোহগ্রস্তের মতো ফিরে এলুম অস্নাত অভুক্ত একটি দিন ঐ গুহার ভিতর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে। পরদিন, তার পরদিন—কিন্তু না, সে চিত্রটিকে আর দেখতে পেলুম না একবারও। মনকে বোঝাই স্বপ্নই দেখছিলুম তাহলে।

এই ধারণা নিয়েই খুশী হয়ে থাকতুম আমি; কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গুলিয়ে গেল সব। প্রায় বছরখানেক পরের কথা। আর্কিওলাজিকাল অফিস থেকে বড়সাহেব

এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। আমাকে খুব স্নেহ করতেন; তিনি বলেন—কই ইসমাইল, কি কি নতুন ছবি আঁকলে ইতিমধ্যে? তাঁকে দেখাই আমার স্কেচ-বই। সেই ছবিখানি তাঁকে দেখাতেই বলেন—মেজর গিলের স্কেচ কোথায় পেলো হে?

আমি বলি—মেজর গিল কে?

সাহেব হেসে বলেন—খাঁর ছবি দেখে নকল করেছে এখানা।

আমি অবাক হয়ে বলি—এখানা কিসের ছবি?

—দশ নম্বর গুহার পূর্বপ্রাচীরে বড়দস্ত-জাতকের ছবি। প্রায় একশ' বছর আগে এ ছবি অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন মেজর গিল, কপি করেছিলেন তিনি। অক্ষিসের আলমারি থেকে একটি প্রাচীন এ্যালবাম বার করে ছবিখানি দেখালেন আমাকে! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি! কি আশ্চর্য! যে ছবি আমি এঁকেছি ছবছ সেই ছবি।

• আমি কাউকে কিছু বলি নি! জানতুম, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে চালবাজি। ভাববে, মেজর গিলের ছবি দেখে নকল করে মিছে কথা বলছি আমি। কিন্তু কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল আমাকে। মনে হল, অজ্ঞা গুহার এ চিত্রগুলি তো শুধু রঙ আর রেখায় আকা নয়—এ যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলশ্রুতি। বংশানুক্রমিক ভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের দল ধ্যানের মন্ত্রে এদের পেয়েছিলেন—ধ্যানের জগতে এরা অবিনশ্বর। ধ্যানের জগতে খুঁজলে তাদের দেখা পাওয়া যায়। স্বপ্ন আমি দেখি নি—সেদিন কোন মন্ত্রে জানি না আমি স্মৃষ্ণরীরে উপনীত হয়েছিলাম সহস্রাব্দীর ওপারে কোন একটি কালে! কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমার চৈতন্যময় সত্তা উপস্থিত হতে পেরেছিল সেই অতীত যুগে—প্রত্যক্ষ করেছিল রঙে ও রেখায় সমুজ্জল সত্তা-সমাপ্ত সেই বড়দস্ত-জাতকের চিত্রটিকে! ধর্মে আমি মুসলমান—মূর্তিপূজায় আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধ যে একজন মহামানব ছিলেন, এ-কথা তো মানি। আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা করি অজ্ঞতার শিল্পীকে। শিল্পীর কি জাত আছে? বিধর্মী বলে কি আমাকে কৃপা করা হবে না?

তাই যদি হবে, তাহলে সেই অন্তসূর্য-উদ্ভাসিত সাক্ষ্য মুহূর্তে সহস্রাব্দীর যবনিকা কেন সরে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে?

অদ্ভুত এক পাগলামিতে পেয়ে বসল আমাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা আমি বসে থাকি শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। মনে মনে বলতুম—হে অজ্ঞাতশক্তি, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দাও এই মহাকালের যবনিকা, আমাকে দেখতে দাও সেই হাজার বছর আগেকার চিত্র-সন্টার! সহস্রাব্দীর ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত এ ধ্বংসাবশেষ নয়, আমাকে দেখাও রঙে ও রেখায় সমুজ্জল সেই সত্তা-সমাপ্ত চিত্রাবলী। এই সময়েই বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি যোগাড় করে পড়তে শুরু করি। মিস্ট্রিসিজম্ সন্থকে যেখানে যা-কিছু লেখা হয়েছে খুঁজে পড়ি। ক্ষুধিতপাষণ গল্পটিও এই সময়ে পড়ি। রাত্রে বই পড়ি, আর দিনের বেলা বসে থাকি শূন্য প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে। দিন আসে, দিন যায়—কিন্তু আর একটি দিনের ৩২৩০ এমন কোন ঘটনা ঘটল না। আহা নাই, নিদ্রা নাই, শরীরের প্রতি যত্ন নাই—

পাগলের মতো আমি মগ্ন হয়ে রইলুম আমার সাধনায়। সহকর্মীরা এই সময়েই ঘরে নিল আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

জানি এ আমার পাগলামি, তবু একদিন মনে হল কৃষ্ণ রাজকুমারীর চিত্রটিতে যেন অতি সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেন কেউ আমার অলক্ষ্যে ওর গুণ্ডপ্রাস্তে, চোখের কোণায় দু-একট, তুলির সূক্ষ্ম টান দিয়ে গেছে। বিরহিণী কৃষ্ণ রাজকুমারীকে এতদিন দেখেছি বিবাহের প্রতীকারূপে—এখন মনে হল, তার দৃষ্টিতে লেগেছে কোঁতুকের ছিটে, গুণ্ডপ্রাস্তে যেন কুটে উঠেছে অক্ষুট হস্তরেখা। ও যেন এতদিনে একজন দোসর খুঁজে পেয়েছে। সেই দোসরও যেন এই অন্ধশুভায় ওরই মতো কিসের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছে।

সহকর্মী বন্ধুকে বলি- কৃষ্ণ রাজকুমারীর আলোখ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ ইতিমধ্যে ?

বন্ধু রাগ করে বলে—হ্যাঁ। রাজকুমারী নয়, রাজকুমারের। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

তারপর আর একদিন। সেদিনও আকাশ জুড়ে নেমেছে পাহাড়ী বর্ষা। যাত্রীরা কেউ আসে নি। সহকর্মীরা কেউ বার হয় নি ঘর ছেড়ে। পূবরাত্রে আমার স্বপ্ন হয়েছিল তবু নেশার বৌকে আমি এসে হাজির হলাম গুহা-মন্দিরে। প্রথম গুহাটিতে পৌঁছাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি একেবারে। ছুটির দিন, কাজ নেই। ঘরে বসে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে এই নির্জন গুহাই আমার ভালো। দেখছি চারদিকে চেয়ে চেয়ে—বুদ্ধের প্রলোভন চিত্র, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, চম্পেয়্যা-জাতক, যুযুধান যশোদয়—দেখলুম চেয়ে কৃষ্ণ রাজকুমারীর দিকেও। যে যেমন ছিল সে তেমনি আছে—ভোরের কুঁকড়ে থেকে গুঠায় বন্দী হয়ে পড়েছে সবাই। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে ছবিগুলো—শুধু ঐ কৃষ্ণ রাজকুমারীর গুণ্ডপ্রাস্তে যেন মনে হয় এসে লেগেছে অতি ক্ষীণ একটা কোঁতুকের আভাস। না, গুণ্ডপ্রাস্তেও নয়—মেদিনী-নিবন্ধ দৃষ্টির প্রাস্তে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল যখন তখন গভীর রাত। বাহিরের বর্ষণ ধেমে গেছে, হেঁড়া মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শুক্লা ছাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাগোড়া উপত্যকা। অভ্যস্ত দুর্বল লাগছে শরীর। উঠে বসব এমন শক্তি নেই। স্থির করি, বাকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেব। আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

এই পরিস্থিতি বলে মীর্জা ইসমাইল ধামলেন।

আমি বলি—তারপর ?

—বলছি; কিন্তু কিভাবে বললে আপনাকে বোঝাতে পারব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। একটু চুপ করে থেকে বললেন—না, স্বপ্নই দেখেছিলুম।

আবার উনি চুপ করে যেতে বলি- কি স্বপ্ন ?

আমার প্রাণ ঠাঁর কানে গেল না। গল্পের সূত্র তুলে নিয়ে কেবল বলতে থাকেন— সমস্ত দিন এ গুহার বসে বসে পেয়েছি ভিজে-মাটির সঙ্গে মেশানো বন-তুলসী আর মৌরীকুলের গন্ধ। মনে হল, এবার যেন তার সঙ্গে এসে মিশেছে ধূপ-ধুনো-অশুষ্ক-চন্দনের সৌগন্ধ। মনে হল, দশ নব্বই গুহার দিক থেকে ভেসে আসছে একটি ক্লীণ সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা সঙ্গীত। বেশ বুঝতে পারছি প্রবল জ্বর এসেছে আমার। মাথাটা অত্যন্ত ভার, সর্বান্তে বেদনা—কিন্তু সে বোধকে অতিক্রম করে অনুভব করছি কী যেন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটছে আমার। জ্বরতপ্ত ভূমিশালালী এ দেহটি ত্যাগ করে আমি যেন অতীতের যুগে ফিরে চলেছি উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে উঠে বসি।

গুহার ভিতর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে! তারই আলোর প্রতিকলিত হয়েছে গুহাচিত্রগুলি। সেগুলির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। সব যেন বদলে গেছে! কী আশ্চর্য! সব চিত্রই স্থির, নিম্প্রাণ, অচল—কিন্তু তারা যেন পূর্ব মুহূর্তেই সব সচল ছিল! যেন, আমি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম ততক্ষণ ওরা সঙ্গীত হয়ে পড়েছিল, যে মুহূর্তটিতে চোখ মেলে তাকিয়েছি আমি, অমনি যে যেমন ছিল আবার স্থির হয়ে গেছে। বুদ্ধের প্রলোভন চিত্রে দেখছি—মারের তিন কণ্ঠা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফিরে যাচ্ছে— শিবি-জাতকে মহারাজ শিবি তুলাদণ্ডটি নামিয়ে রেখেছেন ভূতলে, প্রণাম করছেন তিনি ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে। যশোবন্তের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, আবার খোস মেজাজে গায়ে-গা দিয়ে শুয়ে আছে ওরা স্তম্ভশীর্ষে! আমার ঠিক সম্মুখে সেই কৃষ্ণ রাজকুমারীর অনবচ্ছিন্ন চিত্রটি—কিন্তু তার সম্মুখবর্তিনী সেই অর্ধা-খালা-হাতে সহচরীটি অন্তর্হিত। সেখানে দেখছি এক রাজপুত্রের চিত্র। তার মাথায় হীরা-পার্না-পোখরাজের মুকুট, তার কণ্ঠে মুক্তার শতনরী। কৃষ্ণ রাজকুমারীর মূর্তি আর বিবাদধ্বনি নয়, পরমপ্রাপ্তির আনন্দে প্রোজ্জল; তাঁর দৃষ্টি আর মেদিনী-নিবন্ধ নয়, সলজ্জে তিনি তাকিয়ে আছেন ঐ রাজপুত্রের দিকে। রাজপুত্রের মুখাকৃতি মনে হল আমার অত্যন্ত পরিচিত। কোন্ গুহার কোন্ প্রাচীরের কোন্ মুখাকৃতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে মনে করতে পারছি না, অথচ মনে হচ্ছে এ আমার অত্যন্ত চেনা, অত্যন্ত পরিচিত।

হঠাৎ অনুভব করি গুহার আমি একা নই। গুহার অপরাধান্তে কে একজন আমার দিকে পিছন ফিরে ক্লীণ দীপালোকে কি করছেন। এগিয়ে গেলুম তাঁর দিকে। স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেলুম না, তবু মনে হল, আমার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালে তুলির টান দিচ্ছিলেন যিনি তাঁর পরিধানে গৈরিক কাষায়, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, তাঁর দেহ থেকে যেন একটা অপাধিব জ্যোতিঃ বের হচ্ছে।

পদশব্দে যেন তিনি পিছন ফিরে তাকালেন, যেন ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর। জ্বরতপ্ত-গোলা বাটি থেকে খানিকটা তরল রঙ পড়ে গেল মাটিতে।

আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম তাঁকে। নীরবে তিনি যেন একটি হাত কাড়িয়ে দিলেন আমার মাথার উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

বলি—প্রভু, আপনাকে চিনেছি। আপনাকে প্রণাম!

স্মিত হাসলেন তিনি।

কি জানি কেন তাঁকে দেখেই আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নটা। বললুম—আপনি আমাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। ষ্ট্রুতা মার্জনা করবেন প্রভু, তবু বলব, আপনার বিকল্পে আমার অভিযোগ আছে! শাস্ত সন্মাহিত দৃষ্টিতে কোঁতুল ফুটে ওঠে।

আমি বলতে থাকি—সকলের পরিণতি আপনি দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার যশোধরা মায়ের শেষ কথাটা বলতেই বা কেন ভুল হল আপনার? এমন মহিমময়ী মাতৃমূর্তির উপসংহার নেই কেন অজস্রায়? তিনি কি ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করেছিলেন? তাই যদি করে থাকেন তো সে-কথাই বা বলে গেলেন না কেন আপনি?

একটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে ধামতে বললেন। ক্ষান্ত শব্দ আমি। উঁনি উঠে দাঁড়ালেন, হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে আদেশ করলেন তাঁকে তন্তুসরণ করতে। জ্বরের উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, তবু অসীম আগ্রহে আমি টলাতে টলতে বেরিয়ে এলাম তাঁর পিছন পিছন। বাহিরে তখন আবার ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি নেমেছে। গাঢ় কালিমায় ঢেকে গেছে দিক দিগন্ত। অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শককে আমি দেখতে পাচ্ছি না—তবু পদশব্দ লক্ষ্য করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছি। মনে হচ্ছে কত মকপ্রাস্তর, নদনদী অতিক্রম করে যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছি আমরা দুজন। যেন সে চলার আর শেষ নেই।

সহসা অগ্রবর্তী বুদ্ধ শ্রমণ শুরু হলেন। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। এ কোথায় এসেছি? সহসা আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমক দিল, সেই ক্ষণপ্রভার আলোয় দেখলুম আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি উর্নবংশতি গুহা মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন মহাশিখী—তিনি তাঁর দাক্ষিণ্য প্রসারিত করে প্রবেশ-ভোরণের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করছেন। কী আছে ওখানে? পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলুম সেদিকে; কিন্তু ঘন মেঘে আধার হযে গেছে দিক দিগন্ত। নিরঙ্ক অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ঠিক তখনই সশব্দে বজ্রপাত হল কোথাও। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ি পাষাণ বেদীতে। মীর্জা ইসমাইল আবার ধামশেন।

আমি বলি—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। বন্ধুদের কাছে শুনেছি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নয়দিন সকালে তারা আমাকে আবিষ্কার করেছিল উর্নব নগর গুহার সামনে। এ-কথা জেনে-ছিলাম দু মাস পরে, আওরঙ্গাবাদ হাসপাতালে। ডবল নিমুনিয়া হয়েছিল আমার। বাঁচব এ আশা ছিল না।

বলি—অদ্ভুত গল্প তো?

ইসমাইল বলেন—হ্যাঁ নিছক আঘাতে গল্প। কিন্তু বাবুজি, কদাপুরের গাঁওবুড়োর মতো যদি আমি বলি, এ কোন গল্প নয়, এ আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা?

আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলি—সে তো বটেই। আপনি সতাই স্বপ্ন দেখেছিলেন সে বাত্রে, তবু বলব স্বপ্নটা বড় অদ্ভুত।

কিন্তু পবদিন আমাকে ওবা গুহাদুৱে ঐ উনিশ নম্বৰেব সামনে দেখতে পেল কি কবে? সেটা তো আব স্বপ্ন নহয়?

—সেটা কিছু অসম্ভব নহয়। যুমেৰ ঘোবে মানুষেব এবকম অনেকদূৰ হেঁটে যাওযাব নজিৰ আছে। তাকে বলে

বাধা দিয়ে উনি বলেন— জানি, সোমনামবলিসম।

ঠঠাং পাহাডেব উপৰ থেকে, অৰ্থাৎ গুহা-সমতলেব পথ থেকে ক যেন আমাব নাম ধৰে ডাকল। উৰ্ব্বমুখে চেয়ে দেখি কুণ্ড-স্পেশালেব সেই মেসোমশাই। যাৰ লোখাব বাৰ্থেব উপৰ আপাব বাৰ্থে উঠে উপৰওয়াল-সাজাব আত্মপসাদ লাভ কৰেছিলাম, তিনিই এখানে আমাব কয়েকশ' ফুট উপৰে উঠে ডাকাছেন। অৰ্থাৎ কুণ্ড-স্পেশাল পৌছে গেছে ঐ তো মাসিমা, ঐ দেশপ্ৰিয় পাকেব নানিলী দাদ।

সংক্ষিপ্ত বিদায় জানাতে গেলুম ইসমাইল সাহেবকে

হেসে উনি বলেন, বাবুজি, গল্পটা আমাব শেষ তৰ্যোঁচল, বাৰি ছিল সামান্য উপসংহাৰ। কিন্তু তা আমি বলব না। শুধু এটুকু বলব, শৃঙ্গ হয়ে আমি আবাব এসে দাঁড়িয়েছিলুম সেই উনিশ নম্বৰ গুহাদ প্ৰবেশপথে। কী দেখাতে চেয়েছিলেন সেই 'মহান অজ্ঞতা শিল্পী'? নিৰ্দেশিত মূৰ্তিটি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি আমাব স্বপ্নই বলুন, আব গল্পই বলুন, আমাব এতদিনেব সমস্ৰাব সমাধান খুঁজে পেয়েছিলুম ঠিকই।

কৌতূহলী হয়ে বলি—কী দেখেছিলেন বলুন তো?

—বাবুজি, আব দোঁব কৰবেন না—ঐ দেখুন ওঁবা আপনাকে খুঁজছেন।

যুক্তকবে নমস্কাৰ কৰে বুদ্ধ ইসমাইল ধীবে ধীবে চলে গেলেন। আমি এলুম নিজেব দলে। ফকিব কুণ্ড বলেন, আপনাব পাৰ্কাট লাফ বয়ে বেড়াছি মশাই, খেয়ে নিন।

কিন্তু খাওযাব কথা তখন কে শোনে। আমি হনহানিয়ে চলে আসি উনিশ নম্বৰ গুহাব প্ৰবেশপথে। নিৰ্দেশিত মূৰ্তিটি খুঁজে বাব কৰতে আমাবও খুব অশুবিধা হল না। প্ৰবেশপথেব ডানদিকে (চিত্ৰ-৬১-ৰ বামপ্ৰান্তেব আঁকা মূৰ্তিটি) দেখলুম সেই বিলিফ কাজ! বুদ্ধদেব—গোপা ও বাছল। আশ্চৰ্য, এ মূৰ্তিটিব যে বিশেষ বাঞ্ছনা তা তো আগে লক্ষ্য কৰি নি!

পৰিকল্পনা ঠিক সেই সপ্তদশ গুহাব বিশ্ব-বন্দিত স্ফেৰেটিব (চিত্ৰ-৫৩) অন্তৰূপ। প্ৰভেদ এই যে, সেটি প্ৰাচীৰচিত্ৰ, এটি পাথৰেৰ বিলিফ কাজ। তাবও সামান্য একটি প্ৰভেদ আছে—সে পাৰ্থক্য এত ক্ষীণ যে মীৰ্জা ইসমাইল সাহেবেব বহুশ-ঘন ইঞ্জিতটুকু না জানা থাকলে নজবেই পড়ত না। মহাভিক্ষুব সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যশোধবা আব বাছল। ইতিপূৰ্বে দেখেছিলাম মা যশোধবাৰ অন্তবেৰ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূৰ্ত হয়েছিল তাব ছুটি হাতেব কৰাজুলিব মুদ্ৰায় (চিত্ৰ-৫৪)। এবাব দেখছি, সন্তান সঙ্কে জননীব মনে আৱ

কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বাছলকে তিনি আবে স্পর্শ কবে নেই। তাঁব ছুটি হাত যুক্ত হয়েছে নমস্কাৰেব ভঙ্গিতে। গৌতমবুদ্ধ তাঁব কাছে আবে গৃহত্যাগী যুববাজ নন—তিনি মহাকাৰুণিক, মহাসত্ব। এবাব কান পাতলে গুনতে পাব তাঁব প্রার্থনামন্ত্র—“মহাকাৰুণিকো নাথো হিতায় সববপাৰ্ণিনঃ পূৰ্বেহা পাবমী সব্বা পত্তো সস্বোধিমুক্তম্”।

ম' যশোধবাব হাতে এবাব দেখাছ একটি সন্ন্যাসদণ্ড। ভিক্ষুণী হয়েছেন তিনি।

দণ্ডেব উপবে ধৰ্মেব একটি নিশান। সন্ন্যাসদণ্ডেব শীৰ্ষে ত্ৰিশূলাকৃতি তিনটি ফলক। না, শৈবে ত্ৰিশূল নয। বৌদ্ধ ধৰ্মানুসাবে একে বলে ত্ৰিবল্ল। মুক্ত নীলাকাশেব দিকে নির্দেশ কবে ত্ৰিশূলেব তিনটি ফলা জানিয়ে দিছে সিদ্ধার্থ-জাযা যশোধবাব জীবনেব উপসংহাৰ—বুদ্ধঃ শবঃ গচ্ছামি, ধৰ্মঃ শবণঃ গচ্ছামিঃ সত্ৰঃ শবণঃ গচ্ছামি।

\* \* \* \*

ফেবাব পাথে ভাবছিলুম তজ্জন্মাব অনেক-কিছুই দেখা হল, আবাব অনেক-কিছুই বইল অজানা-অদেখা। মীৰ্জা ইসমাইলেব দীঘদিনেব সমস্তাব সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বপ্নে, কিন্তু আমাব মনে এ স্বপ্নাদিনে যে প্রশ্নটি জেগেছে তাব জবাব আমি খুঁজে পাই নি। কোন চিত্ৰটিব প্রেমে বুদ্ধ মীৰ্জা ইসমাইল পড়ে আছেন এই অজন্তা গুহায়। পাগলা মেহেবালিব মতো আটকা পড়েছেন পাথবে উদ্বাস্ত প্রেমে। সে কি ঐ মদালসা কৃষ্ণা অক্ষবা ? সে কি সিবলী, সূমনা, নাগবালা হবান্দাতী, প্রসাধনবতা বাজকন্ডা, নিবাববণা স্নানার্থিনী, অনিন্দ্যকাম্বি মাদ্রী, মবণাহতা জনপদন্যায়ী ? না কি সে ঐ প্রায় মুচু-মাওযা কৃষ্ণা বাজকুমাবী ? কৃষ্ণা অক্ষবাকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন মোহময়ী, মদালসা, মাদ্রীব প্রসঙ্গে অক্ষবেব কবেছিলেন আমাব গ্রন্থে যেন জাওকবাবেব অবহেলার প্রতিকার কবি, সীবলীব কথায় জানিয়েছিলেন—রূপ ছিল ঐ মন্দভাগিনীব অভিশাপ। কিন্তু প্রতীক্ষাবতা কৃষ্ণাবাজকুমাবীব পসঙ্গে তিনি কিছু বলেছিলেন কি ? জবেব ঘোবে তিনি ঐ কৃষ্ণা বাজকুমাবীব সম্মুখে দেখেছিলেন একটি বাজকুমাবেব। বলেছিলেন, বাজপুত্ৰেব মুখাকৃতি ঔব অতি পরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রাচীবেব কোন চিত্ৰটিব সঙ্গে বাজপুত্ৰেয সাদৃশ্য আছে তা তিনি মনে কবতে পাবেন নি। যে কথটা তিনি স্বীকাৰ কবেন নি সেটা কি এই যে, ঐ বাজপুত্ৰেব অতি-পরিচিত মুখচ্ছবি উনি অজন্তাগুহাব কোন প্রাচীবে দেখেন নি, দেখেছেন দৰ্পণে ? জানি না।

অজন্তাব অনেক-কিছুই অগুপ্ত, গড়াত, বহুস্বঘন। এটুকুও অজানা বয়ে গেল আমাব কাছে। তা থাক। তব তুপ আমি। এ কযটি দিন অজানা অচেনা অতীত যুগেব বৌদ্ধ শ্রমণদেব সঙ্গে হামি-অশ্রব এ মহাসপ্নে হেসেছি আবে কেঁদেছি। বসেব অমৃতসমুদ্রে অবগাহনস্নান কবেছি পবমানন্দে। যাবাব বেলায় তাই খুশী মনেই বলে যাব—

এই ভালো আজ এ সপ্নমে কালাহাসিব গঙ্গা যমুনায

টেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভবেছি, নিয়েছি বিদায়।

হে অপকপা অজন্তা। তোমাকে প্রণাম।